শাহ আহমদ রেজা

ভাসানীর কাগমারী সম্মেলন ও স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম

ভাসানীর
কাগমারী সম্মেলন
ও
স্বায়ত্তশাসনের
সংগ্রাম

শাহ আহমদ রেজা

গণপ্রকাশনী

প্রকাশক ঃ
গণপ্রকাশনী
গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ট্রাস্টের একটি প্রকল্প
শহীদ রফিক জব্বার মহাসড়ক
নয়ারহাট ভায়া ধামরাই
ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রথম সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৯৩
জুলাই ১৯৮৬

প্রচ্ছদ ঃ মুনির খান
গ্রন্থস্বত্ব ঃ শাহ্ আহমদ রেজা

মুদ্রণে ঃ
গণমুদ্রণ
গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ট্রাস্টের একটি প্রকল্প
শহীদ রফিক জব্বার মহাসড়ক
নয়ারহাট ভায়া ধামরাই
ঢাকা, বাংলাদেশ

মূল্য ঃ লেখক কাগজ ঃ পঁচিশ টাকা
শাদা কাগজ ঃ পঁয়ত্রিশ টাকা

Bhashani's Kagmari Conference And The Struggle For Autonomy (1947—57): Written By Shah Ahmad Reza, Published By Ganoprokashani, A Project of Ganoshasthya Kendra, Shahid Rafique Jabbar Mahasarak, Nayarhat via Dhamrai, Dhaka, Bangladesh. First Edition: July 1986. Price: Lekhak Paper: Taka Twenty Five only And White Paper: Taka Thirty Five only.

উৎসর্গ

আমার আব্বা
খন্দকার আজহার হোসেন
এবং আম্মা
বেগম রোকেয়া খাতুন
যাঁদের স্নেহ আর শাসনের কোনো
প্রতিদান হয়না।

ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস-চিন্তা থেকে আমি বইটি লিখেছি। কারণ, পূর্ব বাংলার জনগণের যে আন্দোলন স্বাধীনতাকে অনিবার্য করেছে, স্বায়ত্তশাসনের সে আন্দোলন শুরু হয়েছিলো পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পাকিস্তানের প্রথম দশকব্যাপী বিকশিত এই আন্দোলন দুটি বৈশিষ্ট্যের কারণে উল্লেখযোগ্য : সামন্তবাদ, বৃহৎ পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদ সহ শোষণের সকল উৎসেরই সবল বিরোধিতা এবং স্বায়ত্তশাসনের বিকল্প হিসেবে স্বাধীনতার চিন্তা ও তার ক্রমাগত লালন। এর পরিণত পর্যায়ে আয়োজিত হয়েছিলো কাগমারী সম্মেলন এবং সে জন্যই স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন সহ পাকিস্তানের তৎকালীন রাজনীতির বিস্তারিত ইতিহাস আলোচনার কেন্দ্রিয় বিষয় হিসেবে আমি সম্মেলনটিকে বেছে নিয়েছি।

আমাকে সবচেয়ে বেশী উৎসাহ যুগিয়ে গেছেন আমার বড় ভাই শাহ মাহমুদ রেজা (২৬ মে ১৯৪৫—৯ নভেম্বর, ১৯৮২)। এস এম রেজা নামে সমধিক পরিচিত এবং ষাটের দশকে অসংখ্যবার কারানির্যাতিত আমার এ ভাইটি ছিলেন টাঙ্গাইলের প্রগতিশীল আন্দোলনের এক পুরোগামী নেতা। ১৯৬২ সনে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক হিসেবে রাজনীতিতে আসার পর বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা এবং ন্যাপ ও কৃষক সমিতির নেতৃত্বদানের মাধ্যমে তার কর্মকান্ডের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিলো। মৃত্যুকালে তিনি ইউনাইটেড পিপলস পার্টি ও বাংলা শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

আমার শিক্ষাবিদ পিতা খন্দকার আজহার হোসেন (১ মে ১৯১৭—২৬ এপ্রিল ১৯৮১), আম্মা বেগম রোকেয়া খাতুন, শ্বশুর শেখ মোহাম্মদ সুলতান, মেঝ ভাই লেঃ কর্নেল শাহ খালেদ রেজা, দুই ভাবী চাতক রেজা ও পামেলা খালেদ এবং শুভাকাংক্ষী আফতাবুজ্জামান খান ফিরোজ ও মেহজাবীন আফতাব কচিও আমাকে সকল পর্যায়ে উৎসাহ যুগিয়েছিন।

আমার কর্মস্থল স্বাধীনতা যুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্প থেকে উপকৃত হয়েছি নানাভাবে। প্রথম পরিচালক কবি হাসান হাফিজুর রহমান, বর্তমান পরিচালক এম আর আখতার মুকুল, গবেষক সৈয়দ আল ইমামুর রশীদ ও ওয়াহিদুল হক সহায়তা দিয়েছেন সকল প্রকারে। লেখক

আবু জাফর শামসুদ্দিন, রাজনীতিক হায়দার আকবর খান রনো ও কবি শাহনুর খান তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে উপকার করেছেন। টাঙ্গাইলের প্রগতিশীল আন্দোলনের সাথে বিভিন্ন সময়ে জড়িত বুলবুল খান মাহবুব, হামিদুল হক মোহন, মুজিবুর রহমান চৌধুরী, ফজলুর রহমান খান, প্রয়াত সৈয়দ আবদুল মতিন, মোহাম্মদ আলী (ন্যাপ), উদয় শংকর ঘোষ, নজরুল ইসলাম বাদল, শফিকুল ইসলাম সোনা ও মাহমুদ কামাল ছাড়াও সাধারণ গ্রন্থাগারের সম্পাদক খন্দকার নাজিমুদ্দিন এবং 'আদালত' সম্পাদক এ্যাডভোকেট কামাক্ষা নাথ সেনের উৎসাহ ও সহযোগিতা ছিলো আন্তরিক। পান্ডুলিপি প্রণয়নের পর্যায়ে ভগ্নিপতি মসিউর রহমান খান ও বন্ধু আবদুর রউফ স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা দিয়েছেন। 'বিচিত্রা'র কবি বন্ধু মাহমুদ শফিক ক্রমাগত লেখার তাগিদ দিয়েছেন, প্রাক্তন ছাত্রনেতা মাহমুদুর রহমান লাভলু, 'জনতা'র সাহিত্য সম্পাদক কবি মাহবুব হাসান, 'বিতর্ক'র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রিয়াজুর রহমান এবং কবি ত্রিদিব দস্তিদারও সাহায্য করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সহপাঠী এবং সাপ্তাহিক 'ঢাকা কুরিয়ার' এর নির্বাহী সম্পাদক আফসান চৌধুরী সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে থেকেছেন সর্বক্ষণ।

বইটি প্রকাশ করার ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছেন সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা'র সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী, নির্বাহী সম্পাদক ও প্রগতিশীল লেখক শাহরিয়ার কবির এবং সহকারী সম্পাদক চন্দন সরকার। ৮৫-র ঈদুল আজহা সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় অংশবিশেষ প্রকাশ করে তারা বইটিকে অগ্রিম পরিচিতি দিয়েছেন, শাহরিয়ার কবিরের পরামর্শ একে সমৃদ্ধও করেছে। বিশেষভাবে স্মরণীয় অবদান ছিলো শাহাদত চৌধুরীর ঃ প্রকাশ করার আয়োজন থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত সমগ্র প্রক্রিয়ায় তিনি আমাকে সহৃদয় সহযোগিতা দিয়েছেন। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ট্রাস্টের প্রকল্প নিয়ন্ত্রক ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরীর ব্যক্তিগত আগ্রহ ব্যতীত বইটি এভাবে প্রকাশ করা যেতোনা, তার কাছে আমি ঋণী। মুদ্রণের পর্যায়ে গণমুদ্রণের শফিক খানের সহযোগিতা ছিলো সব সময়। বাংলাদেশ লেখক ইউনিয়নের অনুরোধে হ্রাসকৃত মূল্যে 'লেখক কাগজ' সরবরাহ করে বি সি আই সি কর্তৃপক্ষ উপকার করেছেন।

সবশেষে কিন্তু বিশেষভাবে বলবো আমার স্ত্রী রিজিয়া সুলতানার কথা, যার সান্নিধ্য ও হাতের চা ছাড়া বইটি লেখা সম্ভব হতোনা।

'সুগন্ধা ভবন'
২১ ভিক্টোরিয়া সড়ক, টাঙ্গাইল

শাহ আহমদ রেজা
১৭ জুলাই, ১৯৮৬

সূচী

১।	কাগমারী সম্মেলনের পটভূমি	১
২।	ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী সংঘাত	৩৩
৩।	কাগমারী সম্মেলন ঃ ভাসানীর 'আসসালামু আলাইকুম'	৫১
৪।	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রতিষ্ঠা	৭১
৫।	আওয়ামী লীগের শাসনকালে পূর্ব বাংলা	১০০
৬।	সোহরাওয়ার্দীর বাঙালী-বিরোধী ষড়যন্ত্র ঃ আওয়ামী লীগের পতন	১২৯
৭।	ভাসানীর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা ও স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের মূল্যায়ন	১৫৩
৮।	তথ্য তালিকা	১৮২

১

কাগমারী সম্মেলনের পটভূমি

আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন উপলক্ষে ১৯৫৭ সনের ফেব্রুয়ারীতে মওলানা ভাসানী আহূত 'কাগমারী সম্মেলন' পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে দিক-পরিবর্তনকারী এক অসাধারণ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। সংগঠনের সভাপতি কর্তৃক নিজের দলেরই ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দের অনুসৃত নীতি ও কার্যকলাপের বিরোধিতা ও সমালোচনার উদ্দেশ্যে এ ছিলো এক বিরল আয়োজন। এই সম্মেলনে মুখোমুখী হয়েছিলেন পাকিস্তানী রাজনীতির দুই বিতর্কিত পুরুষ ঃ একজন দেশ, জনগণ এবং দলের স্বার্থে সংগঠনের নীতি ও কর্মসূচী সমুন্নত রাখতে উচ্চকিত, অনমনীয় প্রতিবাদী মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, অন্যজন ক্ষমতা রক্ষার প্রয়োজনে দলের ঘোষিত নীতি-বিরোধী কার্যক্রমের পক্ষ সমর্থনে ব্যস্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

কাগমারী সম্মেলনের ফলাফল পাকিস্তানের রাজনীতিতে যুগান্তর ঘটিয়েছিলো, এর পরিণতি হয়েছিলো সুদূরপ্রসারী। 'ইতিহাস সবকিছু শিক্ষা দেয়, এমনকি ভবিষ্যতও,' আর তাই তৎকালীন ঘটনা প্রবাহের জন্যে কেবল নয়, পরবর্তীকালের রাজনীতির ইতিহাস অনুধাবনের স্বার্থেও কাগমারী সম্মেলনের বিস্তারিত পর্যালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দের স্বরূপ উন্মোচিত হবে, 'জাতীয় নেতা'র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত নেতৃবৃন্দের প্রকৃত ভূমিকা, অবদান ও অবস্থানও নির্ণয় করা যাবে।

১. সম্মেলন আহবানের কারণ

দুটি প্রধান জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে মওলানা ভাসানী এই সম্মেলন আহবান করেছিলেন ঃ এক, পাকিস্তানের অবহেলিত প্রদেশ

পূর্ব বাংলার জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়, এবং দুই, সকল প্রকার সামরিক চুক্তি ও যুদ্ধজোটমুক্ত স্বাধীন ও জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র-নীতির প্রতিষ্ঠা। এ দুটিই ছিলো আওয়ামী লীগের ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত এবং এর আশু মীমাংসা করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে এজন্য যে আওয়ামী লীগ তখন ক্ষমতাও লাভ করেছিলো ঃ ১৯৫৬ সনের ৬ সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে প্রদেশে এবং ১১ সেপ্টেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে সরকার গঠিত হয়েছিলো। আওয়ামী লীগ অবশ্য এককভাবে ক্ষমতায় যেতে পারেনি, প্রদেশে তাকে গণতন্ত্রী দল, জাতীয় কংগ্রেস ও ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ পার্টি'র সহযোগিতা নিতে হয়, অপর দিকে জাতীয় পরিষদে ২৭ জন সদস্যের বলে শক্তিশালী রিপাবলিকান পার্টি'র সাথে মাত্র ১৩ জন সদস্য নিয়ে লঘিষ্ঠ অংশিদার হিসেবে সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা গঠন করেছিলেন।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ায় সংগত কারণেই পূর্ব বাংলার জনগণ দাবী আদায়ের আকাংখায় উন্মুখ হয়ে ওঠেন, সংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগের ওপরও অংগীকার পূরণের দায়িত্ব এসে যায়। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে এর গণমুখী নেতা ও কর্মীরা দলের কর্মসূচী বাস্তবায়নের আহবান জানাতে থাকেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের ক্ষমতাসীনরা বিশ্বাস ভংগের পথ ধরেন ঃ তারা সংগঠনের কর্মসূচী থেকে সরে যেতে থাকেন, নীতির প্রশ্নে গ্রহণ করেন সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান। ফলে এতদিনের সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়, বিবদমান দুটি উপদল সাংগঠনিক নিয়মনীতিকে পাশে ঠেলে প্রকাশ্য বিরোধিতা চালাতে থাকে, সংগঠনও এসে যায় ভাঙনের মুখোমুখী। দলের মর্যাদা ও সংহতি রক্ষা এবং জনগণকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণের প্রয়োজনে তখন এগিয়ে আসেন মওলানা ভাসানী ঃ আওয়ামী লীগের সভা-পতি হিসেবে তার সে-উদ্যোগটিই ছিলো কাগমারী সম্মেলন। পরিস্থিতির কারণে তাই স্বায়ত্তশাসন এবং পররাষ্ট্রনীতির পাশাপাশি অন্য একটি প্রশ্নও সম্মেলনে প্রাধান্য পেয়েছিলো ঃ সংগঠন নেতাদের পরিচালনা করবে, না নেতাদের প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত হবে সংগঠনের নীতি ও কর্মসূচী।

স্বায়ত্তশাসন ও পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্ন দুটি এত গুরুত্বপূর্ণ কেন ছিলো তা বোঝার জন্যে প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আওয়ামী লীগের ঘোষণা, কর্মসূচী ও সংগ্রামী কার্যক্রমের পর্যালোচনা দরকার, ঐ সাথে আলোচিত হওয়া দর-

কার তৎকালীন প্রাসংগিক রাজনীতির ইতিহাসও। উল্লেখ্য যে, আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন নাম 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ'। ১৯৫৫ সনের ২১, ২২ ও ২৩ অক্টোবর মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ঢাকার 'রূপমহল' সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত দলের পূর্ণাংগ কাউন্সিল অধিবেশনে সংগঠনকে অসাম্প্রদায়িক করার উদ্দেশ্যে 'মুসলিম' শব্দটি পরিত্যাক্ত হয় (দৈনিক 'পাকিস্তান অবজারভার,' ঢাকা, ২৪ অক্টোবর, ১৯৫৫)। বর্তমান আলোচনায় নামোল্লেখের সময় সর্বত্র কেবল 'আওয়ামী লীগ' বলা হবে।

ক. স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গে মওলানা ভাসানী এবং আওয়ামী লীগ

১. বৈষম্যের সূচনা : প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় ভাসানী

আওয়ামী লীগ তার প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই পূর্ব বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী জানিয়ে এসেছে। অন্যভাবে বলা যায় : মূলতঃ স্বায়ত্তশাসনসহ পূর্ব বাংলার জনগণের বিভিন্ন অধিকার আদায়ের সংগ্রাম পরিচালনার কর্মসূচী নিয়েই ১৯৪৯ সনের ২৩ জুন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো। সংগঠনের প্রথম ঘোষণাতেই 'আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার' দাবী করা হয়, আহবান জানানো হয় স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ন্যায়সংগত সম্পর্ক নির্ধারণের।[১]

ব্যক্তিগতভাবে মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই পূর্ব বাংলার স্বার্থের প্রশ্নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে আসছিলেন। পূর্ব বাংলার প্রতি অবিচারের অন্যতম প্রাথমিক পদক্ষেপটি ছিলো প্রদেশের বিক্রয় করের ওপর কেন্দ্রের অংশিদারিত্ব প্রতিষ্ঠা : পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে ১৯৪৮ সনের মার্চে অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীদের সভায় প্রাদেশিক রাজস্বের প্রধান উৎস বিক্রয় করের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কেন্দ্রকে প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়। এই অন্যায় সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে প্রথম সোচ্চার হন মওলানা ভাসানী : প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় বাজেটের ওপর বিতর্ককালে ১৯৪৮ সনের ১৯ মার্চ

তিনি বলেন '- - প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট এই যে সেলস ট্যাক্স সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সংগে চুক্তি করে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সাবজেক্ট করে দিয়ে আসলেন এবং তাদের কাছ হতে মাত্র এক কোটি টাকা নিবেন বলে স্বীকৃত হলেন, এটা মন্ত্রী মন্ডলী কোন স্বাধীনতার বলে করলেন ? এ্যাসেম্বলীর মেম্বারদের সংগে পরামর্শ না করে তারা নিজেরা মোড়লী করলেন কোন অধিকারে ? আমরা কি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের গোলাম ? বৃটিশ গভর্নমেন্টের গোলামী করি নাই। ন্যায়সংগত অধিকারের জন্য চিরকাল লড়াই করেছি, আজও করব। আমরা হাড়ভাংগা পরিশ্রম করে পাট উৎপাদন করব অথচ জুট ট্যাক্স, এমনকি রেলওয়ে ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স নিয়ে যাবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। এই সব ট্যাক্সের শতকরা ৭৫ ভাগ প্রদেশের জন্য রেখে বাকী অংশ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে দেওয়া হোক।- -'[২]

উল্লেখ্য যে বিক্রয় কর সম্পর্কিত সিদ্ধান্তটি প্রাথমিকভাবে দু'বৎসরের জন্য গৃহিত হলেও ১৯৫২ সনের রেইসম্যান রোয়েদাদের সুপারিশক্রমে ব্যবস্থাটিকে স্থায়ী করা হয়। আয় কর এবং পাট রফতানী শুল্কের ক্ষেত্রেও পূর্ব বাংলাকে বঞ্চিত করা হতে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়ঃ ১৯৫০-৫১ ও ১৯৫১-৫২ সনে পাট শুল্ক খাতে প্রদেশের আয় ছিলো যথাক্রমে ৬ কোটি ৭২ লক্ষ ও ৬ কোটি টাকা, রেইসম্যান রোয়েদাদের পর ১৯৫২-৫৩ ও ১৯৫৩-৫৪ সনে এর পরিমাণ কমে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪ কোটি ৩২ লক্ষ ও ৪ কোটি টাকায়।[৩] এভাবেই পূর্ব বাংলার প্রতি অবিচারের সূত্রপাত হয়েছিলো, আর এর প্রতিবাদে প্রথমে ব্যক্তিগতভাবে এবং পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের মাধ্যমে সোচ্চার হয়েছিলেন মওলানা ভাসানী।

২. বৈষম্যের কয়েকটি পরিসংখ্যান ঃ নির্যাতন শুরু

পূর্ব বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে আওয়ামী লীগের আন্দোলনের যৌক্তিকতা বোঝার সুবিধার্থে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সে সময় বিরাজমান বৈষম্যের কয়েকটি প্রসংগ তুলে ধরা যেতে পারে। ১৯৫২ সনের এপ্রিল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে কর্মরত ১৩ জন সচিবের সবাই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের, ১৯ জন যুগ্ম-সচিবের মধ্যে ১ জন এবং ৫৯ জন উপ-সচিবের মধ্যে মাত্র ৪ জন ছিলেন পূর্ব

বাংলার।[৪] ১৯৫৫ সন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীতে নিয়োজিত পশ্চিম পাকিস্তানবাসীদের সংখ্যা ছিল ৪২ হাজার, পূর্ব বাংলার ছিলো ২ হাজার ৯শ, বেতন হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানীরা পেতো ১১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা, পূর্ব বাংলার ভাগে আসতো ৬০ লক্ষ টাকা।[৫] ১৯৫৬ সন পর্যন্ত প্রতিরক্ষা বাহিনীতে নিযুক্তির চিত্রটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য (পশ্চিম পাকিস্তান ঃ পূর্ব বাংলা) ঃ জেনারেল-১ঃ০, লেঃ জেনারেল-৩ঃ০, মেজর জেনারেল-২০ঃ১, ব্রিগেডিয়ার-৩৫ঃ০, কর্নেল-৫০ঃ০, লেঃ কর্নেল-১৯৮ঃ২, মেজর-৫৯০ঃ১০, নৌ-বাহিনীর অফিসার-৬৯৩ঃ৭, বিমান বাহিনীর অফিসার-৬৪০ঃ৬০।[৬] প্রতিরক্ষা খাতে ১৯৫৪ সন পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয়িত হয়েছিলো ৪৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, পূর্ব বাংলায় ১০ কোটি টাকা।[৭] ১৯৫৫ সন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানে ৭৯০ কোটি কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা, পূর্ব বাংলায় ৪২ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা।[৮] ১৯৫৪ সন পর্যন্ত শিক্ষা ক্ষেত্রের চিত্রও কম উল্লেখযোগ্য নয় ঃ পশ্চিম পাকিস্তানে বিশ্ববিদ্যালয় ছিলো ৪টি, মেডিক্যাল কলেজ ৫টি, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ৩টি, পূর্ব বাংলায় ছিলো যথাক্রমে ২টি, ১টি এবং ১টি। এছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানে ৮টি টেক্সটাইল কলেজ এবং ২টি ফরেস্টারী কলেজ ছিলো, যা পূর্ব বাংলায় একটিও ছিলোনা।[৯] শিক্ষাখাতে এই সময়কালে কেন্দ্রীয় অনুদানের পরিমাণ ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানে ১৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা, পূর্ব বাংলায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা।[১০]

উল্লিখিত পরিসংখ্যানসমূহ পরবর্তীকালীন হলেও পূর্ব বাংলার প্রতি শোষণ ও অবিচারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিলো পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই, এ চিত্রগুলি সে-প্রক্রিয়ারই অনিবার্য ফলশ্রুতি। এরই পাশাপাশি চলেছে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপরও আক্রমণ। এর বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদী ভূমিকা নেন মওলানা ভাসানী, পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ পরিণত হয় প্রধান সংগ্রামী প্রতিষ্ঠানে। ফলে মওলানা ভাসানী সহ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সরকারের নির্যাতনের শিকার হন। 'হিন্দুস্থানের দালাল,' 'ইসলামের দুশমন' এবং 'পাকিস্তানের দুশমন' আখ্যায়িত করে এমনকি তাদের 'শির' কেটে ফেলার হুমকি পর্যন্ত দেয়া হয়েছে প্রকাশ্যে। এক্ষেত্রেও প্রথম আক্রান্ত হন মওলানা ভাসানী ঃ পূর্ব বাংলার সপক্ষে

সরকার-বিরোধী ভূমিকা গ্রহণের দায়ে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় দক্ষিণ টাংগাইল থেকে তার নির্বাচনকে বাতিল করানো হয়, ১৯৫০ সন পর্যন্ত নির্বাচনে অংশ গ্রহণে তার ওপর আরোপিত হয় নিষেধাজ্ঞা। একই এলাকা থেকে ১৯৪৯ সনের ২৬ এপ্রিল নির্বাচিত পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের প্রথম সম্পাদক শামসুল হকের নির্বাচনকেও মিথ্যে অজুহাতে বাতিল করানো হয়।[১১] প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের পূর্ব বাংলা সফরকালে খাদ্যাভাব ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আর্মানীটোলা ময়দানে আয়োজিত জনসভা ও বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্বদানের অভিযোগে ১৯৪৯ সনের ১৪ অক্টোবর মওলানা ভাসানীকে গ্রেফতার করা হয়। সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক এবং যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান সহ আওয়ামী লীগের অন্য নেতৃবৃন্দও একই ধরণের নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন।

৩. ৫৩-র জুলাই অধিবেশন ঃ সোহরাওয়ার্দী-আওয়ামী লীগ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা

হুমকি এবং দলন-নির্যাতনের প্রতিকূলতা সত্বেও মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ তার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। অতীত বক্তব্যের সূত্র ধরে ১৯৫৩ সনের জুলাই অধিবেশনে সাত শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে আরো একবার আওয়ামী লীগ সুনির্দিষ্টভাবে স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে তুলে ধরে। ঢাকার 'মুকুল' সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে ৯ জুলাই গৃহিত এক প্রস্তাবে দেশরক্ষা, মুদ্রা এবং পররাষ্ট্রনীতিকে কেন্দ্রীয় বিষয় রেখে বাকী সকল বিষয়কেই প্রদেশের কর্তৃত্বে প্রদানের দাবী করা হয়।[১২] উল্লেখ্য যে আওয়ামী লীগের এই অধিবেশনেই শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানে সীমাবদ্ধ সামান্য সংখ্যক সদস্য সম্বলিত 'পাকিস্তান জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগ' -এর সাথে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। মানকী শরীফের পীরের 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' (মে, ১৯৪৯) ও মামদোতের নবাবের 'জিন্নাহ মুসলিম লীগ' (১৯৫০)-এর সমন্বয়ে পাকিস্তান জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছিলো ১৯৫১ সনের ২৪ জানুয়ারী, সোহরাওয়ার্দী এর কেন্দ্রীয় আহবায়ক নির্বাচিত হন।[১৩] ১৯৫২ সনের ডিসেম্বরে

লাহোরে অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী এক কনভেনশনের মাধ্যমে ঐক্যের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিলো মওলানা ভাসানী কারাগারে থাকাকালে ঃ ১৯৫১ সনে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি ভাষা আন্দোলনকালে ১৯৫২ সনে আবার গ্রেফতার হন, মুক্তি পান ১৯৫৩ সনের এপ্রিলে। ২১ এপ্রিল অনুষ্ঠিত সাংগঠনিক কমিটির সভায় ঐক্যের সিদ্ধান্তটিকে অনুমোদন করা হয়, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় জুলাই -এর কাউন্সিল অধিবেশনে।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী আওয়ামী লীগের ঘোষণা এবং সকল কর্মসূচী স্বীকার করে নেয়ার পরই সাংগঠনিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তটি গৃহিত হয়। সভাপতি হিসেবে মওলানা ভাসানী অধিবেশনে বলেন ঃ 'সোহরা-ওয়ার্দী সাহেবের সাথে আমাদের সম্পর্ক যা-ই হোক না কেন, আওয়ামী লীগের কর্মসূচীর প্রশ্নে কেউ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করলে আমরা সম্পর্কের বিষয়টি নতুনভাবে বিবেচনা করতে বাধ্য হবো।'[১৪] মওলানা ভাসানীর বক্তব্য অনুযায়ী স্বায়ত্তশাসনের দাবীটিকে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের কর্মসূচীতেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আওয়ামী লীগের এই অধিবেশ-নেই শামসুল হকের স্থলে শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

৪. ৫৪-র নির্বাচন ঃ সাফল্যের পথে অভিযাত্রা

১৯৫৪ সনের সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগ পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে সর্বাত্মকভাবে তুলে ধরে। পূর্ব বাংলার অধিকার আদায়ের স্বার্থে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে পরাজিত করার লক্ষ্যে শেরে বাংলা ফজলুল হকের সাথে আলোচনার মাধ্যমে মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ ও কৃষক-শ্রমিক পার্টির (প্রতিষ্ঠা ঃ ২৭ জুলাই, ১৯৫৩) সমন্বয়ে ১৯৫৩ সনের ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন।[১৫] পরবর্তীকালে হাজী মোহাম্মদ দানেশ ও মাহমুদ আলীর নেতৃত্বাধীন গণতন্ত্রী দল (প্রতিষ্ঠা ঃ ১৭ জানুযারী, ১৯৫৩) এবং পূর্ব পাকি-স্তানের কমিউনিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগের সাথে ঐক্যমতের ভিত্তিতে এবং মওলানা আতাহার আলীর নিজাম-ই-ইসলাম পার্টি (প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৫৩) কৃষক-শ্রমিক পার্টির সাথে পৃথক 'দশ দফা' চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে যুক্তফ্রন্টের অংগ সংগঠনে পরিণত হয়। অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগ সম্পাদক আবুল হাশিমের খিলাফত-ই-রব্বানী পার্টিও

(প্রতিষ্ঠা ঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩) যুক্তফ্রন্টের মিত্র সংগঠন হিসেবে কাজ করেছিলো।

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী কর্মসূচী হিসেবে ১৯৫৪ সনের জানুয়ারীতে ঘোষিত 'একুশ দফা'য় প্রধানতঃ পূর্ব বাংলার জনগণের বিভিন্ন দাবী ও অধিকার আদায়ের অংগীকার করা হয়েছিলো। স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে এর উনিশতম দফায় বলা হয় ঃ লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলাকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেয়া ও সার্বভৌমিক করা হবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত সকল বিষয়কে প্রদেশের কর্তৃত্বে আনা হবে। দেশরক্ষা বিভাগের স্থল বাহিনীর সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে ও নৌ বাহিনীর সদর দফতর পূর্ব বাংলায় স্থাপিত হবে, পূর্ব বাংলাকে আত্মরক্ষায় স্বয়ং-সম্পূর্ণ করার জন্য প্রদেশে অস্ত্র নির্মাণের কারখানা স্থাপন করা হবে। আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হবে।[১৬]

প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, যুক্তফ্রন্টের একুশ দফায় স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত এই প্রস্তাবটি ছিলো মূলতঃ আওয়ামী লীগের প্রচেষ্টারই ফলশ্রুতি। কেননা, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন কৃষক-শ্রমিক পার্টির কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত থাকলেও ফজলুল হক নিজাম-ই-ইসলাম পার্টির সভাপতি মওলানা আতাহার আলীর সাথে ১৯৫৩ সনের ২৮ ডিসেম্বর যে 'দশ দফা' চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন, তার ভিত্তি ছিলো 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' এবং এতে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি উপস্থিত ছিলোনা।[১৭] অন্যদিকে একুশ দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থনের অংগীকার করার পরই আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রী দলকে যুক্তফ্রন্টের সহযোগী সংগঠনের মর্যাদা দিয়েছিলো। ফজলুল হকের সহযোগী নিজাম-ই-ইসলাম পার্টি 'কমিউনিস্টদের মনোনয়নদানের' অভিযোগে যুক্তফ্রন্ট থেকে প্রাপ্ত ১৯টি আসনের বাইরেও নিজস্ব ১৮ জন প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিলো। নির্বাচনের পর ১৯৫৪ সনের ২ এপ্রিল অনুষ্ঠিত যুক্তফ্রন্টের সভায় মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে বিষয়টি তদন্ত করার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়, অবশ্য কোনো ব্যবস্থা গৃহিত হয়নি।

১৯৫৪ সনের ১০ মার্চ অনুষ্ঠিত পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচনে একুশ দফার ভিত্তিতে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট বিপুলভাবে জয়লাভ করে। ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট পায় ২২৩টি ঃ এর মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৪৩, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ৪৮, নিজাম-ই-ইসলাম পার্টি

১৯ এবং গণতন্ত্রী দল ১৩টি আসন লাভ করে। অমুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত ৭২টি আসনের মধ্যে গণতন্ত্রী দল ৩টি ও কমিউনিস্ট পার্টি ৪টি আসন লাভ করায় যুক্তফ্রন্টের সর্বমোট সদস্য সংখ্যা হয় ২৩০। অপরদিকে মুসলিম লীগ পেয়েছিলো মাত্র ১০টি আসন।[১৮]

৫. যুক্তফ্রন্টে ভাঙন ঃ ষড়যন্ত্রের রাজনীতির সংক্রমণ

যুক্তফ্রন্ট সংসদীয় দলের নেতা হিসেবে ফজলুল হক ১৯৫৪ সনের ৩ এপ্রিল পূর্ব বাংলায় চার সদস্যের মন্ত্রীসভা গঠন করেন, হক-সোহরাওয়ার্দী মনোমালিন্যের কারণে আওয়ামী লীগ বাদ পড়ে। আওয়ামী লীগ থেকে মন্ত্রী নেয়া হয় ১৫ মে। কিন্তু নানা মিথ্যে অজুহাতে এই মন্ত্রীসভাকে বাতিল করে ২৯ মে পূর্ব বাংলায় ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইনের ৯২-ক ধারা প্রবর্তনের মাধ্যমে গভর্নরের শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিভিন্ন কারণ দেখানো হলেও ৯২-ক ধারা প্রবর্তনের প্রকৃত কারণ ছিলো স্বায়ত্তশাসনসহ পূর্ব বাংলার জনগণের অধিকার আদায়ের আকাংখাকে সমূলে বিনাশ করা। এর প্রমাণ মেলে 'তরবারি ঘোরাতে ঘোরাতে আগত' নবনিযুক্ত গভর্নর মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জার আস্ফালন থেকে ঃ 'ভাসানীকে আমি গুলি করিয়া হত্যা করিব।'[১৯] কারণ, মওলানা ভাসানী ছিলেন পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের আপোষহীন প্রবক্তা।

ষড়যন্ত্রের যে রাজনীতি পাকিস্তান থেকে সংসদীয় গণতন্ত্রকে নির্বাসন দিয়ে প্রাসাদ রাজনীতির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলো, তাকেই পর্যায়ক্রমে পূর্ব বাংলায়ও সংক্রমিত করা হয়। আর এই প্রক্রিয়াকে অবাধ করার প্রয়োজনে মওলানা ভাসানীর পাকিস্তান প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় ঃ সুইডেনের স্টকহোমে আয়োজিত বিশ্বশান্তি পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য তিনি ১৯৫৪ সনের ২৭ মে করাচী ত্যাগ করেছিলেন। ১৯৫৫ সনের ২৫ এপ্রিল ঢাকা ফেরার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ইয়োরোপে এবং জানুয়ারী (১৯৫৫) থেকে কোলকাতায় অবস্থান করেন। ২২ এপ্রিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইস্কান্দার মীর্জা ঘোষণা করেন যে, মওলানা ভাসানীর ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।

ষড়যন্ত্রের পথে পূর্ব বাংলার দাবী-দাওয়াকে অবদমিত করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রের কর্মকান্ডের প্রধান লক্ষ্য ছিলো যুক্তফ্রন্টের মধ্যে ভাঙন ধরানো।

মওলানা ভাসানীর অনুপস্থিতিতে এবং হক-সোহরাওয়ার্দীর দীর্ঘদিনের শত্রুতাপূর্ণ সম্পর্কের প্রেক্ষিতে তা সহজসাধ্যও হয়েছিলো। নির্বাচনের পর থেকে মন্ত্রীত্ব নিয়ে সংঘাতের যে সূত্রপাত হয়, তারই পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিলেন আওয়ামী লীগ সম্পাদক শেখ মুজিব : ১৯৫৫ সনের ১৭ ফেব্রুয়ারী যুক্তফ্রন্টের সংসদীয় দলের সভায় তিনি ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করলে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে গিয়েছিলো। আবুল মনসুর আহমদ সহ অনেকেই মুজিবকে সমর্থন করতে পারেননি, ওদিকে কোলকাতা থেকে এক বিবৃতিতে মওলানা ভাসানীও যুক্তফ্রন্টের ঐক্যরক্ষার আহবান জানিয়েছিলেন।[২০] এই ভাঙনের ফলে সংগঠন হিসেবে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয় আওয়ামী লীগ. কেননা, ৯২-ক ধারা প্রত্যাহারের পর ১৯৫৫ সনের ৬ জুন আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় গঠিত মন্ত্রীসভা 'যুক্তফ্রন্ট' নাম নিয়েই শপথ নিয়েছিলো, মাঝখান থেকে ৩৯ জন সদস্য দলত্যাগ করায় আওয়ামী লীগের পরিষদ সদস্য সংখ্যা কমে হয়েছিলো ১০৪ জন।[২১] ওদিকে গণপরিষদের ৩১টি মুসলিম আসনের নির্বাচনে 'যুক্তফ্রন্ট' পায় ১৬টি, আওয়ামী লীগের জোটে মাত্র ১২টি (পরবর্তীকালে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে সদস্য সংখ্যা একটি বৃদ্ধি পায়)। সে অবস্থায় দাবী জানানো এবং আন্দোলন করা ব্যতীত স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে প্রাদেশিক রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের আর কিছু করণীয় ছিলোনা।

যুক্তফ্রন্টের এই ভাঙন পূর্ব বাংলার স্বার্থ বিরোধী কেন্দ্রীয় ষড়যন্ত্রকারী শাসকচক্রের শক্তিবৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিলো। তারা নিজেদের নীল নক্শানুযায়ী ফজলুল হক এবং সোহরাওয়ার্দীকে সাথে নিয়ে সাফল্যের সাথে তাদের কাঁধে সওয়ার হয়ে পূর্ব বাংলা বিরোধী ষড়যন্ত্র কার্যকর করতে শুরু করে। এই সংঘাত এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিলো যে শক্তিশালী কেন্দ্রের ভিত্তিতে রচিত ১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্রের বিরোধিতার ক্ষেত্রেও এই দুই ব্যক্তিত্ব একত্রিত হতে পারেননি : সোহরাওয়ার্দী ছিলেন গণপরিষদে বিরোধী নেতার আসনে, আর ফজলুল হক তখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই সুযোগে পূর্ব বাংলাকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, 'পূর্ব পাকিস্তান' নাম এবং সংখ্যাসাম্যও চাপানো হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রবর্তিত হয় গণবিরোধী এক ইউনিট ব্যবস্থা।

৬. ভাসানীর অব্যাহত আন্দোলন ঃ ৫৬-র শাসনতন্ত্রের বিরোধিতা

ষড়যন্ত্রের মুখেও মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ অবশ্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। ১৯৫৫ সনের ১৭ জুন পল্টন ময়দানে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের বিরাট জনসভায় একুশ দফা ভিত্তিক পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের বিধান সম্বলিত শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবী জানানো হয়। ২৩ জুন আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সভার সিদ্ধান্তে স্বায়ত্তশাসন আদায় করতে ব্যর্থ হলে দলের গণপরিষদ সদস্যদের পদ-ত্যাগ করতে বলা হয়।[২২] এরপর ১৯৫৫ সনের ২১, ২২ ও ২৩ অক্টোবর ঢাকার কাউন্সিল অধিবেশনে এবং ২৬ নভেম্বর কাগমারী অধিবেশনে গৃহিত বিভিন্ন প্রস্তাবের মাধ্যমে একুশ দফা ভিত্তিক স্বায়ত্ত-শাসনের দাবীকে তুলে ধরা হয়। শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সনের ৯ জানুয়ারী থেকে গণপরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হলে আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার সর্বত্র সভা ও মিছিলের মাধ্যমে দাবীটি তুলে ধরতে থাকে। ১৯৫৬ সনের ৬ জানুয়ারী এক সমাবেশে মওলানা ভাসানী পূর্ব বাংলার স্বার্থের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে শাসনতন্ত্রে একুশ দফার বাস্তবায়ন দাবী করেন।[২৩] ১৫ জানু-য়ারী পল্টন ময়দানের বিরাট জনসভায় মওলানা ভাসানী প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রকে 'নির্যাতিত জনগণকে শৃংখলিত করার এক মহা ষড়যন্ত্র' আখ্যা দিয়ে এর বিরুদ্ধে 'প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তোলার' আহবান জানান। তিনি বলেন যে গত আট বৎসরে কেন্দ্র পূর্ব বাংলাকে শোষণ করে এবং ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত রেখে অর্থনৈতিক দিক থেকে পংগু করে ফেলেছে। এর ফলে বেকারত্ব বেড়েছে, মানুষের ক্রয় ক্ষমতা লোপ পেতে চলেছে। শাসনতন্ত্র সম্পর্কে অভিযোগ জানিয়ে মওলানা ভাসানী বলেন যে কেন্দ্রের হাতে সমস্ত অর্থকরী ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, ফলে পূর্ব বাংলা অর্থনৈতিক দিক থেকে অচল হয়ে যাবে। প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য তিনি ১৯৫৬ সনের ১৬ থেকে ২২ জানুয়ারী পর্যন্ত ছাত্র জনতাকে কালো ব্যাজ ধারণ করতে বলেন এবং ২৯ জানুয়ারী প্রদেশব্যাপী 'অগণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রতিরোধ দিবস' পালনের আহবান

জানান। তিনি একুশ দফা ভিত্তিক সর্বজনগ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য ঢাকায় একটি 'সর্বদলীয় কনভেনশন' আয়োজনের প্রস্তাব দেন। মওলানা ভাসানী দাবী জানিয়ে বলেন যে যতদিন পর্যন্ত পূর্ব বাংলার বঞ্চিত অর্থ দেয়া না হবে ততদিন পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য কেন্দ্র থেকে কোন অর্থ মঞ্জুর করা চলবে না।[২৪] তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন ঃ কেন্দ্র যদি একুশ দফা তথা স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে অবহেলা করে তাহলে পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্নতার কথা চিন্তা করতে হবে। উল্লেখ্য যে মওলানা ভাসানীর এই উক্তি ত্বরিত প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছিলো ঃ গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা তাকে বিদেশী শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত 'রাষ্ট্র-দ্রোহী' আখ্যা দিয়েছিলেন।[২৫]

৭. ফজলুল হকের পূর্ব বাংলা বিরোধী ভূমিকা ঃ মওলানা ভাসানীর ১৬ দিনব্যাপী অনশন

স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের সে পর্যায়ে ১৯৫৬ সনের ২৪ জানুয়ারী কাগমারীতে অনুষ্ঠিত গণপরিষদ সদস্য সহ আওয়ামী লীগ ওয়াকিং কমিটির বৈঠকে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে শাসনতন্ত্রে স্বায়ত্তশাসন সহ একুশ দফার ভিত্তিতে সংশোধনী আনতে ব্যর্থ হলে পরিষদ সদস্যরা অধিবেশন বর্জন করবেন।[২৬] গণপরিষদের শাসনতন্ত্র বিতর্কে আওয়ামী লীগের পক্ষে আবুল মনসুর আহমদ যুক্তিপূর্ণ সুদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন, পশ্চিম পাকিস্তানের সংবাদপত্র সমূহ তাকে 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দিয়ে তার বিচার দাবী করেছিলো।[২৭] আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান এবং বিরোধী দলের নেতা হিসেবে সোহরাওয়ার্দীও জোরালো বক্তব্য রাখেন।[২৮] কিন্তু ক্ষমতাসীন চৌধুরী মোহাম্মদ আলী মন্ত্রীসভার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফজলুল হকের কৃষক-শ্রমিক পার্টি এবং নিজাম-ই-ইসলাম পার্টির সক্রিয় সহযোগিতায় আওয়ামী লীগের বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯৫৬ সনের ২৯ ফেব্রুয়ারী শাসনতন্ত্রটি পাশ হয়ে যায়। প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের ১২ জন সদস্য ওয়াক আউট করেন, তাদের সঙ্গে আসেন গণতন্ত্রী দলের মাহমুদ আলী, আজাদ পাকিস্তান পার্টির মিয়া ইফতিখার উদ্দিন এবং অমুসলিম সদস্যদের গরীষ্ঠ অংশ।[২৯] ফজলুল হকের কৃষক-শ্রমিক পার্টি স্বায়ত্তশাসনের সপক্ষে দু'চারটি কথা বললেও কেন্দ্র ও প্রদেশে ক্ষমতার অংশিদারিত্ব রক্ষার স্বার্থে বিরোধিতার পরিবর্তে শাসনতন্ত্রের পক্ষে

ভোট দেয়। ওদিকে ফজলুল হকের সহযোগী নিজাম-ই-ইসলাম পার্টি স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে কোনো ভূমিকাই রাখেনি। বরং দলটির গণপরিষদ সদস্য মওলভী ফরিদ আহমদ বলেছিলেন যে তার সংগঠনের অংগীকার কেবল কৃষক-শ্রমিক পার্টি'র সাথে স্বাক্ষরিত 'দশ দফা'র বিষয়ে, একুশ দফার প্রশ্নে তাদের কোনো দায়িত্ব নেই।[৩০]

গণপরিষদে গৃহিত হওয়ার পর গভর্নর জেনারেল হিসেবে ইস্কান্দার মীর্জা শাসনতন্ত্রটিতে স্বাক্ষর করেন ১৯৫৬ সনের ২ মার্চ, শাসনতন্ত্র কার্যকরী হয় ২৩ মার্চ। এ উপলক্ষে আয়োজিত প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানটি আওয়ামী লীগ সদস্যরা বয়কট করেন, মওলানা ভাসানী ১৬ মার্চ পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে এবং 'ইসলামের নামে জনগণের অধিকার হরণের' প্রতিবাদে সারা দেশব্যাপী জেহাদের আহবান জানান, ঐদিন পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবাদ সমাবেশ।

শাসনতন্ত্র পাশ হলেও আওয়ামী লীগ তার স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে থাকে। এ সময়ে পূর্ব বাংলায় মারাত্মক খাদ্যঘাটতি দেখা দিলে অবিলম্বে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানীর জন্য পঞ্চাশ কোটি টাকা বরাদ্দের দাবীতে মওলানা ভাসানী ১৯৫৬ সনের ২ মে থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন শুরু করেন। চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর সরকার তার দাবী মেনে নেয়ার পর তিনি ষোল দিনব্যাপী অনশন প্রত্যাহার করেন।[৩১] এরপর ১৯৫৬ সনের ১৯-২০ মে ঢাকায় অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে আওয়ামী লীগ পুনরায় তার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী তুলে ধরে।

ওপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এ কথা পরিষ্কার হয় যে পূর্ব বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ছিলো প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই আওয়ামী লীগের প্রধান দাবী। এ প্রশ্নে বিভিন্ন সময়ে নির্যাতন-নিপীড়নসহ সকল প্রতিকূলতার মুখেও আওয়ামী লীগ তার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। ১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্র গৃহিত হওয়ার সময় আওয়ামী লীগ সদস্যরা অধিবেশন বর্জন করে এ-কথাই ঘোষণা করেছিলেন যে স্বায়ত্তশাসনসহ পূর্ব বাংলার অধিকারসমূহ অস্বীকৃত হওয়ায় শাসনতন্ত্রটি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। ১৯৫৬ সনের ১৯-২০ মে-র কাউন্সিল অধিবেশনও প্রত্যাখ্যানের ঘোষণাটিকেই জোরদার করেছিলো। কাগমারী সম্মেলনের পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে ওপরের আলোচনা এবং ঘটনাপ্রবাহের কথা মনে রাখতে হবে।

খ. পররাষ্ট্রনীতি প্রসঙ্গে
মওলানা ভাসানী এবং আওয়ামী লীগ

১. 'সমাজতান্ত্রিক প্রভাব'-বিরোধী যুদ্ধজোটের মার্কিনী উদ্যোগ : ভারতের অসম্মতি, পাকিস্তানের আগ্রহ

এবার কাগমারী সম্মেলনের দ্বিতীয় বিষয় পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি প্রসংগে আওয়ামী লীগের দৃষ্টিভংগী এবং বক্তব্য আলোচনা করা দরকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকালটি ছিলো বিশ্বব্যাপী শক্তি ও ক্ষমতার ভারসাম্যের এক অস্থিরতা ও পরিবর্তনের যুগ। ইংরেজরা সরে যাওয়ায় ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এবং বৃটিশ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা বিতাড়িত হওয়ায় ভূমধ্য ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিলো, সে শূন্যতা পূরণে এগিয়ে আসছিলো সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার নতুন নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সদ্যপ্রতিষ্ঠিত গণচীনের সম্ভাব্য 'সমাজতান্ত্রিক প্রভাব' বিস্তারকে রোধ করার দায়িত্বও বর্তায় আমেরিকার ওপরই। পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রতি তাই তার দৃষ্টি পড়েছিলো স্বাভাবিক কারণেই। কিন্তু ভারত তাকে নিরাশ করে : ১৯৫১ সন থেকে সামরিক এবং অর্থনৈতিক সাহায্য গ্রহণ করলেও কোনো যুদ্ধজোটে যেতে সে রাজী হয়নি। এর কারণ : ত্রিশের দশকেই ভারতে বৃহৎ শিল্পের বিকাশ ঘটেছিলো, ফলে ভারতের বুর্জোয়ারা মার্কিন-জোটের বাধ্যবাধকতা এড়ানোর মতো অবস্থায় পেঁাছে গিয়েছিলো, তদুপরি তাদের ছিলো সোভিয়েত সাহায্যপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা।

কিন্তু পাকিস্তানের বেলায় পরিস্থিতি ছিলো অন্যরকম : প্রধানতঃ ভারত থেকে আগত মোহাজির বুর্জোয়াদের ভিত্তি তখন অত্যন্ত দুর্বল, যত শর্তযুক্তই হোক না কেন, নিজেদের বিকাশের স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদী সাহায্যকে তারা অপরিহার্য মনে করতো। ওদিকে প্রকাশ্য কূটনীতির ক্ষেত্রে পাকিস্তানের ছিলো 'হিন্দুস্থানী হামলার' আশংকা এবং একথা তাদের সাফল্যের সাথে বোঝানো হয়েছিলো, কিংবা নিজেরাই বুঝে নিয়েছিলো যে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রতি সোভিয়েত দৃষ্টিভংগী 'বন্ধুত্বপূর্ণ' হবেনা। এরই পাশাপাশি অন্য একটি কারণও ক্রিয়া

করেছে ঃ ধ্যান-ধারণার দিক থেকে পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন নেতারা আগে থেকেই ছিলেন পাশ্চাত্যমুখী। ফলে পাকিস্তানকে 'মিত্র' হিসেবে পাওয়া আমেরিকার জন্য আদৌ কণ্টকর ব্যাপার হয়নি। পাক-মার্কিন সম্পর্কের সূচনা হয়েছিলো অত্যন্ত অভদ্রভাবে ঃ সোভিয়েত নেতা যোসেফ স্ট্যালিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে রাষ্ট্রীয় সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ১৯৪৯ সনের জুলাই মাসে। আমেরিকা তখনো পর্যন্ত ভারতকে নিয়ে বেশী ব্যস্ত ছিলো, পাকিস্তানের নেতারা তাই স্ট্যালিনের আমন্ত্রণটিকে আমেরিকার সাথে দর কষাকষির বিষয়ে পরিণত করেন, জুটে যায় ওয়াশিংটনের আমন্ত্রণ। লিয়াকত আলী খান অসভ্যতার সাথে স্ট্যালিনকে অসম্মান করে সোভিয়েত সফর স্থগিত রাখেন এবং প্রেসিডেণ্ট হ্যারী ট্রুম্যানের কাছ থেকে আদায় করা আমন্ত্রণে ওয়াশিংটন ঘুরে আসেন।[৩২] সে-ই ছিলো সূচনা।

২. মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী হাওয়া ঃ পাকিস্তান 'শিখণ্ডি' মনোনীত

'মিত্র' হওয়ার প্রশ্নে ভারতের অসম্মতি এবং পাকিস্তানের ভৌগলিক অবস্থান ওয়াশিংটনকে করাচীর প্রতি বেশী আগ্রহী করে তোলে। নতুন মিত্রের জন্য তারা খুলে দেয় সাহায্যের দ্বার ঃ এই সাহায্য ক্রমশঃ শর্তযুক্ত হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে জোটে অংশ নেয়ার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। অন্য একটি কারণও তখন ক্রিয়াশীল ছিলো ঃ আরব বিশ্বের দেশ-গুলিকে নিয়ে 'মধ্যপ্রাচ্য প্রতিরক্ষা সংস্থা' (Medo) গঠনের লক্ষ্যে মার্কিনী প্রয়াস সে সময় নানা কারণে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছিলো ঃ ইসরাইলের প্রতিষ্ঠার পেছনে আমেরিকার ভূমিকা কোনো গোপন ব্যাপার ছিলোনা, তদুপরি মধ্যপ্রাচ্যে তখন চলছিলো পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম। ফলে পাকিস্তানকে মুসলিম দুনিয়ায় নিজের 'মুখপাত্র' বানানোর জন্য আমেরিকা সিদ্ধান্ত নেয়। পাকিস্তানের নেতারা বিশ্বস্ততার সাথে সে-দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বিশেষ করে কর্নেল গামাল আবদেল নাসেরের নেতৃত্বে বিপ্লবোত্তর মিসরের বিরোধিতায় সফল হতে পারেননি। 'মুসলিম দেশগুলির পারস্পরিক স্বার্থে যৌথভাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি সংস্থা গঠনের উদ্দেশ্যে' পাকিস্তান ১৯৫২ সনের প্রথম দিকে ১২টি মুসলিম দেশের প্রধানমন্ত্রীদের এক

সম্মেলন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। মিসর এর বিরোধিতা করে, অন্য কোনো দেশও সাড়া দেয়নি। এর ফলে বরং পাকিস্তান সম্পর্কেই মুসলিম বিশ্বে সন্দেহ-সংশয়ের সৃষ্টি হয়। তারা উদ্যোগটির পেছনে পাকিস্তানের এমন এক 'খেলার উদ্দেশ্য' দেখতে পায়, যার মাধ্যমে পাকিস্তান মুসলিম বিশ্বের নেতায় পরিণত হতে চাচ্ছিলো।[৩৩] ইসলামের নামে পাকিস্তানের তৎপরতাকে মুসলিম বিশ্ব বাড়াবাড়ি মনে করেছে, আর এর কারণ ঃ তুলনামূলকভাবে উন্নত ও বৃহত্তম দেশ মিসর সহ মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলি সে সময় নতুন আশা-আকাংখা নিয়ে প্রগতির পথে যাত্রা শুরু করেছিলো। তাদের সে উত্থানের পেছনে ক্রিয়া করেছে ভৌগলিক ও বর্ণবাদী জাতীয়তাবোধ, তা ছিলো পাশ্চাত্যবিরোধী এবং শ্বেতাঙ্গ-বিরোধী জাগরণঃ সেখানে ধর্মের ভূমিকা ছিলো অত্যন্ত গৌণ, প্রধান ভূমিকা রেখেছে ভাষা, বর্ণ এবং শোষণ ও উপনিবেশবাদ-বিরোধী চিন্তাধারা। ফলে পাকিস্তান মার্কিনী পরিকল্পনা মতো 'মুসলিম বিশ্বের মোড়ল' হতে ব্যর্থ হয়েছিলো।

৩. পাকিস্তানের রাজনীতিতে মার্কিন হস্তক্ষেপ শুরু

সে অবস্থায় ছেড়ে দেয়ার পরিবর্তে আমেরিকা বরং আরো শক্ত করে হাল ধরেছিলো। আমেরিকা তখন তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন ফস্টার ডালেসের 'ঘেরাও পরিকল্পনা' তথা Containment Policy-র পথে এগোতে শুরু করেছে। এর উদ্দেশ্য ছিলো 'সমষ্টিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা'র মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণচীনকে ঘেরাও করা, মধ্যপ্রাচ্যও ছিলো এ-নীতির অন্যতম লক্ষ্যস্থল। এই পরিকল্পনা কার্যকর করার প্রশ্নে পাকিস্তান আমেরিকার অন্যতম 'মিত্র' মনোনীত হওয়ায় পাকিস্তানের রাজনীতিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনাও তখন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। আর এক্ষেত্রে 'নবাব' জাতীয় আয়েশী অনুসারী কিংবা কোনো তথাকথিত জননেতার চাইতে 'অতি অনুগত ভৃত্য' আমেরিকার বেশী প্রয়োজন ছিলো। একারণেই পরিষদে 'সংখ্যাগরিষ্ঠতা' এবং পাশ্চাত্যমুখী আনুগত্য থাকা সত্ত্বেও খাজা নাজিমুদ্দিনকে সরিয়ে ১৯৫৩ সনের ১৭ এপ্রিল ওয়াশিংটনে কর্মরত রাষ্ট্রদূত বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে প্রধান-মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। নিযুক্তির কাজটিও করানো হয় আর এক প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদকে দিয়ে।

কেউ কেউ বলেছেন যে পাশ্চাত্যমুখীনতা সত্ত্বেও খাজা নাজিমুদ্দিন নাকি যুদ্ধজোট বিরোধী ছিলেন, আর সেটাই ছিলো তার পরিণতির কারণ।[৩৪]

এই অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানে নামে মাত্র হলেও যে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি চলছিলো তার অবসান ঘটে। আর একই সাথে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে বাস্তবায়িত হতে থাকে পাকিস্তানকে সাম্রাজ্যবাদী জোটভুক্তকরণের পরিকল্পনা। ১৯৫৩ সনের মে মাসে পাকিস্তান সফরে আসেন ঘেরাও পরিকল্পনার নায়ক জন ফস্টার ডালেস, তার পরপর কাজ গুছিয়ে যান আমেরিকার 'হাউস আর্মড সার্ভিসেস কমিটি'র সাতজন সদস্য। সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইউব খান আমেরিকা সফর করেন। ১২ নভেম্বর গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ 'চিকিৎসার' উদ্দেশ্যে ওয়াশিংটন যান, প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এবং ফস্টার ডালেসের সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটে। 'নিউইয়র্ক টাইমস' তার ১৬ নভেম্বর (১৯৫৩) সংখ্যায় লেখে ঃ 'পাকিস্তানকে অস্ত্রসজ্জিত করা হলে সে আমেরিকাকে তার ঘাঁটিসমূহ ব্যবহার এবং প্রয়োজনে নতুন ঘাঁটি নির্মাণ করতে দেবে। এই শর্তে পাকিস্তান মধ্যপ্রাচ্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায়ও যোগদানে সম্মত আছে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র পাবে সোভিয়েত হৃৎপিন্ডের সবচেয়ে কাছাকাছি একটি অঞ্চল এবং আড়াই লক্ষের একটি বন্ধুপ্রতিম সেনাবাহিনী।'[৩৫]

এই প্রক্রিয়ায় এর পর ১৯৫৩ সনের ৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানে চার দিনের রাষ্ট্রিয় সফরে আসেন মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন। তিনি অনতিবিলম্বে পাকিস্তানকে 'শক্তিশালী' করার জন্য করাচী এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে 'ব্যবস্থাগত সম্পর্ক পাকাপাকি' করার ওপর জোর দেন। ফেরার পথে কলোম্বো বিমান বন্দরে নিক্সন বলেন ঃ 'আমরা পাকিস্তানকে সামরিক ক্ষেত্রে বন্ধু এবং অংশিদার হিসেবে পাচ্ছি—এটা কেবল পাকিস্তানের নিজের প্রতিরক্ষার জন্য নয়, সমগ্র সেই অঞ্চলের জন্যেও মঙ্গলকর, যেখানে কমিউনিজম তার লোভাতুর দৃষ্টি ফেলেছে।'[৩৬]

৪. ভাসানীর প্রতিবাদ ঃ আওয়ামী লীগের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কর্মসূচী

দু'দেশের নায়কদের এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অত্যন্ত দ্রুত উন্নত হচ্ছিলো এবং এর পেছনের উদ্দেশ্যটিও অচিরেই উন্মোচিত হয়ে পড়ে ঃ আমেরিকা

পাকিস্তানকে মধ্যপ্রাচ্যে তার শিখণ্ডি বানাতে চাচ্ছে, চাচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ায় সমাজতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে ঘায়েলের মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহার করতে। সে পরিস্থিতিতে প্রথম প্রতিবাদী রাজনৈতিক দল হিসেবে এগিয়ে এসেছিলো আওয়ামী লীগ। নাজিমুদ্দিন সরকার কর্তৃক কারা নির্যাতন ভোগ করলেও মওলানা ভাসানী সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের সুদূরপ্রসারী পরিণতির প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর অপসারণের বিরোধিতা করেন। সেদিনই, ১৯৫৩ সনের ১৭ এপ্রিল, পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের জনসভায় তিনি গোলাম মোহাম্মদের পদক্ষেপটিকে 'সম্পূর্ণ বে-আইনী এবং অগণতান্ত্রিক' আখ্যা দিয়ে তার তীব্র সমালোচনা করেন।[৩৭]

১৯৫৩ সনের ১৪ ও ১৫ নভেম্বর ময়মনসিংহ শহরে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে আওয়ামী লীগ এক প্রস্তাবে 'ইঙ্গ-মার্কিন ব্লক কর্তৃক মধ্যপ্রাচ্য রক্ষণ জোট কিংবা অনুরূপ কোনো জোটে পাকিস্তানকে জড়ানোর তীব্র নিন্দা' করে।[৩৮] আমেরিকার সাথে সামরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠারও বিরোধিতা করা হয়। উল্লেখ্য যে এই প্রস্তাব আওয়ামী লীগের কোনো আকস্মিক নীতিগত সিদ্ধান্ত ছিলো না। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই দলটি ছিলো সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে অংগীকারাবদ্ধ। আওয়ামী লীগের প্রথম ঘোষণাতেই বলা হয়েছিলো: 'পাকিস্তান বিদেশী প্রভাবমুক্ত একটি পূর্ণ স্বাধীন সার্বভৌম জনকল্যাণ রাষ্ট্র হইবে।'[৩৯] সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে পাকিস্তানের জন্য তখনো প্রধান রূপে বিবেচিত হতো বৃটেন এবং আওয়ামী লীগ তার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বক্তব্য রাখতে গিয়ে বৃটিশ কমনওয়েলথ থেকে পাকিস্তানের সদস্য-পদ প্রত্যাহার এবং সমগ্র বৃটিশ ও বৈদেশিক ব্যবসাকে রাষ্ট্রায়ত্তকরণের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলো।[৪০] সাম্রাজ্যবাদীরা যে মুসলিম দেশগুলিকে তাড়া করার কাজে পাকিস্তানকে ব্যবহার করতে চাচ্ছিলো, আওয়ামী লীগ সেই মুসলিম বিশ্বের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠারও কর্মসূচী উপস্থিত করেছিলো।[৪১] এছাড়া বিনাক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, কৃষিজমি কৃষকদের মধ্যে বন্টন, 'তেভাগা' নীতির বাস্তবায়ন, রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে সমবায় ও যৌথ কৃষি প্রথার প্রতিষ্ঠা এবং শিল্পে বিদেশী ও একচেটিয়া অধিকার বাতিল করে পাট, চা ও ব্যাংক-বীমা থেকে শুরু করে সকল মৌলিক দেশী-বিদেশী শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্তকরণে আওয়ামী লীগের কর্মসূচী ছিলো সাম্রাজ্যবাদের নয়া ঔপনিবেশিক যুগের

নীতি ও কৌশলের বিরুদ্ধে এক যুগান্তকারী প্রগতিশীল অগ্রযাত্রা।[৪২] প্রতিষ্ঠাকালীন নীতির সূত্র ধরেই আওয়ামী লীগ ১৯৫৩ সনের নভেম্বরে সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোটে পাকিস্তানের সম্ভাব্য যোগদানের বিরোধিতা করেছিলো।

৫. পূর্ব বাংলায় 'কমিউনিস্ট' আবিষ্কার শুরু ঃ পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর

আওয়ামী লীগ এবং তার সাথে গণতন্ত্রী দল, কমিউনিস্ট পার্টি এবং যুবলীগের বিরোধিতা সত্ত্বেও পাক-মার্কিন সম্পর্কের 'উন্নতি' অব্যাহত থাকে। ১৯৫৪ সনের নির্বাচনকে সামনে রেখে পাকিস্তানের নায়করা এতদিনের 'হিন্দুস্থানের দালালদের' সাথে একইযোগে 'কমিউনিস্টদেরও' অবস্থান আবিষ্কার করেন এবং সে 'আবিষ্কার' তাদের আমেরিকার প্রতি আরো বেশী ঝুঁকিয়ে দেয়। সাড়াও মিলে যায় ঃ ১৯৫৪ সনের ১০ মার্চ অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের প্রাক্কালে ২৫ ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য প্রদানের কথা ঘোষণা করেন। 'নিউইয়র্ক টাইম্‌স' প্রতিনিধি সিডনী এইচ সেল্টজবার্গের মতে এই ঘোষণার পরিষ্কার উদ্দেশ্য ছিলো 'পূর্ব বাংলার নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে সাহায্য করা।'[৪৩]

নির্বাচনের পর ১৯৫৪ সনের ৩ এপ্রিল গঠিত ফজলুল হক মন্ত্রীসভায় ১৫ মে আওয়ামী লীগের যোগদানের মাত্র তিন দিন পর ১৯ মে স্বাক্ষরিত হয়েছিলো 'পাক-মার্কিন পারস্পরিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তি।'[৪৪] করাচীতে চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার জাফরুল্লাহ খান এবং মার্কিন চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স কেনেথ ইমারসন। চুক্তির শর্তাবলীতে বলা হয় ঃ 'পাকিস্তান সরকার যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে যে সকল কর্মচারী পাবেন, তারা চুক্তি অনুসারে পাকিস্তানে থেকে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দায়িত্ব পালন করবেন এবং চুক্তি অনুযায়ী প্রদত্ত সাহায্য কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা পর্যবেক্ষন করার কর্তৃত্ব ও প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধে পাবেন। এই কর্মচারীরা পাকিস্তান সরকারের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে মার্কিন দূতাবাসের অংশ হিসেবে পরিগণিত হবেন এবং কূটনৈতিক মিশনের পরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছানুসারে পাকিস্তান সরকার উচ্চপদস্থ মার্কিন নৌ, বিমান ও স্থল বাহিনীর

অফিসারদের কূটনৈতিক মর্যাদা দান করবেন।' (৪র্থ পরিচ্ছেদের ১ম অনুচ্ছেদ) চুক্তির ৫ম পরিচ্ছেদের ২(ক) অনুচ্ছেদে বলা হয়ঃ '......... পাকিস্তান সরকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজনে এমন সব কাঁচামাল বা আংশিক-ভাবে নির্মিত দ্রব্যাদির উৎপাদন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি বা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করবেন যা পাকিস্তানে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব।' ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে বলা হয়ঃ 'পারস্পরিক নিরাপত্তার প্রয়োজনে বিশ্বশান্তির সপক্ষে বিঘ্নস্বরূপ এমন সব রাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে পাকিস্তান সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা করবেন।' এগুলি ছিলো চুক্তির প্রকাশযোগ্য দিক, যেগুলি মওলানা ভাসানীকে প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী জানিয়েছিলেন এবং সে সময় সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়েছিলো। চুক্তির অপ্রকাশিত শর্তানুযায়ী পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর চল্লিশ হাজার সৈন্যের যাবতীয় ব্যয়ভার আমেরিকা বহন করতো এবং বিনিময়ে পাকিস্তান আমেরিকাকে পেশোয়ারের কাছে একটি সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিলো।[৪৫]

আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে মওলানা ভাসানী এক বিবৃতিতে 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজদের সাথে সামরিক চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে মাতৃভূমিকে বন্ধক রাখার' তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান।[৪৬] আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আবুল মনসুর আহমদ ও আতাউর রহমান খান এবং সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান সহ বিভিন্ন দলের ১৬৭ জন পরিষদ সদস্য এক বিবৃতিতে বলেনঃ 'আমরা মনে করি যে এই চুক্তির ফলে আমাদের দেশও বিশ্বযুদ্ধের চক্রান্তে জড়িয়ে পড়বে, আমাদের দেশের ধনসম্পদ ও জনবল আমেরিকার যুদ্ধ-ষড়যন্ত্রে ব্যবহৃত হবে এবং আমাদের দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হবে।'[৪৭] উল্লেখযোগ্য যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার আগেই ১৯৫৪ সনের ২৫ এপ্রিল আওয়ামী লীগ 'পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বিরোধী দিবস' পালন করেছিলো।[৪৮]

৬. সামরিক চুক্তির আশু ফলাফলঃ ৯২-ক ধারার প্রবর্তনঃ লন্ডনে ভাসানীর প্রতিবাদ

'পাকিস্তানকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে' সম্পাদিত পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির প্রথম 'শিকার' হয়েছিলো পূর্ব বাংলা। ১৯৫৪ সনের ১৫ মে আওয়ামী লীগ হক মন্ত্রীসভায় যোগদানের দিনটিতেই আদমজীতে বাঙালী

অবাঙালী শ্রমিকদের দাংগা বাঁধে। উল্লেখ্য যে মওলানা ভাসানী তখন আদমজী মজদুর ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন। ইতিপূর্বে ২৩ মার্চ সংঘটিত হয়েছিলো চন্দ্রঘোনা কাগজ কলের দাংগা। জানা যায়ঃ বার্লিন দাংগাখ্যাত কয়েকজন মার্কিন গোয়েন্দা অফিসার সে সময় পাকিস্তানে এসেছিলেন।[৪৯] পাকিস্তান সরকার আদমজীর দাংগাকে 'কমিউনিস্টদের প্ররোচনায় সংঘটিত' বলেন, জবাবে মওলানা ভাসানী 'মিল কর্তৃপক্ষ, এক-শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী এবং নির্বাচনে পরাজিত মুসলিম লীগ প্রার্থীদের উদ্যোগে প্রণীত গভীর ষড়যন্ত্রকে' দায়ী করে মর্মান্তিক এ ঘটনার প্রকাশ্য তদন্ত দাবী করেন।[৫০] মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকও 'কমিউনিস্টদের যোগ-সাজশের' কথা অস্বীকার করে অভিযোগটিকে 'অসত উদ্দেশ্য প্রণোদিত' আখ্যা দেন।[৫১] 'ধ্বংসাত্মক তৎপরতায় লিপ্ত' পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধে 'আন্দোলনকারী কমিউনিস্টদের' দমন ও গ্রেফতারের জন্য প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর 'পরামর্শ'ও ফজলুল হক প্রত্যাখ্যান করেন। এর ফলাফল ফজলুল হকের জন্য শুভ হয়নিঃ 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এর ১৯৫৪ সনের ২৩ মে সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে ফজলুল হকের উক্তি হিসেবে বলা হয় যে, 'পূর্ব বাংলা স্বাধীনতার কথা চিন্তা করছে এবং স্বাধীনতার বিষয়টি কার্যকর করা হবে আমার মন্ত্রীসভার অন্যতম প্রাথমিক কার্যক্রম।' পরদিনই ফজলুল হক একথার প্রতিবাদ করেনঃ 'স্বাধীনতা' নয়, তিনি 'পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের' কথা বলেছেন। কিন্তু লাভ হয় না, ফজলুল হক, তথা পূর্ব বাংলাকে অসম্মান করে প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী তার বিচারের ব্যবস্থা করেনঃ সেখানে একমাত্র 'সাক্ষী' হিসেবে নেয়া হয় 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এর সেই সংবাদদাতা জন ক্যালাহানকে, 'বিচারক' ছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। ফজলুল হক অভিযোগ অস্বীকার করেন, ক্যালাহান দাবী করেন যে তিনি সঠিক উক্তিই লিখেছেন। 'রায়ে' পূব বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে 'দোষী' সাব্যস্ত করা হয়।[৫২]

এই অশ্রুতপূর্ব বিচারের পর ১৯৫৪ সনের ২৯ মে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ পূর্ব বাংলায় ৯২-ক ধারা জারী করেন, ফজলুল হককে বলেন 'রাষ্ট্রদ্রোহী'। ৩০ মে প্রচারিত বেতার ভাষণে প্রধানমন্ত্রী প্রদেশে কমিউনিস্টদের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা এবং তা দমনে কেন্দ্রের পরামর্শের প্রতি যুক্তফ্রন্ট সরকারের অস্বীকৃতির অভিযোগ উত্থাপন

করেন। পূর্ব বাংলার নতুন গভর্নর ইস্কান্দার মীর্জা ১০ জুনের প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে পরিস্থিতির জন্য 'কমিউনিস্টদের' দায়ী করেন। তার নির্দেশে 'কমিউনিস্ট' দলনের নামে ২০ জুনের মধ্যে ১০৫১ জনকে গ্রেফতার করা হয়। জুলাই-এর মধ্যে এই সংখ্যা ১৩০০ হয়েছিলো।[৫৩] ৬ জুলাই পূর্ব বাংলায় এবং ২৪ জুলাই পশ্চিম পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ৫৬, সিমসন রোড, ঢাকাস্থ আওয়ামী লীগ ও যুক্তফ্রণ্ট কার্যালয়ে তালা ঝোলানো হয় ৯২-ক ধারা জারীর পরপরই। গণতন্ত্রী দলও একই নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছিলো।

এটাই ছিলো পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাস্তবায়নের পথে প্রথম পদক্ষেপ। উল্লেখ করা দরকার যে ১৯৫৪ সনের ১ জুন অনুষ্ঠিতব্য পূর্ব বাংলার আইন পরিষদের প্রথম অধিবেশনে এই চুক্তিটি নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা ছিলো। একথা তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, প্রধানতঃ আওয়ামী লীগের পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিরোধিতাই ছিলো অগণতান্ত্রিক ৯২-ক ধারা প্রবর্তনের প্রধান কারণ। ১৯৫৪ সনের ১ জুন লণ্ডনের ব্রম্পটন রোডের 'গ্রীন মাস্ক' হোটেলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মওলানা ভাসানী ঘটনাটিকে 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পূর্ব বাংলার স্বার্থ-বিরোধী ষড়যন্ত্র' হিসেবে বর্ণনা করে তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিন ঘণ্টাস্থায়ী এই সাংবাদিক সম্মেলনে মওলানা ভাসানী বলেন ঃ 'হিংসায় হিংসা বৃদ্ধি পায়। এ কারণে আমরা সর্ব প্রকার সামরিক চুক্তির সমালোচক। দাসত্বমূলক যে কোনোরূপ চুক্তির চাইতে সমমর্যাদার ভিত্তিতে বন্ধুত্বমূলক বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক চুক্তি অধিক ফলপ্রসূ বলে আমি বিশ্বাস করি।'[৫৪]

৭. 'সিয়্যাটো' স্বাক্ষর ঃ গণপরিষদ বাতিল ঃ 'ক্যাবিনেট অব ট্যালেন্টস'

১৯৫৪ সনের ১৯ মে সম্পাদিত সামরিক চুক্তিটি ছিলো পাকিস্তানকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী জোট ভুক্তকরণের প্রক্রিয়ায় প্রথম পদক্ষেপ মাত্র ঃ পূর্ণায়নের প্রক্রিয়া তখনো চলছিলো। আমেরিকা অনুসৃত ডালেসীয় পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো এশিয়ায় সম্ভাব্য 'কমিউনিস্ট' সম্প্রসারণের' বিরুদ্ধে 'সমষ্টিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠা করা। পাকিস্তানসহ অনুসারী দেশগুলিতে 'অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টির পর ১৯৫৪ সনের ১০ সেপ্টেম্বর ম্যানিলায় গঠিত হয় নতুন সামরিক জোট 'সাউথ-ইস্ট এশিয়া ট্রিটি

অরগানাইজেশন', সংক্ষেপে 'সিয়্যাটো'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে এই সংস্থায় পাকিস্তান সহ যোগদানকারী দেশগুলি ছিলো বৃটেন, ফ্রান্স, নিউ-জিল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যাণ্ড এবং ফিলিপাইনস। সেদিনের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইউব খান সহ অনেকে অভিযোগ করেছেন যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাফরুল্লাহ্ খান তার নিজ দায়িত্বে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন, সরকার বা সেনাবাহিনী এ ব্যাপারে আগে থেকে অবহিত ছিলোনা, সরকার তাকে তেমন কোনো ক্ষমতাও দেয়নি।[৫৫] এর অর্থ কেবল এটাই হতে পারে যে পাকিস্তান সরকারের ওপর ততদিনে মার্কিন প্রভাব ও কর্তৃত্ব অত্যন্ত সংহত হয়েছিলো, যার জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার কার্যক্রমের অনুমোদনের প্রশ্নে সুনিশ্চিত ও দ্বিধাহীন ছিলেন। হয়েওছিলো তা-ই ঃ ১৯৫৫ সনের ১৯ জানুয়ারী পাকিস্তানের মন্ত্রীসভায় সিয়্যাটো অনুমোদিত হয়েছিলো।

সিয়্যাটো স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ১৯৫৪ সনের ২২ সেপ্টেম্বর প্রধান-মন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, প্রধান সেনাপতি আইউব খান, পররাষ্ট্র-মন্ত্রী জাফরুল্লাহ্ খান এবং অর্থমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর সমন্বয়ে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিনিধিদল যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান। প্রেসিডেন্ট আইসেন-হাওয়ারের উষ্ণ আতিথেয়তা উপভোগের পাশাপাশি তারা অস্ত্র ও অর্থ সাহায্যের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন।

সিয়্যাটো স্বাক্ষরিত হওয়ার পরপর পাকিস্তানের রাজনীতিতে আর একবার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের নামে প্রতিষ্ঠা-কাল থেকেই পাকিস্তানে একটি গণপ্রতিনিধিত্বহীন 'গণপরিষদ' ছিলো। 'শাসনতন্ত্রের মূলনীতি' হিসেবে লিয়াকত আলী খান (মার্চ, ১৯৪৯, নভেম্বর, ১৯৫০) এবং খাজা নাজিমুদ্দিনের (ডিসেম্বর, ১৯৫২) দুটি অগ্রহণযোগ্য রিপোর্টের পর ১৯৫৩ সনের ৭ অক্টোবর বগুড়ার মোহাম্মদ আলী হাজির করেছিলেন 'মোহাম্মদ আলী ফর্মুলা।' কিন্তু শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়নি। গভর্নর জেনারেল তখনো ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইনের বলে নিরংকুশ ক্ষমতা ভোগ করছিলেন এবং তার ভিত্তিতেই খাজা নাজিমুদ্দিনকে সরিয়ে বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রী বানানো হয়েছিলো। নিজে যে পথে এসেছেন, সে-অগণতান্ত্রিক পথটি বন্ধ করার জন্য বগুড়ার মোহাম্মদ আলী ১৯৫৪ সনের সেপ্টেম্বরে এক উদ্যোগ নিয়েছিলেন ঃ এর ফলে সকল ক্ষমতা চলে আসতো মন্ত্রী পরিষদের

হাতে, গভর্নর জেনারেলকে পার্লামেন্টের মুখাপেক্ষী হতে হতো। ২১ সেপ্টেম্বর গণপরিষদ সে শাসনতান্ত্রিক রিপোর্টটি গ্রহণ করেছিলো, ২৭ অক্টোবর অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী অধিবেশনে তার ভিত্তিতে শাসনতান্ত্রিক বিল নিয়ে আলোচনার কথা ছিলো। কিন্তু এর মধ্যেই গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ শক্ত হাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন ঃ প্রধানমন্ত্রীকে ফেরত আনেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এবং ১৯৫৪ সনের ২৪ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদ বাতিল ঘোষণা করেন। সেই সাথে সারা দেশে জরুরী অবস্থাও ঘোষিত হয়।

বিশেষজ্ঞ মহল এই ঘটনাটির পেছনেও আমেরিকার হস্তক্ষেপের ধারণা করেন। কেননা, গভর্নর জেনারেল যে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তরবারী উঁচিয়ে ধরার নামে পদক্ষেপটি নিয়েছিলেন, সেই বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকেই তিনি আবারও প্রধানমন্ত্রীত্ব দেন এবং সেদিনটিতেই। এর কারণ, আলী ছিলেন আমেরিকার বিশ্বস্ত অনুসারী, মাত্র সেদিন তিনি এনেছিলেন ১০৫ মিলিয়ন ডলারের বিপুল সাহায্য এবং সর্বোপরী 'সেনাবাহিনী তাকে চাচ্ছিলো মার্কিন সাহায্য আনয়নকারী হিসেবে।'[৫৬] এরপর বগুড়ার মোহাম্মদ আলী 'ক্যাবিনেট অফ ট্যালেন্টস' নামে যে মন্ত্রীসভা গঠন করেন, তাতে পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় নেন নিজের হাতে, প্রতিরক্ষামন্ত্রী করেন প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইউবকে আর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেন আর এক জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জাকে। অর্থাৎ গভর্নর জেনারেলের পদক্ষেপটির উদ্দেশ্য ছিলো গণপ্রতিনিধিত্বের চিহ্নটুকুও বিলীন করে দিয়ে একনায়কত্বের লক্ষ্যে অভিযাত্রা এবং বলা বাহুল্য যে এর পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন ছিলো সক্রিয়।

৮. বাগদাদ চুক্তিতে পাকিস্তান

সে পরিস্থিতিতে একমাত্র মওলানা ভাসানীই এ অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা করে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছিলেন। লণ্ডনে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন যে আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হলে দেশে 'সামরিক একনায়কতন্ত্র' প্রতিষ্ঠিত হবে।[৫৭] সিয়্যাটো সম্পাদিত হওয়ার পর গণপরিষদ বাতিলের সাথে সাথে মওলানা ভাসানীর আশংকানুযায়ী সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রকাশ্যে নেমে না এলেও পাকিস্তান সামরিক জোটের পথে আরো এক ধাপ এগিয়ে যায়। কিংবা বলা চলে ঃ নতুন আর একটি সামরিক জোটে যাওয়ার

পথকে সুগম করার জন্যই পদক্ষেপটি গৃহিত হয়েছিলো। মধ্যপ্রাচ্য প্রশ্নে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের কথা আগেই বলা হয়েছে, মিসর ও সৌদি আরবের বিরোধিতার ফলে 'সর্বাত্মক পরিকল্পনা' ব্যর্থ হওয়ার পর আমেরিকা তার 'আংশিক পরিকল্পনা' বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। সে-অনুযায়ী ১৯৫৫ সনের জানুয়ারীতে আয়োজন চূড়ান্ত করার পর পরিকল্পিত 'মধ্যপ্রাচ্য প্রতিরক্ষা সংস্থা' 'মেডো'র (Medo) পরিবর্তে 'বাগদাদ চুক্তি' নামে নতুন একটি 'সমষ্টিগত নিরাপত্তা' জোট গঠিত হয়। ১৯৫৫ সনের ফেব্রুয়ারীতে বাগদাদে স্বাক্ষরিত এই চুক্তিভুক্ত দেশগুলি ছিলো বৃটেন, তুরস্ক, ইরান, ইরাক এবং পাকিস্তান। মিসরের অসন্তোষের আশংকায় আমেরিকা এর আনুষ্ঠানিক সদস্যপদ গ্রহণ করেনি, যদিও শুরু থেকেই সে এর সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলো। জেনারেল আইউব খানের মতে বাগদাদ চুক্তির মধ্য দিয়ে 'পাকিস্তান এশিয়ায় আমেরিকার সবচেয়ে বিশ্বস্ত মিত্রে পরিণত হয়েছিলো।'[৫৮]

৯. সামরিক চুক্তি ও যুদ্ধজোট বাতিলের দাবীতে আওয়ামী লীগের প্রস্তাবাবলী

'নির্বাসিত' জীবনশেষে মওলানা ভাসানী ফিরে আসেন ১৯৫৫ সনের ২৫ এপ্রিল। মে মাসে প্রচারিত এক প্রচারপত্রে তিনি পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি, সিয়্যাটো এবং বাগদাদ চুক্তি বাতিলের দাবী জানান।[৫৯] ৯ ও ১০ অক্টোবর অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের উত্তর বংগ কর্মী সম্মেলনেও তিনি একই দাবী তুলে ধরেন। ১৯৫৫ সনের ২১, ২২ ও ২৩ অক্টোবর ঢাকায় অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহিত প্রস্তাবে বলা হয়ঃ 'এই কাউন্সিল অধিবেশনের বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে পাকিস্তান সরকার গত কয়েক বৎসরে পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি, বাগদাদ চুক্তি, সিয়্যোটো চুক্তি প্রভৃতি এমন সব চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন, যে চুক্তি দ্বারা দেশের সার্বভৌমত্ব এবং দেশের অর্থনৈতিক, ব্যবসাগত ও বাণিজ্যিক স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হইয়াছে।'[৬০] কাউন্সিল অধিবেশনে তিন ও চার সংখ্যক প্রস্তাবে সম্পাদিত প্রতিটি চুক্তিকে আইন পরিষদে অনুমোদনের জন্যে পেশ করার দাবী জানিয়ে বলা হয়ঃ অনুমোদন লাভে ব্যর্থ হলে চুক্তিগুলিকে বাতিল করতে হবে। প্রস্তাবে ভবিষ্যতে যে কোনো সামরিক বা জরুরী চুক্তি স্বাক্ষরের তিন মাসের মধ্যে সেগুলিকে আইন পরিষদের দ্বারা অনুমোদন করিয়ে নেয়ারও দাবী জানানো হয়।[৬১]

এরপর পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আওয়ামী লীগ তার বক্তব্য তুলে ধরে ১৯৫৬ সনের ১৯ ও ২০ মে ঢাকায় অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে। এতে গৃহিত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ সকল প্রকার সামরিক ও যুদ্ধ জোটের চুক্তি বাতিল ঘোষণার দাবী জানিয়ে বলে যে এগুলির, বিশেষ করে বাগদাদ চুক্তির ফলে পাকিস্তান মুসলিম বিশ্বের দেশগুলির সহানুভূতি হারিয়েছে। প্রস্তাবে বলা হয়ঃ 'কোন বৈদেশিক শক্তির লেজুড় হিসাবে না থাকিয়া আমাদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নীতির অনুসারী হইতে হইবে এবং আমরা বিশ্বাস করি, কেবল মাত্র এই নীতিই পাকিস্তানকে পৃথিবীর বুকে সমৃদ্ধশালী ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া তুলিতে পারে।'[৬২]

পাকিস্তান এবং পাকিস্তানের, বিশেষ করে পূর্ব বাংলার জনগণের কল্যাণ এবং অধিকার আদায় ও রক্ষার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ সঠিক ভাবেই তার পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত বক্তব্য তুলে ধরেছিলো। সামরিক চুক্তিগুলির ফলাফল পূর্ব বাংলার জন্য অত্যন্ত বিষময় প্রমাণিত হয়েছে। মুসলিম লীগ তার কোটারীগত স্বার্থে রাজনীতি ও ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করলেও জনপ্রতিনিধিত্বের যে 'ধারা' বজায় রেখেছিলো, এই চুক্তিগুলি সম্পাদনের সাথে সাথে পাকিস্তানে তার অবসান ঘটতে শুরু করে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিনাশ সূচিত হয় এবং পাকিস্তানের যাত্রা শুরু হয় সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষা ও প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে সামরিক শাসনের অনিবার্য পরিণতির অভিমুখে। আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ প্রকাশ্যেই চলতে শুরু করে। এর প্রথম ঘটনাটি ছিলো যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন বিজয়ের পরপর প্রদত্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত হোরেস হিলড্রেথের বিবৃতিঃ কূটনৈতিক রীতিনীতি পাশে ফেলে তিনি বলেছিলেন যে পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের পতনে পাকিস্তান সরকারের নীতির কোনো পরিবর্তন হবে না। সে সময়ে সারাদেশে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠেছিলো, কিন্তু পাকিস্তান সরকার দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি অবমাননাকর এই বিবৃতির প্রেক্ষিতে কোনো কথাও উচ্চারণ করেননি।[৬৩]

১০. যুদ্ধজোটের ফলাফলঃ মধ্যপ্রাচ্যে পাকিস্তান বিরোধী ঘৃণা

সামরিক জোট ও চুক্তিগুলির কারণে পাকিস্তানের প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলির প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আওয়ামী লীগের বক্তব্য ছিলো বাস্তব সম্মত। পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব সেখানে তখন অত্যন্ত তাজা এবং পরিষ্কার, মিসর সহ প্রতিটি দেশেই তখন পাশ্চাত্যের 'শেষ চিহ্নটি' পর্যন্ত মুছে ফেলার প্রক্রিয়া চলছিলো। সে অবস্থায় বিশেষ করে

বাগদাদ চুক্তি মধ্যপ্রাচ্যে 'মুসলিম রাষ্ট্র' পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও জনমত গড়ে তুলেছিলো। মিসরের নাসের এবং সৌদি আরবের বাদশাহ ইবনে সৌদের দৃষ্টিতে বাগদাদ চুক্তি ছিলো 'আরবদের বিভক্ত করার এবং মধ্য-প্রাচ্য ও সুয়েজের পূর্ব তীরে পাশ্চাত্য অবস্থান রক্ষার প্রচেষ্টা।' সে সময়ে (১৯৫৫-৫৬) মিসরে নিযুক্ত বৃটিশ রাষ্ট্রদূত হামফ্রে ট্রিভেলিয়ান লিখেছেন: 'বাগদাদ চুক্তিকে নাসের বৃটেনের ষড়যন্ত্র বিবেচনা করেছিলেন এবং এর ফলে তার মনে অত্যন্ত ক্রোধের সঞ্চার হয়েছিলো।'[৬৪]

মিসর ও সৌদি আরব সহ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলি সে সময় নির-পেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির পক্ষপাতী ছিলো। এই লক্ষ্যে তারা ইরাককে নিরস্ত করার প্রচেষ্টা নেয়: ১৯৫৪ সনের অগাস্টে নাসের তার বিপ্লবী কাউন্সি-লের সদস্য মেজর সালেহ সালামকে পাঠান ইরাকের প্রধানমন্ত্রী নূরী আস-সাইদের কাছে, কিন্তু নূরী নাসেরের সাথে 'বিশ্বাসঘাতকতা' করেছিলেন। এর ফলে মধ্যপ্রাচ্যেও পাল্টা ব্যবস্থা গৃহিত হয়: বাগদাদ চুক্তির পর ১৯৫৫ সনের অক্টোবরে সৌদি আরব ও সিরিয়ার সাথে মিসর 'নিরাপত্তা চুক্তি' স্বাক্ষর করে।

বাগদাদ চুক্তির ফলে 'মুসলিম রাষ্ট্র' হয়েও পাকিস্তান কাশ্মির সহ বিভিন্ন প্রশ্নে 'হিন্দু' ভারত বিরোধী বিষয়গুলিতেও মধ্যপ্রাচ্যের নিশ্চিত সমর্থন হারিয়েছিলো। সুসম্পর্কের স্বার্থে ১৯৫৫ সনের এপ্রিলে প্রেসিডেন্ট নাসের তার দূত মেজর সালেহ সালামকে পাকিস্তান পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু পাকিস্তানও ইরাকের মতো তাকে হতাশ করেছে। পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে ১৯৫৬ সনের ২৬ জুলাই মিসর সুয়েজখাল জাতীয়করণ করলে: সরকারী-ভাবে সুয়েজের ওপর মিসরের সার্বভৌম অধিকার 'স্বীকার' করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে লণ্ডনে আহূত সুয়েজখাল ব্যবহারকারীদের সম্মেলনে পাকিস্তান সেই 'ডালেস পরিকল্পনা' অনুমোদন করেছিলো যা মিসরের জন্য ছিলো 'স্বার্থবিরোধী এবং অগ্রহণযোগ্য'। উল্লেখ্য যে সম্মেলনে যোগ-দানের উদ্দেশ্যে লন্ডন যাওয়ার পথে কায়রোতে যাত্রাবিরতিকালে পাকি-স্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী মিসরের স্বার্থ সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছিলেন। পাকিস্তানের এই 'প্রতারণা' ভারতের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের দ্বার উন্মোচিত করে দেয়: সৌদি আরবের মতো 'মুসলিম' দেশও ১৯৫৬ সনের সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানের 'জন্মগত দুশমন' ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওয়াহের-লাল নেহরুকে 'রাসুল-উল-সালাম' বা শান্তির দূত নামে আখ্যায়িত করে, মক্কা বেতারে একইযোগে প্রচারিত হয় পাকিস্তান বিরোধী তীব্র বক্তব্য।[৬৫]

পাকিস্তানের জনগণ অবশ্য সে সময় মিসরের সমর্থনে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলো ঃ মওলানা ভাসানী সহ বিরোধী নেতাদের আহবানে ১৯৫৬ সনের ১৬ অগাস্ট পূর্ব বাংলায় পালিত হয় 'সুয়েজ দিবস'।[৬৬]

১১. ভারতের প্রতিক্রিয়া ঃ কাশ্মিরের ভারতে যোগদান

সামরিক জোট যোগদানের সমর্থনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়কদের প্রধান যুক্তি ছিলো তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবেশী দেশ ভারতের অব্যাহত হুমকি। পাকিস্তান হওয়ার পর কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালনী এবং প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল সহ ভারতের কোনো কোনো নেতা একথা প্রকাশ্যেই বলে আসছিলেন যে তারা 'অবিভক্ত ভারতের স্বপ্ন' পরিত্যাগ করেননি এবং আজ হোক বা কাল হোক দু'দেশ একত্রিত হবেই। দুই বৃটিশ সমর নায়ক জেনারেল গ্রেসী এবং জেনারেল রস ম্যাকে যথাক্রমে পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি ও চীফ অফ স্টাফ থাকা সত্বেও ১৯৪৭ সনেই ভারত জম্মু ও কাশ্মিরের বিরাট ভূখণ্ড 'দখল' করে নিয়েছিলো। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের হুমকির মুখে 'অস্তিত্ব রক্ষা' এবং 'টিকে থাকার' তাগিদেই পাকিস্তানকে বাধ্য হয়ে পাশ্চাত্যের সাথে সামরিক জোটে যোগদান করতে হয়।[৬৭] আইউব খানের মতে বাগদাদ চুক্তিতে পাকিস্তান যোগ দিয়েছিলো প্রধানতঃ মুসলিম বিশ্ব এবং পাকিস্তানকে 'রক্ষা'র উদ্দেশ্যে। কেননা, বিপুল সম্পদ এবং রণকৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ ভৌগলিক অবস্থানের কারণে মধ্যপ্রাচ্যে একসময় কমিউনিস্ট এবং পাশ্চাত্যের সংঘাত অনিবার্যভাবেই বেঁধে উঠবে। যুদ্ধ শুরু হলে তা পাকিস্তান পর্যন্তও সম্প্রসারিত হবে এবং সেজন্যেই এদুটির একটি জোটে অবস্থান নেয়া পাকিস্তানের নিজের নিরাপত্তার স্বার্থেই প্রয়োজন ছিলো, আর সেক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের চাইতে 'খৃস্টান' পাশ্চাত্যেরই ছিলো অগ্রাধিকার। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের 'অসত উদ্দেশ্য' সম্পর্কে মধ্যপ্রাচ্যকে 'অবহিত' রাখা ছিলো বাগদাদ চুক্তিতে যোগদানের আর এক কারণ ঃ 'এর ফলে পাকিস্তানের পক্ষে মুসলিম দেশগুলি এগিয়ে আসবে।'[৬৮]

ভারতের হুমকির মুখে 'দুর্বল' পাকিস্তানের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলি কিন্তু এগিয়ে আসেনি, আর তার কারণ ঃ সামরিক চুক্তির মধ্য দিয়ে 'শক্তিশালী' পাকিস্তানই বরং উল্টো হুমকির কারণ হয়ে পড়েছিলো। ওদিকে যে কাশ্মির প্রশ্নে বিরোধিতার ফলে পাকিস্তান সজ্জিত হচ্ছিলো, সে কাশ্মিরও পাওয়া তখন কঠিন হয়ে পড়ছিলো। প্রাথমিক মনোমালিন্যের

পর ভারতের মনোভাব ক্রমশঃ 'কম শত্রুতাপূর্ণ' হতে থাকে। পরিবর্তিত মনোভাবের পথ ধরে ১৯৫৩ সনের ২০ অগাস্ট দুই প্রধানমন্ত্রী জওয়াহেরলাল নেহরু এবং বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর মধ্যে স্বাক্ষরিত যুক্ত ঘোষণায় বলা হয়ঃ 'কাশ্মিরের জনগণের ইচ্ছানুসারেই কাশ্মির সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করতে হবে।' সে উদ্দেশ্যে কাশ্মিরে নিরপেক্ষভাবে গণভোট অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ঘোষণায় ১৯৫৪ সনের এপ্রিলের মধ্যে একজন গণভোট পরিচালক নিয়োগ করার কথা ছিলো-যিনি কাশ্মিরের 'সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ' নির্বাচন নিশ্চিত করবেন।[৬৯]

পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির আয়োজনের কথা ১৯৫৩ সনের নভেম্বরে প্রকাশিত হয়ে পড়লে পাক-ভারত সম্পর্কের এই শুভ সূচনা নস্যাত হয়ে যায়। ১৯৫৩ সনের ২১ ডিসেম্বর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে লিখিত এক দীর্ঘ চিঠিতে নেহরু বলেন ঃ 'আমরা এমন এক স্বাধীন ও জোট-নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে আসছি, যা বিশ্বশান্তি, বিশেষ করে এশিয়ার দেশগুলির স্বার্থে পরিচালিত। কিন্তু পাকিস্তান সামরিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে জোটে অংশ নেয়ায় পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়েছে এবং এর ফলে পাক-ভারত সম্পর্ক, বিশেষ করে কাশ্মির প্রশ্নে, ক্ষতিগ্রস্থ হবে।' ২৩ ডিসেম্বর ভারতের লোকসভায় প্রদত্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নেহরু অগাস্টে স্বাক্ষরিত যুক্ত ঘোষণার বাস্তবায়ন আর 'সম্ভব নয়' বলেন, কেননা 'পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্রের সরবরাহ চুক্তিকালে বিরাজমান পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধন করবে।'[৭০]

যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সামরিক চুক্তির মাধ্যমে পাকিস্তান 'অধিকৃত' কাশ্মিরকে ভারতের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারেনি, বরং ১৯৫৬ সনের ১৭ নভেম্বর কাশ্মিরের গণপরিষদ তার শাসনতন্ত্রে এই মর্মে এক বিধান সংযোজন করে যে ১৯৫৭ সনের ২৬ জানুয়ারী থেকে রাজ্যটি 'ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হবে।'[৭১] বিষয়টি পাকিস্তান জাতিসংঘে নিয়েছে, নিরাপত্তা পরিষদে তার পক্ষে প্রস্তাবও গৃহিত হয়েছে, কিন্তু কাশ্মির আর উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। যে ভারতের বিরুদ্ধে এতসব সামরিক চুক্তির আয়োজন, সে-ভারতই জয়লাভ করেছে, পন্থা তার যা-ই হোকনা কেন। পাকিস্তানের 'শক্তিশালী

বৃহৎ বন্ধুরা' এগিয়ে আসেনি, নিরাপত্তা পরিষদে ভোটদানের মধ্যেই তারা তাদের 'সহযোগিতা' সীমাবদ্ধ রেখেছে।

১২. সোভিয়েত প্রতিক্রিয়া ঃ ভারতের পক্ষাবলম্বন

সামরিক চুক্তিগুলিতে অংশ নেয়ার ফলে পাকিস্তান জোটনিরপেক্ষ দুনিয়ার সাথে সাথে সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও সমর্থন হারিয়েছিলো। স্ট্যালিনকে অসম্মানের মধ্য দিয়ে আমেরিকার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের যাত্রা শুরু হলেও সামরিক চুক্তিগুলি সম্পাদনের আগে পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন কখনো পাকিস্তানের বিরোধিতা করেনি, এমনকি কাশ্মির প্রশ্নেও নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করেছে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে তার প্রতিনিধি ভোটদানে বিরত থেকেছেন। কিন্তু কমিউনিজম বিরোধিতার লক্ষ্যে গঠিত সিয়্যাটো এবং বাগদাদ চুক্তিতে স্বাক্ষরের পর সোভিয়েত দৃষ্টিভংগী সম্পূর্ণ পাল্টে যায়, কেননা, এগুলি ছিলো সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে 'আক্রমণাত্মক যুদ্ধ জোট'। এর পর থেকে অন্য অনেক বিষয়ের সাথে কাশ্মির প্রশ্নেও সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের বক্তব্যকে সমর্থন করতে শুরু করে এবং 'কাশ্মিরে গণভোট অনুষ্ঠানের কোনো প্রয়োজন নেই, কেননা, রাজ্যটি ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ' হয়ে ওঠে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রকাশ্য ঘোষণা।[৭২] দক্ষিণ এশিয়ায় কমিউনিজম সম্প্রসারণরোধের 'আন্তর্জাতিক দায়িত্ব' পালন করতে গিয়ে পাকিস্তান সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো একটি শক্তিশালী প্রতিবেশীর সাহায্য-সহযোগিতালাভ থেকে নিজেকে কেবল বঞ্চিতই করেনি, অযথা তিক্ততারও সৃষ্টি করেছিলো।

১৩. আওয়ামী লীগের বক্তব্যের যৌক্তিকতা

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের দৃষ্টিভংগীর কারণ বুঝতে হলে ওপরে আলোচিত বিভিন্ন দিকগুলির কথা মনে রাখতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সাম্রাজাবাদী যুদ্ধজোটে অংশ নেয়ার ফলে পাকিস্তান জোটনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক এবং মুসলিম বিশ্বের দেশগুলিতে সমর্থন-সহযোগিতা হারিয়ে সন্দেহ-সংশয় এবং অনেক ক্ষেত্রে শত্রুতার সৃষ্টি করেছিলো। আর যে দেশটির বিরুদ্ধে ছিলো এই 'রণসজ্জা', সে ভারতের কাছ থেকেও কিছু লাভ বা আদায় করা সম্ভব হয়নি, পাকিস্তানকেই উলটো নাজেহাল হতে হয়েছে। এই সুযোগে ভারত বরং প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিলো জোটনিরপেক্ষ

আন্দোলনের নেতার আসনে ঃ মিসরের নাসের এবং যুগোস্লাভিয়ার মার্শাল টিটোর সাথে ভারতের নেহরু ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা-নেতা। এই আলোকে বলা যায় ঃ সামরিক জোটে পাকিস্তানের অংশ গ্রহণের হুমকিই ছিলো জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন প্রতিষ্ঠার পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ।

আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতের পাশাপাশি দেশের আভ্যন্তরীণ দৃষ্টিকোণ থেকেও আওয়ামী লীগ বিষয়টিকে গ্রহণ করতে পারেনি। এর কারণ ঃ বিভিন্ন গণবিরোধী পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে একথা ক্রমশঃ প্রমাণিত হচ্ছিলো যে সামরিক চুক্তিও জোটের ফলে ক্রমবর্দ্ধমান 'শক্তি' ক্ষমতাসীনদের স্বার্থে বিশেষ করে পূর্ব বাংলার জনগণের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হবে। মার্কিন সাংবাদিকের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ফজলুল হকের মতো জনপ্রিয় নেতার অবমাননা এবং সেই অজুহাতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের অংগীকারে নির্বাচিত ও অগ্রসরমান যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিলের ঘটনা সে আশংকাকেই সত্য প্রমাণিত করেছে। ওদিকে সামরিক জোটে যোগদানের বিনিময়ে যে পাকিস্তান 'শক্তিশালী' হচ্ছিলো, পূর্ব বাংলা তার অন্তর্ভূক্ত ছিলোনা। একথার সত্যতা স্বীকৃত হয়েছে প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইউবের একটি বক্তব্য থেকে ঃ ১৯৫৪ সনের ২৪ অক্টোবর বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রীসভায় দেশরক্ষা মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার পর লাহোরের এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন ঃ 'পূর্ব পাকিস্তান অরক্ষনীয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা নির্ভর করে পশ্চিম পাকিস্তানের উপর।' অর্থাৎ ভারত কখনো হামলা করলে কিংবা দখল করে নিলে পশ্চিম পাকিস্তান দিল্লী দখল করে নেবে এবং ফলে ভারত পূর্ব বাংলা ত্যাগ করতে বাধ্য হবে। পূর্ব বাংলাকে এক ভারত ছাড়া আর কেউ আক্রমণ করবে না। তাই পূর্ব-দক্ষিন দিকের সীমান্ত গুরুত্বপূর্ণ নয়। আর একারণেই পূর্ব বাংলায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন নেই বলে পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি মনে করতেন।[৭৩] এমনিতর ধ্যানধারণার ফলেই পূর্ব বাংলা সামরিক দিক থেকে অত্যন্ত অবহেলিত হচ্ছিলো ঃ ইতিপূর্বে উল্লিখিত হিসেবে দেখা যায় ঃ শতকরা বিশ ভাগেরও কম অর্থ এ প্রদেশে ব্যয়িত হয়েছিলো, সশস্ত্র বাহিনী সমূহে চাকুরীতে ২২৬০ জনের মধ্যে পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের সংখ্যা ছিলো মাত্র ৮০ জন (শতকরা মাত্র ৩'৫ ভাগ)। অথচ বৈদেশিক সাহায্যের বাইরেও কেবলমাত্র রাজস্ব আয়েরই শতকরা বাষট্টি ভাগ তখন প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়িত হতো।[৭৪]

মওলানা ভাসানী আহূত কাগমারী সম্মেলনের পটভূমি বোঝার প্রয়োজনে উপস্থাপিত এই আলোচনায় যে বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে, তা হলো ঃ প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই আওয়ামী লীগ ছিলো পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন আদায় এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংগীকারাবদ্ধ। এ দুটি কর্মসূচীই ছিলো পরস্পরের পরিপূরক এবং তাই অবিচ্ছেদ্যও, কেননা, একথা প্রমাণিত হয়েছে যে জোটমুখী পররাষ্ট্রনীতির ফলে পাকিস্তানের রাজনীতি, বিশেষ করে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি অবদমিত হচ্ছিলো। আওয়ামী লীগ তাই সঠিক ভাবেই সিদ্ধান্তটিতে এসেছিলো যে পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন ব্যতীত স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আদায় করা সম্ভব নয়। এই আলোকে আওয়ামী লীগ স্বায়ত্তশাসন ও পররাষ্ট্রনীতির দাবী দুটিকে একসূত্রে গ্রথিত করে একযোগে উত্থাপন করেছে ঃ প্রতিষ্ঠাকালীন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নীতির ধারাকে অব্যাহত রেখে ১৯৫৩ সন থেকে ১৯৫৬ সনের মে পর্যন্ত প্রতিটি কাউন্সিল অধিবেশনের প্রস্তাবসহ বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা, বিবৃতি, মিছিল ও সমাবেশের মধ্য দিয়ে এর সমর্থনে আওয়ামী লীগ সকল পর্যায়ে তার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

২
ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী সংঘাত

অতীত প্রেক্ষাপট আলোচনার পর এবার কাগমারী সম্মেলনের আশু কারণ সমূহের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সহ পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অধিকার আদায় এবং স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির দাবীতে আওয়ামী লীগ পরিচালিত আন্দোলনের সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে ১৯৫৬ সনের ১১ সেপ্টেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত হন। ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্টের সমর্থনে ১৯৫৫ সনের ১১ অগাস্ট কেন্দ্রে গঠিত চৌধুরী মোহাম্মদ আলী মন্ত্রীসভার পতনের আশু কারণটিও ঘটিয়েছিলো পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগের আন্দোলন। ৯২-ক ধারা প্রত্যাহৃত হওয়ার পর ১৯৫৫ সনের ৬ জুন প্রদেশে আবু হোসেন সরকার যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করেছিলেন। সারা পূর্ব বাংলায় সে সময় বিরাজমান প্রকট খাদ্য সংকটের প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ প্রচণ্ড গণ-আন্দোলন গড়ে তোলে। স্বায়ত্তশাসনের বিধানবিহীন এবং শক্তিশালী কেন্দ্রের ভিত্তিতে প্রণীত ১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্রের সপক্ষে ফজলুল হকের কৃষক-শ্রমিক পার্টির ভোটদান আওয়ামী লীগের আন্দোলনকে বেগবান করে। ২ মে থেকে মওলানা ভাসানী শুরু করেন ষোল দিনস্থায়ী অনশন ঃ এর ফলেই তার দাবী অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশের খাদ্য ক্রয়ের জন্য পঞ্চাশ কোটি টাকা প্রদানে এবং বিরোধী দলের প্রতিনিধি সমন্বয়ে 'সুপ্রীম ফুড কাউন্সিল' গঠনে বাধ্য হন।[৭৫] অনশন প্রত্যাহারের পর ১৯ ও ২০ মে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে আওয়ামী লীগ স্বায়ত্তশাসন সহ একুশ দফার বাস্তবায়ন, জোট-

নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি এবং যুক্ত নির্বাচন প্রথার দাবী পুনর্বার তুলে ধরে।

১. পাঁচ দফার আন্দোলন ঃ ভুখা মিছিলে ফজলুল হক সরকারের গুলী

ওদিকে আবু হোসেন সরকারের আমলে ১৯৫৫ সনের ৫ অগাস্ট একবার কেবল পূর্ব বাংলার আইন পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। ১৯৫৬ সনের ২০ মে বাজেট অনুমোদনের উদ্দেশ্যে আহূত অধিবেশন আওয়ামী লীগের বিরোধিতায় অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে যায়। সে সময় খাদ্য সংকট সমাধান, যুক্ত নির্বাচন প্রবর্তন, নিবর্তনমূলক আইন বাতিল, বণ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এবং ব্যাপকহারে হিন্দুদের দেশ ত্যাগ প্রতিরোধ সহ পাঁচ দফার ভিত্তিতে আন্দোলনের জন্য আওয়ামী লীগ অন্যান্য দলের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে (গণতন্ত্রী দল, ন্যাশনাল কংগ্রেস, ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ পার্টি এবং শিডিউল কাস্ট ফেডারেশন)।[৭৬] পূর্ব বাংলার মানুষের এই সব দাবীদাওয়ার ভিত্তিতে আওয়ামী লীগের গড়ে তোলা আন্দোলনের চাপে কেন্দ্রীয় সরকার চার সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠনে বাধ্য হন, প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জাকেও প্রদেশ সফরে আসতে হয়। মীর্জা খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব দেন সেনাবাহিনীকে। আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রীসভার ব্যর্থতাই সেনাবাহিনীকে বেসামরিক প্রশাসনে ডেকে আনায় আওয়ামী লীগ তার আন্দোলনকে তীব্রতর করে তোলে। আন্দোলনের চাপে এম. এল. এ.রা সরকারের পক্ষত্যাগ করতে থাকেন, ১৫ জুলাই অনুষ্ঠিতব্য পরিষদ অধিবেশন পিছিয়ে দেয়া হয় ১৩ অগাস্ট। আওয়ামী লীগ তখন সরকারের পদত্যাগ দাবী করে, খাদ্যের দাবীতে প্রদেশব্যাপী মিছিল আর সমাবেশের প্রচন্ডতা বাড়তে থাকে। ১৯৫৬ সনের ৪ অগাস্ট আওয়ামী লীগের আহবানে ঢাকায় আয়োজিত হয় বিক্ষোভ মিছিল। সরকার ঘোষিত ১৪৪ ধারা অমান্য করে হাজার হাজার নারী শিশু পুরুষের মিছিল চলতে থাকে, চকবাজার এলাকায় জিঞ্জিরা থেকে আগত মিছিলে পুলিশের গুলিতে নিহত হন তিনজন। পরদিন ৫ অগাস্ট ১৪৪ ধারা ভংগ করে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে দু'মাইল দীর্ঘ কালো ব্যাজ পরিহিত প্রতিবাদ মিছিল রাজধানী প্রদক্ষিণ করে। মন্ত্রীসভার পদত্যাগের দাবীতে ১৩ অগাস্ট আনীত প্রস্তাবে উপস্থিত ২৯৭ জনের মধ্যে ২০০ জন এম. এল. এ. স্বাক্ষর করেন, প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা ও প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী

মোহাম্মদ আলী ৩১ অগাস্টের মধ্যে প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন ডেকে আস্থা প্রমাণের জন্য আবু হোসেন সরকারকে নির্দেশ দেন। প্রতিকূল সে-পরিস্থিতিতে আবু হোসেন সরকার ৩০ অগাস্ট পদত্যাগ করেন। আওয়ামী লীগের আন্দোলন আরো তীব্র হতে থাকে, ৪ সেপ্টেম্বর আয়োজিত ভূখা মিছিলের ওপর গভর্নর ফজলুল হক সরকারের পুলিশ গুলী বর্ষণ করলে চারজন প্রাণ হারান। বিচলিত ফজলুল হক আওয়ামী লীগের সংসদীয় নেতা আতাউর রহমান খানকে মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আহবান করেন, মন্ত্রীসভা গঠিত হয় ৬ সেপ্টেম্বর।

২. প্রধানমন্ত্রী পদে সোহরাওয়ার্দী ঃ সংঘাতের সূচনা

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আন্দোলনের ফলে পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের ঘটনা কেন্দ্রেও প্রভাব ফেলে ঃ একুশ দফা বাস্তবায়ন না করায় গণতন্ত্রী দল ১৯৫৬ সনের ২১ মে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। তার আগেই ন্যাশনাল কংগ্রেস, ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ পার্টি এবং শিডিউল কাস্ট ফেডারেশন যুক্তফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে এসেছিলো। পূর্ব বাংলা মন্ত্রীসভার দু'জন কংগ্রেস দলীয় মন্ত্রী পদত্যাগ করেন ১২ মার্চ। ওদিকে মুসলিম লীগের আভ্যন্তরীণ মতবিরোধের প্রেক্ষিতে ডঃ খান সাহেবের নেতৃত্বে ১৯৫৬ সনের এপ্রিলে ইস্কান্দার মীর্জার আশীর্বাদ নিয়ে গঠিত হয়েছিলো রিপাবলিকান পার্টি। ফলে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে। পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগের সাফল্য কেন্দ্রে মুসলিম লীগ-যুক্তফ্রন্ট সরকারের সর্বনাশ ঘটায় ঃ চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ৭ সেপ্টেম্বর মুসলীম লীগ থেকে পদত্যাগ করেন, পরদিন তার মন্ত্রীসভারও পতন ঘটে। প্রেসিডেন্ট মীর্জার আহবানে শহীদ সোহরাওয়ার্দী আওয়ামী লীগ-রিপাবলিকান পার্টির কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করেন ১১ সেপ্টেম্বর। অর্থাৎ, একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে অতীত এবং সাম্প্রতিক আন্দোলনে আওয়ামী লীগের সাফল্য প্রদেশ ও কেন্দ্রের উভয় স্থানেই দলের ক্ষমতা লাভের পথ নির্মাণ করেছিলো।

রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভা তার যাত্রা শুরু করেছিলো ঃ একুশ দফার চতুর্দশতম দফা অনুযায়ী নিরাপত্তা আইন বাতিল করে বিনাবিচারে আটক রাজবন্দীদের মুক্তিদান উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রীরা ৮ সেপ্টেম্বর

ঢাকা কারাগারে এক সম্বর্ধনার আয়োজন করেন (অবশ্য কমিউনিস্ট সদস্য সরদার ফজলুল করিমকে মুক্তি দেয়া হয়নি)। কিন্তু এই শুভযাত্রা অচিরেই বাধাপ্রাপ্ত হতে শুরু করে ঃ কেন্দ্রে সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে সূচীত হয় সংগঠনের সাথে সংঘাতের। আওয়ামী লীগের সংগঠন এবং ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দের মধ্যে সংঘাতের প্রথম ঘটনাটি ঘটে ১৯৫৬ সনের ১৪ সেপ্টেম্বর পল্টন ময়দানে আয়োজিত জনসভায় ঃ দলের ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সহ একুশ দফার বাস্তবায়ন এবং স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি প্রতিষ্ঠার দাবী সম্বলিত কতিপয় প্রস্তাব সভায় পঠিত ও গৃহিত হয়। সভাপতির ভাষণে মওলানা ভাসানী পনেরো দিনের মধ্যে দুর্ভিক্ষ পীড়িত পূর্ববাংলার জন্য ১৭ হাজার মণ চাল আমদানীর দাবী জানিয়ে সর্বসময়ের মতো আঞ্চলিক বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরেন এবং কেন্দ্র অনুসৃত নীতির কঠোর সমালোচনা করেন। দলীয় কর্মসূচী বাস্তবায়নে ব্যর্থ কিংবা বাধাপ্রাপ্ত হলে ক্ষমতা থেকে পদত্যাগের মানসিক প্রস্তুতি রাখার জন্যও তিনি আওয়ামী লীগ দলীয় মন্ত্রীদের প্রতি আহবান জানান।

৩. স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে সোহরাওয়ার্দীর মিথ্যে ভাষণ

সভায় গৃহিত প্রস্তাব এবং মওলানা ভাসানীর 'বিরোধী দলীয় নেতার মতো' ভাষণ সদ্যক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। পূর্ব বাংলার দাবীর প্রশ্নে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন পূর্বসূরীদের অনুকরণে পাকিস্তানের 'সংহতি বিরোধী আঞ্চলিকতাবাদী' মনোভাবের সমালোচনা করে তিনি বলেন যে ১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্রে 'সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন' এর বিধান সংযোজিত হয়েছে, বাকীটুকুও সম্পূর্ণ হয়ে গেছে তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সাথে সাথে। পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে এ ভাষণে উল্লেখ না করে মওলানা ভাসানীর পদত্যাগ সংক্রান্ত বক্তব্যের জবাবে তিনি ঘোষণা করেন ঃ 'জনগণের সাথে যতদিন আমার সুসম্পর্ক বজায় থাকবে ততদিন পর্যন্ত আমি ক্ষমতায় থাকবো। এই সম্পর্ক নষ্ট হওয়া মাত্র আমি পদত্যাগ করবো।'[৭৭]

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার তিনদিনের মধ্যে আয়োজিত জনসভায় শহীদ সোহরাওয়ার্দীর এই ভাষণ ছিলো আওয়ামী লীগের ঘোষিত কর্মসূচীর প্রকাশ্য বিরোধিতা। অথচ মাত্র সাড়ে ছ'মাস আগে ১৯৫৬ সনের ২৯ ফেব্রুয়ারী স্বায়ত্তশাসনের বিধানবিহীন শাসনতন্ত্র রচনার প্রতিবাদে তিনি

স্বয়ং গণপরিষদের অধিবেশন থেকে বেরিয়ে আসা আওয়ামী লীগ সদস্যদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সেই একই নেতার মুখে প্রত্যাখ্যাত শাসনতন্ত্রের প্রশংসা, বিশেষ করে স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত বক্তব্য আওয়ামী লীগ কর্মীদের এবং জনগণকে নিরাশ করেছিলো। সংগঠনের সভাপতি মওলানা ভাসানীর বক্তব্যের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি যে ভাষা ও সুরের আশ্রয় নিয়েছিলেন তা ছিলো মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সূচিত পাকিস্তানের সংহতি রক্ষকদের ধারার হুবহু অনুকরণ ঃ প্রসংগত সতর্কবাণী উচ্চারণেও তার ভুল হয়নি।

৪. পররাষ্ট্রনীতির প্রসঙ্গ ঃ সুয়েজ সংকট ঃ মিসরের প্রত্যাখ্যান

এ ছিলো কেবল মতানৈক্যের সূচনা ঃ সংঘাত অচিরেই তীব্রতর হয়েছিলো পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে এবং তারও কারণ ঘটিয়েছিলেন সোহরাওয়ার্দী স্বয়ং। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরদিন, ১২ সেপ্টেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বেতার ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন যে তার সরকার ইতিপূর্বে স্বাক্ষরিত সকল আন্তর্জাতিক চুক্তির শর্ত ও অংগীকার সমূহ মেনে চলবেন।[৭৮] মওলানা ভাসানী এবং আওয়ামী লীগ ও গণতন্ত্রী দলসহ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দল সমূহের সমালোচনা ও বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে তিনি সামরিক চুক্তিগুলির প্রধান রক্ষক ও সমর্থকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। সকল প্রকার সামরিক চুক্তিকে আইন পরিষদে অনুমোদন করিয়ে নেয়ার যে প্রস্তাব আওয়ামী লীগ ১৯৫৫ সনের ২১-২৩ অক্টোবরের কাউন্সিল অধিবেশনে গ্রহণ করেছিলো, তার সূত্র ধরে মওলানা ভাসানী অবিলম্বে চুক্তিগুলিকে জাতীয় পরিষদে পেশ করার দাবী জানান। এর জবাবে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফিরোজ খান নুন ২৪ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন যে 'গোপনীয় কতিপয় ধারা সংশ্লিষ্ট থাকায়' চুক্তিগুলি জাতীয় পরিষদে 'পেশ করা সম্ভব নয়'। মওলানা ভাসানী তার পাল্টা বিবৃতিতে বলেন ঃ 'গোপনীয় ধারা সমূহের কারণেই চুক্তিগুলি পরিষদে প্রকাশ্যে আলোচিত এবং পরীক্ষিত হওয়া বেশী প্রয়োজন।' পরদিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘোষণা করে যে জাতীয় পরিষদ চাইলে চুক্তিগুলি পরিষদে পেশ করা হবে।[৭৯]

এই বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে ১৯৫৬ সনের অক্টোবরের শেষভাগে বৃটেন, ফ্রান্স এবং ইসরাইল একযোগে সুয়েজ খাল প্রশ্নে মিসরের

ওপর আক্রমণ চালালে। সারা পাকিস্তানে প্রতিবাদের ঝড় বইতে শুরু করে, পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ বিরোধী জংগী বিক্ষোভ প্রদর্শিত হতে থাকে ঃ ৩ নভেম্বর বিক্ষুব্ধ জনতা ঢাকাস্থ বৃটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস ভবনে অগ্নি-সংযোগ করে, বৃটিশ ও ফরাসী কনসুলেট কার্যালয়ে পরিচালিত হয় ইট-পাটকেলের আক্রমণ। মওলানা ভাসানীর আহবানে সারাদেশে ৯ নভেম্বর 'সুয়েজ দিবস' পালিত হয়, পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ সরকার দিবসটিকে ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করেন। মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানও এক বিবৃতিতে মিসরের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেন।

মিসরের প্রতি বৃটেন, ফ্রান্স ও ইসরাইলের এই ত্রিদেশীয় আক্রমণ সেদিনের পাকিস্তানে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এমন এক গণ-আন্দোলনের সূচনা করেছিলো যে মুসলিম লীগের মতো গণ-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠনকেও জনতার কাতারে যোগ দিতে হয়েছে ঃ মিসরের সমর্থন কেবল নয়, মুসলিম লীগ কমনওয়েলথ থেকে পাকিস্তানের সদস্যপদ প্রত্যাহারের এবং বাগদাদ চুক্তি থেকে বৃটেনকে বহিষ্কারের দাবী পর্যন্ত জানিয়েছিলো। মুসলিম লীগ নেতা মমতাজ দওলতানা এক বিবৃতিতে সামরিক চুক্তি ও জোটে যোগদানের দায়িত্ব অস্বীকার করেন এই যুক্তিতে যে খাজা নাজিমুদ্দিনের অপসারণের পর, তথা ১৯৫৩ সন থেকে সরকারের কোনো কার্যক্রমের জন্য তার দল দায়ী নয়। যৌথ মন্ত্রীসভার প্রধান দল রিপাবলিকান পার্টির সম্পাদক মীর আবদুল কাইউমও কমনওয়েলথ ও বাগদাদ চুক্তি থেকে পাকিস্তানের সদস্যপদ প্রত্যাহারের এবং মিসরকে সমর্থদানের দাবী জানিয়েছিলেন।[৮০]

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার সেই দিনগুলিতেও প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী তার পাশ্চাত্যমুখী ভূমিকা থেকে সরে আসেননি। ইসরাইলকে 'আক্রমণকারী' আখ্যা দিয়ে মিসরের ওপর পরিচালিত ত্রিদেশীয় হামলাকে 'মুসলিম বিশ্বের প্রতি হুমকি' হিসেবে বর্ণনা করলেও তিনি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কোনো ভূমিকা গ্রহণ থেকে বিরত থেকেছেন। শুধু তা-ই নয়, সুয়েজ সংকটের প্রশ্নে ১৯৫৬ সনের ১২ নভেম্বর দিল্লীতে আয়োজিত কলোম্বো শক্তি সমূহের সম্মেলনে যোগদানের অংগীকার করা সত্বেও তিনি তেহরান গিয়েছিলেন বৃটেনের নেতৃত্বে

বাগদাদ চুক্তিভুক্ত দেশ সমূহের সম্মেলনে অংশ নেয়ার জন্য। বিশ্বব্যাপী প্রবল জনমত এবং সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভের চরম পত্রের ফলে মিসরের ওপর আক্রমণ বন্ধ হলেও সোহরাওয়ার্দী ঘোষণা করেছিলেন ভিন্নমত ঃ তেহরান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি বলেছিলেন যে সোভিয়েত চরমপত্র নয়, ৮ নভেম্বর যুক্তবিবৃতির মাধ্যমে বাগদাদ চুক্তিভুক্ত দেশগুলির চাপের ফলেই মিসর 'রক্ষা' পেয়েছে। সোহরাওয়ার্দীর মতে এটা ছিলো বাগদাদ চুক্তির প্রমাণিত 'শুভ দিক' এবং তাই বিরোধিতার পরিবর্তে জোটটিকে সকলের সমর্থন করা উচিত। মওলানা ভাসানী এই বিবৃতির তীব্র নিন্দা করে ১৫ নভেম্বর প্রেরিত এক তারবার্তায় প্রধানমন্ত্রীকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেন যে সোহরাওয়ার্দীর এই বক্তব্যের সাথে তার নিজের বা আওয়ামী লীগের কোনো সম্পর্ক নেই এবং আওয়ামী লীগ তার ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচি অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোট বিরোধী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক অলি আহাদ এবং প্রচার সম্পাদক আবদুল হাইও তাদের ১৭ নভেম্বরের বিবৃতিতে মওলানা ভাসানীর প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেন।[৮১]

মিসর যে বাগদাদ চুক্তিকে তার 'স্বার্থবিরোধী ষড়যন্ত্র' মনে করতো, সে-জোটের সপক্ষে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর প্রকাশ্য ভূমিকা প্রেসিডেণ্ট নাসেরকে এত বেশী ক্ষুন্ন করেছিলো যে সুয়েজ খালের তীরবর্তী গাজা উপত্যকায় প্রেরিত জাতিসংঘের বাহিনীতে তিনি পাকিস্তানের সৈন্য অন্তর্ভূক্তির বিরোধিতা করেছেন। শুধু তা-ই নয়, সম্পর্ক স্বাভাবিক করার উদ্দেশ্য নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে সোহরাওয়ার্দী মিসর সফরের আগ্রহ প্রকাশ করলে নাসের সরাসরি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।[৮২] এর ফলে মুসলিম বিশ্বের দৃষ্টিতে পাকিস্তান শত্রু শিবিরভুক্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে পড়ে।

৫. পশ্চিম পাকিস্তানে বিরোধিতার মুখে সোহরাওয়ার্দী

পূর্ব বাংলার মতো পশ্চিম পাকিস্তানেও আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সোহরাওয়ার্দী পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। মওলানা ভাসানীর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে প্রদত্ত বিবৃতিতে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হক ওসমানী প্রধানমন্ত্রী

কর্তৃক বাগদাদ চুক্তির সমর্থনের তীব্র সমালোচনা করেন। এই বিবৃতি সোহরাওয়ার্দীকে ক্রোধান্বিত করে, তিনি ওসমানীকে পদত্যাগের নির্দেশ দেন। পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে শক্তিশালী নেতা ওসমানী প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশকে উপেক্ষা করে ১৯৫৬ সনের ১৩ নভেম্বর প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের এক সভা আহবান করেন। সভায় বাগদাদ চুক্তি সহ সকল সামরিক চুক্তি, জোট ও কমনওয়েলথ থেকে পাকিস্তানের সদস্যপদ প্রত্যাহারের এবং স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি প্রতিষ্ঠার দাবী জানানো হয়। ক্রোধান্ধ সোহরাওয়ার্দী সাংগঠনিক নিয়ম-শৃংখলা ভংগ করে মাহমুদুল হক ওসমানীকে সম্পাদকের পদ থেকে বরখাস্ত করেন এবং করাচী আওয়ামী লীগকে অবিলম্বে নিজের অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতির সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে বলেন যে অন্যথায় করাচী কমিটিকে স্থগিত ঘোষণা করা হবে। তার সে নির্দেশও উপেক্ষিত হয়। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে সোহরাওয়ার্দী পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগে নিজের সমর্থকদের দিয়ে ২৯ নভেম্বর আয়োজিত এক সভায় সরকারের পররাষ্ট্রনীতির সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণ করান। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে সোহরাওয়ার্দী-অনুসারীদের আয়োজিত সভাকে সংগঠনের নিয়ম বহির্ভূত হিসেবে বর্ণনা করে অবিলম্বে পূর্ণাংগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা অনুষ্ঠানের দাবী জানান। ২ ডিসেম্বর প্রদত্ত এই বিবৃতির স্বাক্ষরদাতারা ছিলেন মাহমুদুল হক ওসমানী, পশ্চিম পাকিস্তান শাখার সম্পাদক আজিজুল্লাহ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ শাখার সহ-সভাপতি আরবাব সিকান্দার খান, সম্পাদক মাস্টার খান গুল, সিন্ধু প্রাদেশিক সভাপতি রসুল বক্স তালপুর, সহ-সভাপতি গোলাম মোহাম্মদ লেঘারী এবং সম্পাদক কাজী ফয়েজ মোহাম্মদ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।[৮৩] এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ প্রকাশ্যে বিবদমান দুটি উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

৬. পূর্ব বাংলায় সোহরাওয়ার্দীর অভিযান ঃ মওলানা ভাসানীর চ্যালেঞ্জ

পূর্ব বাংলায়ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের প্রচণ্ডতা সোহরাওয়ার্দীকে দিশেহারা করে তুলতে থাকে। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সামরিক চুক্তি ও জোট বিরোধী আন্দোলনকে তীব্রতর করছিলো,

গণতন্ত্রী দল ও যুবলীগও এগিয়ে যাচ্ছিলো সাথে সাথে। ফলে পূর্ব বাংলায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সোহরাওয়ার্দীর অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। দুটি ঘটনাকে পুঁজি হিসেবে সাথে নিয়ে তিনি ১৯৫৬ সনের ৩ ডিসেম্বর পূর্ব বাংলা সফরে আসেন ঃ এক, মিসর কর্তৃক জাতিসংঘ বাহিনীতে পাকিস্তানের সৈন্য গ্রহণে অস্বীকৃতি ও সোহরাওয়ার্দীর কায়রো সফরের আগ্রহের প্রত্যাখ্যান, এবং দুই, ভারত 'অধিকৃত' কাশ্মির গণপরিষদে ভারতভুক্তির বিধান সম্বলিত ১৭ নভেম্বর গৃহিত প্রস্তাব। 'বাগদাদ চুক্তিভুক্ত দেশগুলির চাপের ফলেই মিসর ত্রিদেশীয় হামলার কবল থেকে রেহাই পেয়েছে'-এই দাবীর সূত্র ধরে তিনি ঘোষণা করেন যে মুসলিম বিশ্বের সাথে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তান 'অকপটভাবে' উদগ্রীব, কিন্তু নাসের সেখানে বারবার বাধ সাধছেন। দ্বিতীয় প্রশ্নে তার বক্তব্য ছিলো ঃ কাশ্মিরকে ভারতের কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য দুর্বল পাকিস্তানকে সামরিক জোটে থাকতে হবে। কাশ্মির প্রশ্নকে সামনে তুলে ধরে পূর্ব বাংলায় সোহরাওয়ার্দী ভারত-বিরোধী মনোভাবকে উস্কিয়ে দিয়ে তার পররাষ্ট্রনীতির সপক্ষে জনমত আকর্ষনের প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য ও মনোভাবের সমালোচনায় সোচচার হয়েছিলেন মওলানা ভাসানী। তার বক্তব্য ছিলো যুক্তিসংগত ঃ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমূহের নেতৃত্বে সামরিক চুক্তি ও জোটে, বিশেষ করে বাগদাদ চুক্তিতে অংশ নেয়ার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানই মিসর সহ মুসলিম বিশ্বের সাথে শত্রুতাপূর্ণ সম্পর্কের সূচনা করেছে, নাসেরের অস্বীকৃতি কোনো আকস্মিক ও বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। কাশ্মিরকেও পাকিস্তান হারিয়েছে একই কারণে ঃ সামরিক জোটে অংশ গ্রহণ করে পাকিস্তানই ভারতকে গণভোটের অংগীকার থেকে সরে যাওয়ার অজুহাত তৈরী করে দিয়েছে। মওলানা ভাসানী আরো বলেন যে বৃটেন ও আমেরিকার মতো 'শক্তিশালী বন্ধুদের' সাহায্যে কাশ্মির উদ্ধারের প্রচেষ্টায় তার পূর্বসূরীরা যেমন ব্যর্থ হয়েছেন, সোহরাওয়ার্দীকেও তেমনটিই হতে হবে যত 'দক্ষতার' সাথেই তিনি অগ্রসর হোননা কেন।[৮৪]

মওলানা ভাসানীর বিরোধিতা সোহরাওয়ার্দীকে বরং তার 'পরিকল্পনা' বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করেছিলো। পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের ভাঙনের প্রক্রিয়া শুরু করার পর তিনি এবার

দৃষ্টি দিয়েছিলেন পূর্ব বাংলার দিকে। ১৯৫৬ সনের ৩ ডিসেম্বর ঢাকা এসে তিনি মওলানা ভাসানীর সাথে পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে 'ফয়সালা' করতে চাইলেন। বরিশালে অবস্থানরত মওলানা ভাসানী প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করলেন এ জন্যে যে পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে আওয়ামী লীগের নীতি ও কর্মসূচী ছিলো অত্যন্ত পরিষ্কার এবং বহু ঘোষিত। সাক্ষাৎলাভে ব্যর্থ হওয়ার পর সোহরাওয়ার্দী গ্রহণ করেছিলেন পাকিস্তানের কর্ণধারদের ঐতিহ্যবাহী পন্থা: লিয়াকত আলী খান কর্তৃক 'হিন্দুস্থানের লেলিয়ে দেয়া পাগলা কুকুর' হিসেবে ঘোষিত সোহরাওয়ার্দী একই সুরে মওলানা ভাসানীকে 'হিন্দুস্থানের অর্থপ্রাপ্ত অনুচর' চিহ্নিত করে বলেছিলেন যে যারা পাকিস্তানকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরিত সামরিক চুক্তি ও জোটের বিরোধিতা করে, তারা ভারতের নিয়োজিত অনুচর। তার ভাষায় এই অনুচররা ছিলেন পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ ও গণতন্ত্রী দলের প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দ। এ অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করার মতো 'পর্যাপ্ত দলিল ও তথ্যগত প্রমাণ' তার হাতে আছে এবং তাই মওলানা ভাসানীকে সতর্ক করে দিয়ে সোহরাওয়ার্দী বলেন: প্রমাণগুলি প্রকাশ করলে দেশবাসীই তার 'বিচারের' ব্যবস্থা করবে এবং সে ক্ষেত্রে 'মৃত্যুদণ্ড' ব্যতীত অন্য কোন 'শাস্তিই' তার জুটবে না।[৮৫]

মওলানা ভাসানী এবং গণতন্ত্রী দলের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রব সেরনিয়াবত অভিযোগের 'প্রমাণ' পেশ করার দাবী জানিয়েছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তার 'হাতের প্রমাণ' উপস্থাপিত করতে পারেননি। এর কারণ, তার অভিযোগটি ছিলো ভিত্তিহীন, পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে সংক্রমিত ভারত-বিরোধী মনোভাবের সুযোগ গ্রহণের শস্তা রাজনৈতিক খেলায় তিনি পারদর্শীতা দেখাতে চেয়েছিলেন। এ ছিলো বহুবার ব্যর্থ প্রমানিত পাকিস্তানী শাসকদের গৃহিত পন্থার অন্ধ অনুকরণ। প্রসংগত বলা দরকার যে সোহরাওয়ার্দী একেবারে 'প্রমাণ বিহীন' ছিলেন না, তার হাতে ছিলো প্রেসিডেন্ট 'ইস্কান্দার মীর্জা প্রদত্ত' এক বিশাল ফাইল, যেটা দিতে গিয়ে মীর্জা মওলানা ভাসানীকে গ্রেফতার করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলেন। ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভার শিল্প ও বানিজ্য মন্ত্রী, আওয়ামী লীগ নেতা আবুল মনসুর আহমদ তার

'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' গ্রন্থে (পৃঃ-৪৮৯-৯২)। প্রধানমন্ত্রী তাকেই ফাইলটি পড়তে দিয়েছিলেন। বিশাল সে ফাইলের 'তিন-চারটি পত্রে তিন চার বারের বেশী' মওলানা ভাসানীর নাম ছিলোনা, চিঠিগুলি পাকিস্তানের ভারতীয় দূতাবাস থেকে দিল্লীতে পররাষ্ট্র দফতরকে লিখিত হয়েছিলো। আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন ঃ 'পড়িয়া দেখিলাম। খুব মনোযোগ দিয়া। কয়েকদিন লাগিল।……… এই বিশাল ফাইলের তিন চারিটি পত্রে তিন চারবারের বেশী মওলানা সাহেবের নাম নাই। তবু ঐ বিরাট ফাইলকেই মওলানার বিরুদ্ধে সিক্রেট ফাইল কেন বলা হইল, আমি তা বুঝিতে পারিলাম না। এই না বুঝার দরুণ আরও বেশী করিয়া পড়িলাম।' এরপর প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করতে গিয়ে আবুল মনসুর বলেছেন ঃ 'কেন মওলানাকে গেরেফতার করিতে হইবে, তার কোনও কারণ পাইলাম না।' (পৃঃ-৪৯১)

প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জার 'সেকান্দরী খেল'-এর শিকার প্রধানমন্ত্রী তার সাম্রাজ্যবাদী কর্তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে সংগঠনের নিয়মনীতিকে বিসর্জন দিয়ে ক্ষমতাসীন দলের সভাপতি মওলানা ভাসানীকে এমনি ন্যাক্কারজনকভাবে আক্রমণ করেছিলেন। সরকার ও তার নীতির সমালোচনা যে রাষ্ট্রের বিরোধিতা নয়—একথা প্রমাণ করতে গিয়ে এক সময় গলদঘর্ম সোহরাওয়ার্দী নিজেই সেদিন পাকিস্তানী শাসকদের পদাংক অনুসরণ করেছেন, মওলানা ভাসানী কর্তৃক তার সরকারের পররাষ্ট্রনীতির বিরোধিতাকে তিনি ভারতের পক্ষাবলম্বন হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু মওলানা ভাসানী প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের পথে রাজনীতিতে আগত ছিলেন না, তার ভিত্তি ছিলো জনগণের মধ্যে প্রোথিত এবং ফলে তাকে 'ভারতের অনুচর' হিসেবে চিহ্নিত করার নীল নক্শা সফল হতে পারেনি, ক্ষমতালোভী কতিপয় সুবিধাবাদী ব্যক্তি ব্যতীত জনগণ বা সংগঠনের কাউকেই সোহরাওয়ার্দী নিজের সমর্থনে আনতে পারেননি।

৭. সোহরাওয়ার্দীর 'জেরো থিওরী'

সোহরাওয়ার্দী তাই বলে হতোদ্যম হননি, এবার তিনি হাত বাড়িয়েছিলেন ছাত্রদের উদ্দেশ্যে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে চমক সৃষ্টি করে ১৯৫৬ সনের ৯ ডিসেম্বর তিনি অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে হেলি-

কপ্টার নিয়ে নেমেছিলেন সলিমুল্লাহ মুসলিম হল প্রাংগনে। সেখানে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে তিনি সরকারের পররাষ্ট্রনীতির সমর্থনে জোরালো বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন : 'যারা ভারতের অংগরাজ্যে পরিণত হতে চান, তাদের আমার সাথে হাত মেলানোর প্রয়োজন নেই, কেননা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমি চাই পাকিস্তানকে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে। আমার এ হাত পাকিস্তানকে দুর্বল করার জন্য নয়।' প্রসংগত তিনি জোটনিরপেক্ষতার ধারণার কঠোর সমালোচনা করেন, মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্কের প্রশ্নে তিনি বলেন : 'আরব দেশগুলির সাথে প্রতিরক্ষা সম্পর্কের অর্থ হলো একটি শূন্যের সাথে কয়েকটি শূন্যের যোগফলের সমান, আর একটি শূন্য।'[৮৬] এটাই সোহরাওয়ার্দীর বিখ্যাত 'শূন্যতত্ত্ব' বা 'zero theory'। সমাবেশে উপস্থিত প্রগতিশীল ছাত্রদের অনেকে সেদিন এর প্রতিবাদে এবং প্রশ্ন করার জন্য উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর 'স্বেচ্ছাসেবকরা' তাদের বসিয়ে দিয়েছিলো।

আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে মওলানা ভাসানী প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। বিভিন্ন সমাবেশে বক্তৃতা এবং বিবৃতির মাধ্যমে সংগঠনের কর্মসূচী থেকে প্রধানমন্ত্রীর বিচ্যুতি এবং তার পরিপন্থী বক্তব্যের দায়িত্ব তিনি অস্বীকার করেন। ১৯৫৬ সনের ১৩ ডিসেম্বর মওলানা ভাসানী বলেন যে, সংগঠনের ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচী পরিবর্তনের অধিকার ও ক্ষমতা একমাত্র আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভারই রয়েছে, কোনো ব্যক্তি বিশেষের নেই।[৮৭] এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন আহবানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

৮. মুজিব-আতাউর প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে : পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ দ্বিখণ্ডিত

মওলানা ভাসানীর বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী পূর্ব বাংলায় তার 'অভিযানে' সাফল্যলাভ করেছিলেন : আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার সদস্যদের এবং আওয়ামী লীগ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানকে তিনি সাথে পেয়েছিলেন। 'জনগণের স্বার্থে' ক্ষমতার রাজনীতিতে বেশী ব্যস্ত আতাউর রহমান খান ক্ষমতা রক্ষার প্রয়োজনে কেবল নয়, ধ্যান-ধারণার দিক থেকেও ছিলেন সোহরাওয়ার্দীর

অনুসারী। সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার সাথে সম্পর্কের প্রশ্নে নিজের দৃষ্টিভংগী ব্যাখ্যা করে ১৯৫৪ সনের অক্টোবরে ইয়োরোপ যাওয়ার প্রাক্কালে করাচীতে আতাউর রহমান খান বলেছিলেন ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সামরিক চুক্তির বিরোধিতা তিনি এ কারণে করেননা যে নিজে এর পক্ষপাতী নন, তার আপত্তির কারণ ঃ চুক্তিগুলি যাদের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে, তারা জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি নন।[৮৮] পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে 'আপোষহীন' শেখ মুজিবও একইভাবে ছিলেন তার 'লীডার' সোহরাওয়ার্দীর মতাবলম্বী। এর প্রমাণ মেলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের অগ্রগামী সংগঠন যুবলীগের (প্রতিষ্ঠাঃ ১৯৫১) বিরুদ্ধে তার ক্লান্তিহীন তৎপরতা থেকে ঃ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা এবং জনপ্রিয়তা অর্জনের পেছনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখা সত্বেও কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার কারণে 'কমিউনিস্ট অধ্যুষিত' যুবলীগকে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কারের প্রচেষ্টায় মুজিব নিয়েছিলেন প্রধান উদ্যোগীর ভূমিকা।

মওলানা ভাসানীর অবিচল বিরোধিতা এবং দলের কাউন্সিল অধিবেশন আহবানের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী অতঃপর পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগকে নিয়ন্ত্রণে আনার চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেন। ১৯৫৭ সনের ৮ জানুয়ারী কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ কার্যকরী সংসদের নামে আয়োজিত এক সভার মাধ্যমে তিনি ইতিপূর্বে সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে বরখাস্ত মাহমুদুল হক ওসমানীকে দল থেকে বহিষ্কার করেন এবং নিজের অনুসৃত নীতির সম্ভাব্য বিরোধিতাকে এড়ানোর প্রয়োজনে ২৫-২৬ জানুয়ারী অনুষ্ঠেয় পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সম্মেলনের তারিখ মে মাস পর্যন্ত পিছিয়ে দেন।[৮৯] এর প্রতিবাদে ১৯ জানুয়ারী করাচী আওয়ামী লীগের সম্পাদক বি, এম, কুটি পদত্যাগ করেন, সোহরাওয়ার্দী আক্রান্ত অন্য নেতৃবৃন্দও দলত্যাগ করতে শুরু করেন। এদের অধিকাংশ ছিলেন সিন্ধু এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের এবং তাদের বিরোধিতার আর এক কারণ ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানে জনমতের বিরুদ্ধে প্রবর্তিত এক ইউনিট সম্পর্কে সোহরাওয়ার্দীর অসত ভূমিকা। শাসনতন্ত্রে এক ইউনিটের বিধান সংযোজনের সময় বিরোধিতা করার পর বিভিন্ন সময়ে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়

গেলে তা বাতিল করা হবে। মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ১৯৫৬ সনের মে অধিবেশনে আওয়ামী লীগও তার প্রস্তাবে ঘোষণা করেছিলো যে, ক্ষমতায় গেলে দলটি এক ইউনিট প্রশ্নে পশ্চিম পাকিস্তানে জনমত যাচাই-এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা নেবে।[৯০] কিন্তু ক্ষমতাসীন হওয়ার পর স্বায়ত্তশাসন ও পররাষ্ট্রনীতির মতো এক ইউনিট প্রশ্নেও সোহরাওয়ার্দী পরিপন্থী অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, তিনি বরং ক্রমান্বয়ে হয়ে উঠেছিলেন এক ইউনিটের 'প্রধান পৃষ্ঠপোষক'।[৯১]

৯. কাগমারী সম্মেলনের সিদ্ধান্ত ঃ মওলানা ভাসানীর আহবান

আওয়ামী লীগের নীতি ও কর্মসূচী বিরোধী প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর কার্যক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ তখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছিলো ঃ সংগঠন নেতৃবৃন্দকে, না নেতৃবৃন্দ সংগঠনকে পরিচালিত করবেন। আর স্বাভাবিকভাবেই সে মীমাংসার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব বর্তেছিলো মওলানা ভাসানীর ওপর। অংগীকার পূরণের আওয়ামী লীগের ব্যর্থতা জনমতকে বিপক্ষে নিচ্ছিলো, একই সাথে আন্দোলিত হচ্ছিলেন সংগঠনের সংগ্রামী নেতা ও কর্মীরাও। ১৯৫৭ সনের ৩ জানুয়ারী সন্তোষ থেকে প্রেরিত এক বিবৃতিতে মওলানা ভাসানী জানান যে প্রতিদিন তিনি নানা অভিযোগ সম্বলিত বিভিন্ন স্তরের জনগণের অসংখ্য চিঠি পাচ্ছেন। সৃষ্ট অচলাবস্থার অবসানের জন্যে তিনি তাই আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন আহবানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

পরবর্তীতে মওলানা ভাসানী তৎকালীন টাংগাইল মহকুমার কাগমারীতে ১৯৫৭ সনের ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারী আওয়ামী লীগের এই কাউন্সিল অধিবেশন আহবান করেন, কর্মী সম্মেলনের তারিখ নির্দ্ধারিত হয় ৬ ফেব্রুয়ারী। একইযোগে তিনি কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী এবং ৮-১০ ফেব্রুয়ারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের পরিকল্পনার কথাও ঘোষণা করেন। ১৩ জানুয়ারী প্রকাশিত এক প্রচারপত্রে সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন ঃ 'পূর্ব বাংলার বাঁচার দাবী পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের দাবী এবং মহান ২১ দফার বাকী ১৪ দফা দাবী পূরণের জন্য বিচ্ছিন্ন জনশক্তিকে আওয়ামী লীগের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তুমুল আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে।'[৯২] 'দেশের নানাবিধ সমস্যার সমাধানের উপায় উদ্ভাবন এবং আন্দোলনকে সঠিকভাবে

পরিচালনার জন্য' কাগমারীতে আহূত সম্মেলনে অংশ নিতে তিনি 'পূর্ব বাংলার গরীব চাষী, মজুর, ছাত্র, যুবক ও জনসাধারণের' প্রতি এবং সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবিদের প্রতি আহবান জানান।

সম্মেলনের প্রাক্কালে ১৯৫৭ সনের ৩ ফেব্রুয়ারী মওলানা ভাসানী প্রকাশিত অপর এক প্রচারপত্রের ভাষায় তার 'কাগমারীর ডাক' ছিলো: 'সাড়ে চার কোটি বাংগালীর বাঁচার দাবী আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসন আদায়ের ডাক; ঐতিহাসিক মহান ২১ দফা আদায়ের ডাক; চাষী, মজুর, কামার, কুমার, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবি ও শিল্পী সকল শ্রেণীর মিলনের ডাক; সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে এশিয়া-আফ্রিকার মুক্তির ডাক; পূর্ব বাংলার ৬০ হাজার গ্রামে আওয়ামী লীগকে সংগঠনের ডাক।' পরিশেষে তিনি বলেন: '২১ দফার পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য আমাদের নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন চালাইয়া যাইতে হইবে। ইহা সারা পাকিস্তানের সামাজিক ও আর্থিক পরাধীনতার হাত হইতে মুক্তির মহান ইহা যেন আমরা কখনো বিস্মৃত না হই।'[১৩]

১০. ভাসানী-বিরোধী আঁতাত-আয়োজন

কাগমারীতে আহূত সম্মেলন, বিশেষ করে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পররাষ্ট্রনীতি কেন্দ্রিক এর আলোচ্যসূচী প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী এবং তার অনুসারীদের জন্য দারুণ অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করেছিলো। দলের কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করার মতো যুক্তির অনুপস্থিতিতে তারা স্থান হিসেবে কাগমারীর বিরুদ্ধে বক্তব্য তুলে ধরেন। এ ব্যাপারে মুখপত্রের ভূমিকায় নামে মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত দৈনিক 'ইত্তেফাক' (সাপ্তাহিক থেকে দৈনিক হয় ১৯৫৩ সনের ২৪ ডিসেম্বর)। মওলানা ভাসানীর আনুকূল্যে 'ইত্তেফাক'-এর মুদ্রক-প্রকাশক ইয়ার মোহাম্মদ খান কর্তৃক ১৯৫১ সনের ১৪ অগাস্ট সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া 'লীডার' সোহরাওয়ার্দীর আশীর্বাদে এবং মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের সহযোগিতায় ১৯৫৪ সনের ১৪ মে থেকে নিজেকে পত্রিকাটির সর্বময় কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। 'প্রতিষ্ঠাতা' হিসেবে মুদ্রিত মওলানা

ভাসানীর নাম কিছু দিন পর্যন্ত 'পৃষ্ঠপোষক' হিসেবে মুদ্রণের পর ধীরে ধীরে তিনি নিজেই নিয়েছিলেন প্রতিষ্ঠাতার স্থানটিও।[১৪]

সোহরাওয়ার্দী এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রতি আনুগত্যের কারণে পররাষ্ট্র নীতির মতো মৌলিক নীতিগত প্রশ্নে মওলানা ভাসানীর আন্দোলনও ছিলো মানিক মিয়ার দৃষ্টিতে 'এক হৈ চৈ'। সম্মেলনের স্থান সম্পর্কে তার বক্তব্য ছিলো ঃ "কাগমারীর মতন একটি গ্রামাঞ্চলে কাউন্সিলার, ডেলিগেট এবং অন্যান্য আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সুকঠিন হইবে, এই যুক্তিতে 'ইত্তেফাক' এই কাউন্সিল অধিবেশন ঢাকায় অনুষ্ঠানের সুপারিশ করে।"[১৫] কিন্তু মওলানা ভাসানী তার সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন, কেননা, আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো প্রাসাদ ও মঞ্জিলে অবরুদ্ধ মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে এবং পূর্ব বাংলায় এই জনগণের বসবাস ছিলো 'কাগমারীর মতন' গ্রামাঞ্চলেই।

কাগমারী সম্মেলন উপলক্ষে মওলানা ভাসানীর পরিকল্পনা ছিলো ব্যাপক এবং 'উচ্চাভিলাষী'। পরিকল্পিত সাংস্কৃতিক সম্মেলনকে আন্ত-র্জাতিক অনুষ্ঠানে পরিণত করার উদ্দেশ্যে তিনি একে 'আফ্রো-এশিয়' সম্মেলন হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এতে যোগদানের আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি ভারত সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবিদের কাছে চিঠি লিখেছিলেন। তার এই 'আন্তর্জাতিক' তৎপরতা মুসলিম লীগ সহ দক্ষিণপন্থী দলগুলির মুখপত্রদের নতুন 'তথ্যের' সন্ধান দিয়ে-ছিলো ঃ 'আজাদ', 'ডন', 'মর্নিং নিউজ' সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এই মর্মে সংবাদ প্রকাশ করতে থাকে যে মওলানা ভাসানী ভারতের সাহায্য ও অনুপ্রেরণায় সম্মেলনটির আয়োজন করতে যাচ্ছেন। 'ইত্তেফাক' ভার-তের নাম উল্লেখ থেকে বিরত থাকলেও ভাসানী-বিরোধী বিষোদগারের ক্ষেত্রে অন্য পত্রিকাগুলির সহযাত্রী হয়েছিলো।

ভারত বিরোধিতার নতুন উদ্যমী নায়ক প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর 'সফল' পররাষ্ট্রনীতি, তার শক্তিশালী বৃহৎ 'মিত্রদের' সমর্থন এবং ২৪ জানুয়ারী জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভোটদান সত্বেও কাশ্মির তার গণপরিষদের সিদ্ধান্তানুযায়ী ১৯৫৭ সনের ২৬ জানুয়ারী থেকে ভার-তের 'অবিচ্ছেদ্য অংগরাজ্য' হিসেবে পরিণত হয়। ফলে কাগমারী সম্মে-লনের সময়টিতে পাকিস্তানে নতুন করে ভারত-বিরোধী আবেগাক্রান্ত

মনোভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো। সোহরাওয়ার্দী সহ সামরিক চুক্তি ও জোটের সমর্থকরা এই মনোভাবকে উস্কিয়ে দিয়ে পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণের নবতর প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। মুসলিম লীগ সভাপতি সরদার নিশতার 'পাকিস্তানের একমাত্র শত্রু' ভারতের বিরুদ্ধে যে কোনো দেশের সাথে যে কোনো প্রকার আক্রমণাত্মক বা আত্মরক্ষামূলক চুক্তি স্বাক্ষরের সপক্ষে মত ঘোষণা করেন।[১৬] নবতর এই প্রচেষ্টারই অংশ হিসেবে সোহরাওয়ার্দী এবং তার সমর্থকরা মওলানা ভাসানী ও আওয়ামী লীগের প্রগতিশীলদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির দাবীকে ভারতের পক্ষালম্বন এবং অনুপ্রেরণা বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে সোহরাওয়ার্দীর শক্তির উৎস ছিলো নানাবিধ ঃ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির আশীর্বাদ এবং প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা সহ সরকারের সম্পূর্ণ শক্তি ও সমর্থনের পাশাপাশি তিনি পেয়েছিলেন প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও সংবাদপত্রের অকুণ্ঠ সহযোগিতা, তদুপরী তার পেছনে ছিলেন 'ইত্তেফাক' সম্পাদকের মতো অনুগত, বিশ্বস্ত এবং মূল্যবান 'মানিক'।

কুৎসা, হুমকি এবং অবমাননা সহ সকল প্রকার বিরোধী আয়োজনের মুখেও মওলানা ভাসানী সে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ছিলেন আপোষহীন। ১৯৫৭ সনের ৫ ফেব্রুওয়ারী কাগমারীতে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে তিনি ঘোষণা করেন ঃ 'আমি কোনো প্রকার যুদ্ধজোটে বিশ্বাস করি না। বিশ্বশান্তির পরিপন্থী যে কোনো প্রকার যুদ্ধজোট মানব সভ্যতা ও মুক্তির পথে বাধা স্বরূপ।' মওলানা ভাসানী আরো বলেন ঃ 'যত কঠিন বাধাই আসুক না কেন আমি পাকিস্তানের জনগণের প্রকৃত কল্যাণের জন্য স্বাধীন ও জোট নিরপক্ষে পররাষ্ট্রনীতির সংগ্রাম করিয়া যাইব। কারণ, আমি বিশ্বাস করি, এই নীতিই পাকিস্তানের জনগণের প্রকৃত মুক্তি ও শান্তির পথ প্রশস্ত করিবে।'[১৭]

৬ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় কাগমারীতে সমবেত প্রায় চার হাজার আওয়ামী লীগ কর্মীর সামনে এক ভাষণে সিয়্যাটো, বাগদাদ চুক্তি এবং পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির তীব্র বিরোধিতা করে তিনি বলেন ঃ 'আমাকে যদি কেহ সামরিক চুক্তি সমর্থন করিতে বলেন, তা হইলে কবর হইতেও আমি বলিব না, না, না।'[১৮] অপর দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক বিভাগের ছাত্র সমাবেশে একই দিনে প্রধানমন্ত্রী এক বক্তৃতায় এই মর্মে

ঘোষণা দেন যে তার অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতি ইতিমধ্যেই **'ফলপ্রসু ফলাফল'** এনেছে। পাকিস্তানকে সমর্থনদানের জন্য বৃটেন ও আমেরিকা সহ বাগদাদ চুক্তিভুক্ত দেশগুলির প্রতি 'কৃতজ্ঞতা' জ্ঞাপন করে তিনি বলেনঃ পৃথিবীতে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির জন্য ইতিমধ্যেই আকাংখিত পরিবেশ তৈরী হয়েছে। সোহরাওয়ার্দী তার পূর্বঘোষিত মতের পুনরুল্লেখ করে সুয়েজ সংকট প্রসংগে বলেনঃ বিশ্বব্যাপী এমন চাপ সৃষ্টি হয়েছিলো যে বৃটেন এবং মিসর উভয়কেই নীলনদের এলাকা ছাড়তে হয়েছে।[৯৯]

৩

কাগমারী সম্মেলন ঃ ভাসানীর 'আসসালামু আলাইকুম'

কাগমারী সম্মেলন উপলক্ষে তৎকালীন মহকুমা শহর টাংগাইল এক নতুন সাজে সাজ্জিত হয়েছিলো। পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং স্বাধীন ও জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি সহ বিভিন্ন দাবী ও মনীষীদের বাণী-সম্বলিত অসংখ্য পোস্টার ও ফেস্টুনের পাশাপাশি টাংগাইল থেকে সন্তোষ পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার পথের নানাস্থানে নির্মিত হয় শতাধিক মনোরম তোরণ। তোরণগুলি উৎসর্গীত ছিলো বিভিন্ন দেশের রাজনীতিবিদ ও মনীষীদের উদ্দেশ্যে ঃ স্যার সৈয়দ আহমদ, শহীদ তিতুমির, মওলানা শওকত আলী, মওলানা মোহাম্মদ আলী, আল্লামা আজাদ সোবহানী, কায়েদে আজম, হাকিম আজমল খান, নেতাজী সুভাষ বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মহাত্মা গান্ধী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, আব্রাহাম লিংকন, লেনিন এবং সেক্সপিয়ার সহ আরো অনেককে তোরণগুলিতে স্মরণ করা হয়েছিলো। এছাড়া ছিলো 'বিড়ী শ্রমিক ইউনিয়ন' সহ কতিপয় স্থানীয় সংগঠনের তোরণ।

ঝোপ আর জংগলে ভরা সন্তোষকে মাত্র তিন চার দিনের মধ্যে পরিষ্কার করেছিলেন মওলানা ভাসানীর মুরিদ এবং অনুসারীরা। ঢাকার কলতা-বাজারের চৌধুরী কোম্পানী সেদিনের এই অজগ্রামটিতে বিজলী বাতির ব্যবস্থা করেছিলো। মওলানা ভাসানীর বর্তমান মাজার থেকে প্রায় তিনশ' গজ উত্তরের দীঘির ধার ঘেঁষে বুক সমান উঁচু প্রায় একশ' হাত দীর্ঘ এক অবিশ্বাস্য চুলো কাটা হয়েছিলো রান্নার জন্য। এর কাছে শুকনো ডাঙায় রাখা ছিলো কয়েকটি নৌকা। এই নৌকাগুলিতে সম্মেলনকালে

রান্নার পর ডাল রাখা হতো। পাশ দিয়ে মাটিতে পেতে রাখা অসংখ্য চাটাই এর ওপর থাকতো ভাত। প্রায় এক হাজার মাটির সানকি ছিলো আশেপাশে ঃ সম্মেলনে আগত কর্মী ও প্রতিনিধিরা যার-যার মতো এই সানকিগুলিতে ডাল-ভাত দিয়ে খাওয়ার পর দীঘির পানিতে ধুয়ে রাখতেন যথাস্থানে। হাজার হাজার মানুষের সে-দিন ক'টির খাওয়ার ব্যবস্থা করে-ছিলেন প্রধানত মওলানা ভাসানীর মুরিদ ও অনুসারীরা ঃ তাদের আঁচলে-আঁচলে বেঁধে আনা চাল, ডাল আর কাঁধে কাঁধে বয়ে আনা লাকড়ী এই বিপুল আয়োজনকে সম্ভব করে তুলেছিলো। উল্লেখ্য যে প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জহিরুদ্দিনের মাধ্যমে সম্মেলনের জন্য দু'লক্ষ টাকা পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু ভাসানী তা গ্রহণ করেননি।[১০০]

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাত, স্বায়ত্তশাসন ও পররাষ্ট্রনীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্যসূচী এবং সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আন্তর্জাতিক চরিত্রের কারণে মওলানা ভাসানী আহূত কাগমারী সম্মেলন সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। পাকিস্তানের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি দেশই নিজ নিজ দৃষ্টিভংগী থেকে এই উপলক্ষে তৎপর হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রেও কুটনৈতিক শালীনতা বিসর্জন দিয়ে অগ্রগামী ভূমিকা নিয়েছিলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঃ ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন ভাইস-কনসাল স্টকওয়েল এভার্টস সদলবলে কাগমারীতে ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করে তার পর্যবেক্ষনকে 'নিখুঁত' করেছিলেন।[১০১]

১. সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তুতি ঃ মুজিবের নেতৃত্বে আগে আক্রমণ

কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে হেলিকপ্টারযোগে কাগমারী আগত প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তুতিও ছিলো সর্বাত্মক ঃ মন্ত্রীত্ব এবং যোগ্যতা ও চাহিদামতো সুযোগ সুবিধে প্রদানের মধ্য দিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি সহ আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতাকেই তিনি 'হাত' করে নিয়েছিলেন। সোহরাওয়ার্দী অনুসারীদের নেতৃত্বের হাল ধরেছিলেন প্রাদেশিক শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী, আওয়ামী লীগ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান। 'লীডার' সোহরাওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রীত্ব অব্যাহত রাখার সাথে সাথে নিজের মন্ত্রীত্ব রক্ষাও ছিলো মুজিবের অন্যতম উদ্দেশ্য। কারণ, ১৯৫৫ সনের অক্টোবর অধিবেশনে গৃহিত গঠনতন্ত্রের ৬৬ তম ধারার বিধানে বলা হয় যে আওয়ামী লীগের কোনো নেতা মন্ত্রীত্বে অধিষ্ঠিত হলে তাকে সংগঠনের

কর্মকর্তার পদ ছাড়তে হবে। সে অনুযায়ী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আবুল মনসুর আহমদ এবং মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান তাদের সহ-সভাপতির পদ দুটি ছেড়ে দিলেও শেখ মুজিব তখনো পর্যন্ত সাধারণ সম্পাদকের পদে বহাল ছিলেন। ফলে সোহরাওয়ার্দীর জয়-পরাজয়ের মধ্যে তার নিজেরও ভবিষ্যত এবং স্বার্থ জড়িত ছিলো।

কাউন্সিল অধিবেশনে নিশ্চিত পরাজয় মোকাবেলার পন্থা হিসেবে মুজিবের নেতৃত্বে সোহরাওয়ার্দী অনুসারীরা আগে আক্রমণের কৌশল বেছে নিয়েছিলেন। ১৯৫৭ সনের ৬ ফেব্রুয়ারী রাতে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সভায় তারা পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে নতুন কোনো প্রস্তাব উত্থাপনের বিরোধিতা করেন। সপক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন সাংগঠনিক সম্পাদক অলি আহাদ। প্রচার সম্পাদক আবদুল হাই-এর মতো দু'একজন ব্যতীত উল্লেখযোগ্য আর কেউ তার সমর্থনে এগিয়ে আসেননি, ফলে বৈঠকে প্রস্তাব উত্থাপনের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অবস্থা তৈরী হয়। সভাপতি হিসেবে মওলানা ভাসানী তখন বলেন: প্রধানতঃ পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নেই তিনি কাউন্সিল অধিবেশনটি আহবান করেছেন এবং কাউন্সিল সভাই যেহেতু দলীয় নীতি ও সিদ্ধান্তের ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী, তাই কর্তব্য পালনের স্বার্থে তিনি নিজেই প্রস্তাবটি পেশ করবেন। মওলানা ভাসানীর বক্তব্যের পর ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৬ সনের মে পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে গৃহিত সিদ্ধান্ত সমূহের প্রতি ওয়ার্কিং কমিটি পুনরায় সমর্থন ঘোষণা করে।[১০২] [প্রসংগত উল্লেখ্য যে অলি আহাদ তার 'জাতীয় রাজনীতি: ১৯৪৫ থেকে ৭৫' গ্রন্থে বলেছেন যে প্রস্তাব উত্থাপনের পক্ষে একমাত্র তিনিই ভোট দিয়েছেন এবং প্রধানমন্ত্রীর সাথে 'সমঝোতার' কারণে মওলানা ভাসানী তাকে সমর্থন করেননি (পৃ-২৬৫-৬৭)। কিন্তু কাউন্সিল অধিবেশনে মওলানা ভাসানীর বক্তৃতা ও প্রস্তাব উত্থাপন সহ সার্বিক ভূমিকা এবং পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের প্রেক্ষিতে অলি আহাদের বক্তব্যকে সঠিক বলা যায়না।]

মুজিব তার দ্বিতীয় প্রচেষ্টাটি নেন আওয়ামী লীগ থেকে যুবলীগকে বহিষ্কারের লক্ষ্যে। অলি আহাদ, মোহাম্মদ তোয়াহা এবং আবদুস সামাদ সহ যুবলীগের বিপুল সংখ্যক নেতা ও কর্মীরা আওয়ামী লীগের মাধ্যমে সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে এগিয়ে

নিচ্ছিলেন, সামরিক চুক্তি ও জোট বিরোধী সংগ্রামে তারা ছিলেন মওলানা ভাসানীর প্রধান সহযোগী। সোহরাওয়ার্দী অনুসারীদের অসন্তোষের আশু কারণটিও ঘটিয়েছিলেন আলি আহাদঃ কাগমারী সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত 'পূর্ব-পাক আওয়ামী লীগ ও বৈদেশিক নীতি' শীর্ষক পুস্তিকায় পররাষ্ট্রনীতি প্রসংগে আওয়ামী লীগের নীতি ও কর্মসূচী এবং বিভিন্ন সময়ে গৃহিত প্রস্তাব সমূহের উল্লেখ করে তিনি প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী অনুসৃত নীতির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন (প্রকাশক ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক আবদুল হাই)। সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের মধ্যে পুস্তিকাটি বিতরণ করা হয়েছিলো। আওয়ামী লীগে অবস্থানরত যুবলীগের অধিকাংশ নেতা ও কর্মী আত্মগোপনরত কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে পরিচালিত হতেন। আওয়ামী লীগের ওপর কমিউনিস্টদের 'প্রভাব' উৎখাতের পাশাপাশি মওলানা ভাসানীর অবস্থানকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে মুজিব তার যুবলীগ-বিরোধী অভিযানটি চালিয়েছিলেন। মওলানা ভাসানী বিশ্রাম নিতে যাওয়ার পর গভীর রাতে আবুল মনসুর আহমদের সভাপতিত্বে চলতে থাকা ওয়ার্কিং কমিটির সভায় শেখ মুজিব এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে আওয়ামী লীগের কোনো সদস্য একই সাথে যুবলীগের সদস্যপদে থাকতে পারবেননা। অলি আহাদ এবং মোহাম্মদ তোয়াহা সহ কতিপয় নেতা সাথে সাথে বিশ্রামরত মওলানা ভাসানীকে সংবাদ দেন এবং তিনি এসে মুজিব উত্থাপিত প্রস্তাবের বিরোধিতা করে দীর্ঘস্থায়ী বক্তব্য রাখেন। এই ভাষণে আওয়ামী লীগের সংগঠন ও জনপ্রিয়তার পেছনে যুবলীগের অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মওলানা ভাসানী বলেন যে যুবলীগকে বহিষ্কার করা হলে তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ পরিত্যাগ করবেন। ফলে সেবারের মতো যুবলীগ বিরোধী সিদ্ধান্তটি গৃহিত হতে পারেনি, মুজিব নিরাশ হয়েছিলেন।

২. কাউন্সিল অধিবেশন

পরদিন, ১৯৫৭ সনের ৭ ফেব্রুয়ারী (২৪ মাঘ, ১৩৬৩) বৃহস্পতিবার সকালে আরম্ভ হয়েছিলো ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলন। ৮৯৬ জন কাউন্সিলারের উপস্থিতিতে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত

হয় বর্তমান সন্তোষে মওলানা ভাসানীর মাজার সংলগ্ন ভবনটির অভ্যন্তরে ঃ চারদিকে বারান্দা ও মাঝখানে নীচু উঠোন সম্বলিত বর্গাকার এই ভবনটি এক সময় সন্তোষের দখলদার মহারাজাদের 'নাট মন্দির' হিসেবে ব্যবহৃত হতো। কাউন্সিলার ব্যতীত অন্য কাউকে প্রথমাবস্থায় ভেতরে যেতে দেয়া হয়নি, বিশেষ করে সাংবাদিকরা যাতে মওলানা ভাসানীর বক্তৃতার সময় উপস্থিত থাকতে না পরেন সে ব্যবস্থার তদারকী করেছিলেন শেখ মুজিব স্বয়ং। এই বিধি নিষেধ অবশ্য বেশীক্ষণ বজায় রাখা যায়নি ঃ এ ধরণের পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত সাংবাদিকরা অচিরেই প্রবেশের ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়, দলীয় কর্মী ও সমবেত সাধারণ মানুষের চাপে তাঁদের শোনার সুবিধার্থে ভবনের বাইরে জনসভায় ব্যবহারের জন্য লাগানো বেশ কয়েকটি লাউড স্পীকারও চালু করে দিতে হয়েছিলো। ফলে বক্তাদের বক্তব্য শোনায় কারো কোনো অসুবিধে হয়নি।

কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন লুংগী ও খদ্দরের পাঞ্জাবী গায়ে, মাথায় 'ভাসানী টুপী' পরিহিত মওলানা ভাসানী। তার পাশের আসনটিতে ছিলেন পাশ্চাত্য কায়দায় স্যুট ও টাই পরিহিত প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীদের পরনে ছিলো কালো শেরওয়ানী ও চুরিদার পায়জামা, তারা বসেছিলেন দলীয় কর্মীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বারান্দায় পৃথক এক সারিতে। কাউন্সিলারদের বসার ব্যবস্থা হয়েছিলো বারান্দা ও উঠোনের পাকা মেঝেতে, তাদের অধিকাংশের পরনে ছিলো লুংগী, পায়জামা ও পাঞ্জাবীর মতো দেশীয় পোষাক, শেষ মাঘের শীত নিবারণের জন্য গায়ে ছিলো সুতী বা খদ্দরের চাদর। একই রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীদের সাথে তার ক্ষমতাসীনদের পোষাক ও অবস্থানগত এই পার্থক্য এত প্রকট ছিলো যে তা উপস্থিত দেশী-বিদেশী সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের কাছে অত্যন্ত দৃষ্টিকটু ও বিশ-দৃশ্য মনে হয়েছিলো।

৩. মওলানা ভাসানীর ভাষণ ঃ মুসলিম লীগের সমালোচনা

সভাপতি হিসেবে মওলানা ভাসানী কাউন্সিল অধিবেশনে প্রদত্ত দীর্ঘস্থায়ী গুরুত্বপূর্ণ ভাষণের শুরুতেই আওয়ামী লীগের ক্ষমতা লাভের

পটভূমি বর্ণনা করতে গিয়ে মুসলিম লীগের রাজনৈতিক অপমৃত্যুর কারণ সমূহ ব্যাখ্যা করেছিলেন। 'বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে' মুসলিম লীগের পরিণতির বিচার করার আহবান জানিয়ে তিনি বলেন ঃ 'অতন্দ্র দৃষ্টি এবং সর্বদা তীক্ষ্ণ প্রহরাধীন না রাখলে ক্ষমতা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মৃত্যু যত শীগগির ডেকে আনে, তত শীগগির আর কিছুতে আনেনা।' তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন ঃ 'বিরোধী দল হিসেবে দু'একটা ভুল করলে সর্বসাধারণ অনেক সময় ক্ষমা করে থাকে, কিন্তু ক্ষমতাসীন দল হিসেবে ভুল করলে সে ভুলের ক্ষমা নেই।'[১০৩]

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নেতাদের জন্য 'সাবধান হওয়াকে সহজ' করার উদ্দেশ্যে মওলানা ভাসানী মুসলিম লীগের ভুল এবং অন্যায় গুলিকে আটটি অংশে বিভক্ত করে বর্ণনা করেন। তার মতে ক্ষমতা মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের 'মাথাকে গুলিয়ে দিয়েছিলো' এবং ফলে পূর্ব বাংলার সাড়ে চার কোটি মানুষের মতামত না নিয়েই তারা করাচীতে রাজধানী নিয়েছেন, উদু কে রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছেন, এবং একই সাথে চাকুরী ও অর্থ বণ্টনের ক্ষেত্রে শুরু করেছিলেন বৈষম্যমূলক আচরণের। মুসলমানদের 'আল্লাহ এক, ধর্ম এক, রাসূল এক এবং কিতাবও এক' এই যুক্তিতে তারা রাজনৈতিক দলও একটি করার নামে মুসলিম লীগের দোষ-ত্রুটির ন্যায়সংগত সমালোচনাকেও ইসলাম বিরোধিতা এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতা আখ্যা দিয়ে ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মুসলিম লীগের কর্ণধাররা পাকিস্তানকে নিজেদের 'জমিদারী' হিসেবে ব্যবহার করে যে বিপুল অর্থ আর সম্পত্তির মালিক হয়েছেন তার তদন্ত যদি কখনো হয় তাহলে, মওলানা ভাসানী বলেন ঃ 'পাকিস্তান লুণ্ঠনের যে চিত্র জনসম্মুখে প্রকাশিত হয়ে পড়বে তা অতীতের সমস্ত রাজনৈতিক অসততা, দুর্নীতি, ফেরেববাজী ও চুরি-চামারীকে হার মানাবে।' 'রাজনীতির ভাবালুতা ভিত্তিক অর্থনীতি' প্রয়োগ করতে গিয়ে মুসলিম লীগ এ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং অডিটরদের 'অর্থনীতিবিদ'-এর মর্যাদা দান করে। তাদের বুদ্ধিতে বাণিজ্য পরিচালিত হওয়ায় পূর্ব বাংলা থেকে ভারতের পাট আমদানীর পরিমাণ ৪০ লাখ বেলের স্থলে নেমে আসে ১০ লাখ বেলে ঃ ভারত তার পাট উৎপাদন বাড়াতে শুরু করে, কিন্তু পাকিস্তানে শুরু হয় 'পাট উৎপাদন কমাও নীতি'। চীন ও রাশিয়া সহ সমাজতান্ত্রিক

দেশগুলির সাথে বাণিজ্যের প্রশ্নে দীর্ঘকাল দ্বিধায় কাটানোর পর সম্পর্ক স্থাপিত হলেও তাকে সম্প্রসারণের ব্যবস্থা হয়নি। মুসলিম লীগের 'এ্যাকাউন্ট্যান্ট অর্থনীতি বিশারদরা' পাকিস্তানের দুই অংশে সোনার দুটি মূল্য নির্দ্ধারণের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে লুন্ঠনের জোয়ালে আবদ্ধ করে লাংগল ধরেছিলেন। ফলে পাকিস্তানের অর্থনীতি হয়েছে বিপর্যস্ত, আর পূর্ব বাংলা পরিণত হয়েছে 'ভিখারীর দেশে'। দেশ শাসনে মুসলিম লীগের এমনিতর 'প্রচেষ্টার' ফলে পাকিস্তান তার দৈনন্দিন খরচের জন্যেও পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে, সাহায্যের জন্য এমনকি রাজনৈতিক স্বাধীনতা পর্যন্ত বিসর্জন দেয়ার অবস্থা এসে যায়। মওলানা ভাসানী বলেন ঃ পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের পরিচালকদের মধ্যে 'মূর্খতা ও আত্মম্ভরিতার' এমন একত্র সমাবেশ হলে দেশবাসীর বিচারে তাদের গুরুতর শাস্তি হতো।

৪. স্বায়ত্তশাসন চাই ঃ না হলে 'আসসালামু আলাইকুম'

মুসলিম লীগ শাসনামলের বিশ্লেষণ শেষে মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের ক্ষমতাসীনদের প্রতি দৃষ্টি ফেরান। 'এখন পর্যন্ত আমাদের অনেক কাজ বাকী' একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন ঃ 'পররাষ্ট্র, মুদ্রা এবং দেশরক্ষা বিভাগ ছাড়া সকল বিভাগের ভার প্রদেশকে দিতে হবে।' কারণ এটাই আওয়ামী লীগ ঘোষণাপত্রের এবং একুশ দফার প্রধান কথা। তিনি বলেন ঃ নিজের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করার পূর্ণ ক্ষমতা আর শিল্প, বাণিজ্য, ডাক ও রেলওয়ে সহ সকল বিভাগের পূর্ণ কর্তৃত্ব পূর্ব বাংলার হাতে না আসা পর্যন্ত এবং অর্থনীতির বিচারে দুই প্রদেশকে দুটি স্বতন্ত্র স্বত্তা হিসেবে স্বীকার না করা পর্যন্ত পূর্ব বাংলার সর্বাংগীন মংগল সম্ভব নয়।

বিনা খেসারতে জমিদারী উচ্ছেদের (একুশ দফার দ্বিতীয় দফা) ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন ঃ মধ্যস্বত্বভোগীদের ক্ষতিপূরণদানের নামে যে ৬০ কোটি টাকা দেয়ার আইন হয়েছে তা দিতে গেলে পূর্ব বাংলাকে নিঃস্ব হতে হবে। এই টাকায় তিনি প্রদেশে শিল্পকারখানা গড়ার আহবান জানিয়ে বলেন ঃ যোগ্যতানুযায়ী জমিদার-তালুকদারদের এ সকল প্রতিষ্ঠানে চাকুরী দেয়া যেতে পারে, কিংবা প্রয়োজনে তাদের মধ্যে এগুলির কিছু শেয়ারও বিক্রী হতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার (একুশ দফার নবম দফা) ওয়াদা প্রসংগে তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেনঃ ১৯৪৮ সনে ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিলো ৬০ হাজার, ১৯৪৭ সনে সেটা হয়েছে ৩০/৩৫ হাজার, হাই স্কুল ও হাই মাদ্রাসার সংখ্যা ২ হাজার থেকে কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১৪ শ'তে। চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের চাইতেও কম বেতন দেয়া হয় পূর্ব বাংলার প্রাথমিক শিক্ষকদের।

দেশরক্ষা বিভাগ সম্পর্কে মওলানা ভাসানী বলেনঃ একে কেন্দ্রের হাতে রাখার কথা বলার অর্থ এই নয় যে তার নিয়োগ থেকে পূর্ব বাংলার যুবকরা চিরদিন বঞ্চিত থাকবে। সামরিক বিভাগে কর্মরতদের মধ্যে শতকরা পাঁচজনও পর্ব বাংলা থেকে নেয়া হয়নি উল্লেখ করে তিনি বলেনঃ বৈদেশিক সাহায্যের বাইরে কেবল মাত্র রাজস্ব আয়েরই প্রায় সত্তর ভাগ অর্থ ব্যয়িত হয় দেশরক্ষা খাতে এবং পূর্ব বাংলা সে বিরাট আয় থেকে বঞ্চিত। জাপানী ও চীনাদের মতো খর্বকায়রা যুদ্ধের উপযোগী হতে পারলে পূর্ব বাংলার যুবকরা কেন পারবেনা, তিনি প্রশ্ন করেন। অবিলম্বে পূর্ব বাংলায় সমরাস্ত্র কারখানা নির্মাণের এবং নৌ বাহিনীর সদর দফতর স্থানান্তরের জন্যেও তিনি দাবী জানান।

শিল্পায়ন সম্পর্কে মওলানা ভাসানী বলেনঃ পূর্ব বাংলায় প্রতি বর্গমাইলে প্রায় নয় শত মানুষের বাস, পশ্চিম পাকিস্তানে এই সংখ্যা এক শতেরও কম। সুতরাং বিজ্ঞানসম্মত বিধান হলো পূর্ব বাংলায় শিল্পায়ন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে যান্ত্রিক চাষাবাদের ব্যবস্থা করা। কিন্তু পূর্ব বাংলায় কোনোটারই ব্যবস্থা না করে কেন্দ্রীয় সরকার ভারী ও সকল শিল্পকারখানা পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রিভূত করেছেন। পূর্ব বাংলার শিল্পায়ন এবং সুস্থ বানিজ্যের স্বার্থে প্রাদেশিক সরকারের উদ্যোগে বাঙালীদের কর্তৃত্বাধীন একটি বৃহদাকার ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি দাবী জানান। পূর্ব বাংলায় ব্যবসাকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে থাকায় প্রাদেশিক সরকার বিপুল পরিমাণ আয়কর প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি একতরফা আয়করের চাপে নিষ্পেষিত বাঙালী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা তাদের কারবার গোটাতে বাধ্য হচ্ছেন, এর ফলে যে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়েছে, তিনি তারও অবসান দাবী করেন।

'আওয়ামী লীগ ক্ষমতা পাওয়ায় আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা শেষে হয়ে গেছে' বলে যারা মনে করেন তাদের ভুল ভাঙনের কামনা প্রকাশ করে মওলানা ভাসানী বলেন ঃ ১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্রে পূর্ব বাংলার অধিকার স্বীকৃত হয়নি, এর সংশোধনের জন্য আওয়ামী লীগকে সক্রিয় হতে হবে। অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালানোর আহবান জানিয়ে তিনি আগামী দিনের আন্দোলনকে 'গণতন্ত্র কায়েমের আন্দোলন' এবং 'শক্তিশালী আমলাতন্ত্রের হাত থেকে জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা নেওয়ার আন্দোলন' হিসেবে বর্ণনা করেন। পাশে উপবিষ্ট প্রধানমন্ত্রীর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তিনি পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের আশু প্রতিকারের ব্যবস্থা করার এবং আবিলম্বে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন-দানের দাবী জানান। সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরপর মওলানা ভাসানী বলেন ঃ না হলে ভবিষ্যতে, আজ থেকে দশ বৎসর পর এমন সময় আসতে পারে যখন পূর্ব বাংলা 'আসসালামু আলাইকুম' বলার প্রবণতা অনুভব করতে পারে।

৫. সামরিক চুক্তি ও যুদ্ধজোটের বিরোধিতা ঃ দলীয় মন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী

পররাষ্ট্রনীতি প্রসংগে তিনি আওয়ামী লীগের পূর্বাপর নীতি ও সিদ্ধান্তের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন ঃ 'সামরিক চুক্তি ও জোট বিরোধী স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে আমরা এক ইঞ্চিও সরে দাঁড়াবোনা।' সংগঠনের সিদ্ধান্ত অমান্য করার পরিণতি সম্পর্কে আওয়ামী লীগের মন্ত্রী ও পরিষদ সদস্য সহ সকল স্তরের কর্মীদের তিনি সাবধান করে দেন। বৃটিশ শাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তিনি শত শত বৎসরের সাম্রাজ্যবাদী 'বিভেদ সৃষ্টি করো এবং শাসন করো' নীতির বিরুদ্ধে এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশে দেশে শান্তি স্থাপনের সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য উদাত্ত আহবান জানান। মার্কিন ভাইস-কনসালের সাথে সকালে অনুষ্ঠিত বৈঠকের কথা বলতে গিয়ে মওলানা ভাসানী বলেন ঃ যে আমেরিকা এক সময় সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসীবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলো, সে আমেরিকাই এখন বৃটেনের মতো সাম্রাজ্যবাদী পথ ধরেছে। পাকিস্তানকে আমেরিকার অধীন একটি শিখণ্ডি রাষ্ট্রে পরিণত

করার তীব্র বিরোধিতা করে তিনি অবিলম্বে সকল সামরিক ও অসম চুক্তির বাতিল দাবী করেন।

ক্ষমতাসীন দলের সভাপতি হয়েও মওলানা ভাসানী কেন্দ্র ও প্রদেশের মন্ত্রীদের কঠোর সমালোচনা করেন। উপস্থিত মন্ত্রীদের দিকে অংগুলী নির্দেশ করে একটার পর একটা সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত উত্থাপন করে তিনি তাদের বিরুদ্ধে 'মারাত্মক অযোগ্যতার' অভিযোগ তুলে ধরেন। তার এই অভিযোগের কবল থেকে এমনকি আওয়ামী লীগ সম্পাদক শেখ মুজিবের অধীন দুর্নীতি দমন বিভাগও রেহাই পায়নি। ভাষণ শ্রবণরত মন্ত্রীদের 'চরম অস্বস্তির' মধ্যে নিপেক্ষ করে তিনি ঘোষণা করেন ঃ 'মন্ত্রীদের প্রত্যেকের একথা স্মরণ রাখা দরকার যে তাদের যে কাউকে দল এবং সরকার থেকে অপসারণের পূর্ণ ক্ষমতা সংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগের রয়েছে।' উপস্থিত কাউন্সিলাররা তার এ ঘোষণার প্রতি সমস্বরে সমর্থন জ্ঞাপন করেন। আন্তরিক সততা এবং যোগ্যতার সাথে সরকারী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মন্ত্রীদের প্রতি আহবান জানিয়ে তিনি বলেন ঃ অন্যথায় জনগণের অভিযোগের যে পাহাড় জমে উঠেছে এর পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্বত্যাগ করা ব্যতীত তার জন্য আর কোনো পথ খোলা থাকবেনা। সেই সাথে মওলানা ভাসানী পদত্যাগ করতে চাইলে কাউন্সিলারদের প্রত্যেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ 'না, না, আমরা আপনাকে সভাপতির পদে দেখতে চাই।'

বিরোধী দল ও মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার আহবান জানিয়ে মওলানা ভাসানী বলেন ঃ বিরোধী দলের অস্তিত্ব রাষ্ট্রের জন্য সরকারী দলের মতোই প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করতে হবে। বিরোধিতার জন্য তাদের দেশপ্রেমে সন্দেহ করা অনুচিত, তাদের 'শির কুচল' দেয়ার মনোভাবও পরিবর্তন করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী সহ আওয়ামী লীগ মন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে মওলানা ভাসানী বলেন ঃ ইতিহাস সাক্ষী, কোনো দেশের জনগণ কোনো কালেই ভুল করেনি। যারা বলেন যে নিরক্ষরতা বা অজ্ঞতার জন্য জনগণ ভুল করতে পারে এবং তাই তাদের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখা যায়না, তাদের সাথে জনগণের কোনো পরিচয় নেই। সমবেতভাবে জনগণ যদি ভুলই করতো, তবে তারা পাকিস্তান আনতে পারতোনা, পূর্ব বাংলার বিগত সাধারণ নির্বাচনে জনগণ যে অপূর্ব রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রমাণ দিয়েছে তার তুলনা নেই।[১০৪]

কাগমারী সম্মেলনের বিবরণ দিতে গিয়ে ৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭ সংখ্যার 'পাকিস্তান অবজারভার' লিখেছে ঃ 'একটি বিষয়ে মওলানা ভাসানী কারো মনে কোনো সন্দেহের অবকাশ রাখতে দেননি যে পরিস্থিতি কেবল তার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণেই নয়. তিনি জানেন কীভাবে কেন্দ্র ও প্রদেশে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের ওপর তার নিজের এবং সংগঠনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হয়।' তিনি পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং স্বাধীন ও জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করে কাউন্সিলারদের কাছে জানতে চান ঃ 'আওয়ামী লীগ তার নীতি ও কর্মসূচী নিয়ে সংগ্রামকে এগিয়ে নেবে, না ব্যক্তিবিশেষের প্রধানমন্ত্রীত্ব রক্ষার প্রয়োজনে তাকে বিসর্জন দেবে?' এই পর্যায়ে মন্ত্রীমণ্ডলী ব্যতীত উপস্থিত প্রতিটি কাউন্সিলার উঠে দাঁড়িয়ে দলের নীতি ও কর্মসূচী অব্যাহত রাখার পক্ষে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

৬. সোহরাওয়ার্দীর ভাষণ ঃ 'শতকরা ৯৮ ভাগ' স্বায়ত্তশাসনের তত্ত্ব ঃ যুদ্ধবাজ নীতির সমর্থন

প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী তার ভাষণে আত্মপক্ষ সমর্থনের এবং কাউন্সিলারদের মতামত স্বপক্ষে টানার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালান। মওলানা ভাসানীর অনুকরণে অক্রমণের কৌশল অবলম্বন করতে গিয়ে তিনি পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব বাংলাকে শোষণের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন ঃ 'আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানও এখন শোষিত হওয়ার একই অভিযোগ করতে পারে।' প্রসংগতঃ তিনি 'আঞ্চলিকতার' এবং 'স্বতন্ত্র' হওয়ার প্রবণতার কঠোর সমালোচনা করে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীর প্রশ্নে বলেন ঃ 'শাসনতন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তাই এ দাবীর কোনো ভিত্তি নেই।'

'পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্র থেকে যথেষ্ট পরিমাণ সাহায্য পাচ্ছে' বলে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী প্রদেশের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ নির্দ্ধারণের জন্য কমিটি গঠনের পরামর্শ দেন। সোহরাওয়ার্দী বলেন ঃ 'জাতীয় পরিষদে আইন পাশ করলেই অবস্থার উন্নতি হবেনা, দাবী আদায়ের জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করতে হবে।' আরো একবার '৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়েছে' কথাটি উল্লেখ করে মওলানা

ভাসানীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেনঃ 'বৈদেশিক সাহায্য বন্টনের মতো বিষয়-গুলিতে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন রয়েছে।'

পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে মওলানা ভাসানীর বক্তব্যকে তার নিজের প্রতি 'চ্যালেঞ্জ' হিসেবে বর্ণনা করে সোহরাওয়ার্দী সর্বাত্মকভাবে আত্ম-পক্ষ সমর্থনে অবস্থান গ্রহণ করেন। 'সময়ের ওপর নির্ভর করে, পররাষ্ট্রনীতি নির্দ্ধারণের' আহবান জানিয়ে তিনি বলেনঃ 'কোনো দেশের পররাষ্ট্রনীতিই স্থিরভাবে থাকতে পারেনা, অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে তাকে পরিবর্তন করতে হয়।' ১৯৫৫ সনে যে পররাষ্ট্রনীতির কথা বলা হয়েছিলো, এখনো সেটাই চলতে পারে কিনা, তিনি তা ভেবে দেখতে বলেন। এ ব্যাপারে বুঝতে হলে 'রাজনীতিবিদদের শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে' বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন।

সোহরাওয়ার্দী তার বিশ্লেষণ দানকালে বলেনঃ পাকিস্তানের মতো ক্ষুদ্র দেশগুলিকে নিজেদের অস্তিত্বরক্ষা এবং বিশ্বশান্তির ক্ষেত্রে সাধ্যমতো অবদান রাখার প্রয়োজনে পররাষ্ট্রনীতি নির্দ্ধারণ করতে হয়, কেননা, অন্যথায় অনিবার্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করবে। ভারতের দখল থেকে কাশ্মির উদ্ধার এবং আত্মরক্ষা সহ বিশ্বশান্তিতে অবদান রাখার জন্য পাকিস্তানকে সামরিক জোটে থাকতে হবে বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তার সরকারের অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতি ইতিমধ্যেই 'বিরাট সাফল্য' প্রমাণ করেছে দাবী করে দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে কশ্মির প্রশ্নে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের প্রসংগ তুলে ধরেন। প্রসংগতঃ মওলানা ভাসানীর মনোভাবের সমালোচনা করে তিনি বলেন 'সামরিক জোটের বিরোধী হলেও দেশবাসীর উন্নতি বিধানের জন্য তিনি অর্থনৈতিক সাহায্য গ্রহণের বিরোধী নন।' এটা সোহরাওয়ার্দীর মতে মওলানা ভাসানীর 'সুবিধাবাদী মনোভাবের পরিচায়ক।' 'পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কোনো একটি দল তথা আওয়ামী লীগের জন্যই পররাষ্ট্রনীতি নির্দ্ধারণ করতে হয় না, সমগ্র দেশের স্বার্থই তাকে দেখতে হয়'-কথাটি মনে রাখার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান।

পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে বিরাজমান মতপার্থক্য দূর করার জন্য প্রয়াস চালানোর অংগীকার জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে

দলীয় সহকর্মীদের তিনি তার নীতির যৌক্তিকতা বোঝাতে সমর্থ হবেন। বাঙালীদের ভদ্রতাবোধের ওপর আস্থা রেখে ভাষণের এক পর্যায়ে সোহরাওয়ার্দী তার পদত্যাগের 'ইচ্ছা' প্রকাশ করেন। সমবেত কাউন্সিলারদের মধ্যে সাথে সাথে নীরবতা নেমে আসে, এমনকি মন্ত্রীমণ্ডলী পর্যন্ত সংকোচে মাথা নীচু করে ফেলেন। অস্বস্তিকর সে অবস্থায় একটি মাত্র কন্ঠে 'না না' ধ্বনি ওঠে ঃ উচ্চারণকারী ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। সোহরাওয়ার্দী এর পর বলেন ঃ পররাষ্ট্রনীতির সমালোচনা করা হলেও আমাকে পদত্যাগ করতে বলা হয়নি, এবং একেই তিনি তার 'নীতির সাফল্যের আর এক প্রমাণ' হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

৭. সাংস্কৃতিক সম্মেলন

৮ ফেব্রুয়ারী শুরু হয়েছিলো তিনদিনব্যাপী সাংস্কৃতিক সম্মেলন। এই সম্মেলনকে সফল করার জন্য আবু জাফর শামসুদ্দিনকে আহবায়ক করে গঠিত প্রস্তুতি কমিটির যুগ্ম-কোষাধ্যক্ষ ছিলেন ইয়ার মোহাম্মদ খান ও সদরী ইস্পাহানী। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন কাজী মোহাম্মদ ইদরিস, ফকীর শাহাবুদ্দিন আহমদ, খায়রুল কবির এবং খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস। সম্মেলন উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান। মওলানা ভাসানীকে 'মহামানব' আখ্যায়িত করে উদ্বোধনকালে তিনি বলেন ঃ 'দেশের রাজনৈতিক দুর্যোগের দিনে তিনি (ভাসানী) আমাদের গণতন্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন, আজ তিনিই আবার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নব-জীবনদান করতে এগিয়ে এসেছেন।'[১০৫]

সাংস্কৃতিক সম্মেলনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রগতিশীল কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ এবং বুদ্ধিজীবিরা যোগদান করেছিলেন, নানা প্রসংগ এসেছিলো তাদের বক্তব্যে। এখানে অংশগ্রহণকারী কয়েক-জনের নাম এবং তাদের বক্তৃতা ও আলোচনার বিষয় উল্লেখ করা হলো ঃ ১। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঃ পাকিস্তানের ভাষা প্রসংগে, ২। ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক ঃ 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম প্রভাব', ৩। ডঃ গবিন্দ চন্দ্র দেব ঃ 'পূর্ব পাকিস্তানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব', ৪। ডেভিড গার্থ (যুক্তরাষ্ট্র) ঃ 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক জীবন,' ৫। ডঃ ওসমান গণি ঃ 'পাকিস্তানের শিক্ষার মাধ্যম,' ৬। চার্লস এ্যাডামস (কানাডা) ঃ কবি আল্লামা ইকবাল প্রসংগে, ৭। অধ্যাপক মওলানা

আবদুল কাদির (পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়) ঃ পশতু সাহিত্য প্রসংগে, ৮। এফ এইচ কসিন (বৃটেন) ঃ 'বৃটেনের সাংস্কৃতিক জীবন,' ৯। ডঃ হাসান হাবাসী (পাকিস্তানে মিসরের রাষ্ট্রদূত) ঃ 'দ্য রিনোনড হিস্টোরিয়ান অফ দ্য ফিফটিনথ সেঞ্চুরী মুসলিম ওয়ার্লড ঃ ইবনে হাজার আল-আসকালানী', ১০। আবদুল হাকীম ঃ পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা, ১১। অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর (ভারতের শিক্ষা মন্ত্রী) ঃ 'ভারতের সাংস্কৃতিক জীবন', ১২। এম ও গণি ঃ 'বিকল্প খাদ্য উৎপাদনের সম্ভাবনা ও পন্থা', ১৩। ম্যাডাম আজুরী (করাচী) ঃ নৃত্যশিল্প প্রসংগে, ১৪। শওকত ওসমান ঃ 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য,' ১৫। ডঃ হেদায়েত উল্লাহ ঃ 'উন্নত ধরণের কৃষির জন্য সরকারী সাহায্যের ব্যবহার', ১৬। ডঃ এম এন হুদা ঃ 'পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন', ১৭। বি এম আব্বাস ঃ 'পূর্ব পাকিস্তানের সেচ ব্যবস্থা ও বণ্যা নিয়ন্ত্রণ', ১৮। ডাঃ শামসুদ্দিন আহমদ ঃ হৃদরোগ প্রসংগে, ১৯। এম এন নন্দী ঃ 'পূর্ব পাকিস্তানের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের ভূমিকা', ২০। ডঃ আখলাকুর রহমান ঃ 'থটস অন দ্য ফাইন্যানশিয়াল আসপেক্টস অফ দ্য ডেভেলোপমেন্ট অফ পাকিস্তান'।

সাংস্কৃতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, ডঃ কুদরত-ই-খুদা, ডঃ নুরুল হুদা, অধ্যাপক এ বি এ হালিম (করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য), বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ, ডঃ মমতাজ উদ্দিন আহমদ ও কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ। ভারত থেকে আগতদের মধ্যে ছিলেন তারা শংকর বন্দোপাধ্যায়, প্রবোধ কুমার সান্যাল, রাধা রাণী দেবী, কাজী আবদুল অদুদ এবং বেগম সুফিয়া ওয়াদিয়া।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সংগঠনগুলির মধ্যে ছিলো যুবলীগ, চট্টগ্রামের দল, ঢাকার 'কল্লোল' করাচীর আজুরীর দল, কুষ্টিয়ার লালন শাহর দল, রংপুর থেকে আগত ভাওয়াইয়ার দল এবং ফরিদপুরের 'কাঞ্চন যাত্রা'। ভাওয়াইয়া সম্রাট আব্বাস উদ্দিন আহমদ ছিলেন অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ। এছাড়া তওশের আলী ও শেরপুর সম্প্রদায়ের জারীগান, রমেশ শীল ও সম্প্রদায়ের ছড়া ও কবিগানও ছিলো উল্লেখযোগ্য। একই যোগে চলেছিলো রামদা ও লাঠিখেলাও ঃ পদ্মা পাড়ের ঢালার চর থেকে মজিবর সরদারের নেতৃত্বে আগত লাঠিয়াল দল হাজার

হাজার দর্শককে মুগ্ধ করেছিলো। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন: মওলানা ভাসানীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিশেষ করে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এত অসংখ্য সংগঠন এসে উপস্থিত হয়েছিলো যে গোটা সম্মেলন ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে সাজিয়ে উপস্থাপিত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।[১০৬]

ক. সম্মেলনের প্রস্তাব নিয়ে বিতর্ক

পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও পররাষ্ট্রনীতিকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে বিরাজমান সংঘাত ও মতপার্থক্য দূর করার যে মহতী উদ্দেশ্যে মওলানা ভাসানী কাগমারী সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন, তা শেষ পর্যন্ত সাফল্যের মুখ দেখতে পারেনি। কাউন্সিল অধিবেশনে এ বিষয়ে কোনো প্রস্তাব গৃহিত হয়েছে কি হয়নি প্রশ্নে বিবদমান দুটি উপদলের দূরত্ব অচিরেই আরো বাড়তে শুরু করেছিলো। কাগমারী সম্মেলনের কার্যক্রম, নেতৃবৃন্দের ভাষণ এবং কাউন্সিলারদের প্রতিক্রিয়ার বিস্তারিত পর্যালোচনা এ প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবে।

দু'দিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশনে উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিকদের প্রেরিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পাকিস্তান ও ভারতসহ দেশ-বিদেশের প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রের ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারী সংখ্যা দুটিতে প্রকাশিত সংবাদে বলা হয় যে সম্মেলনে আওয়ামী লীগের ১৯৫৩, ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সনের সূত্র ধরে স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির সপক্ষে প্রস্তাব গৃহিত হয়েছে। প্রস্তাবটি মওলানা ভাসানী স্বয়ং উত্থাপন করেন এবং সমবেত কাউন্সিলাররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করেন।[১০৭] কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহিত অপর এক প্রস্তাবে আওয়ামী লীগের কর্মসূচী এবং একুশ দফার ওয়াদানুযায়ী পূর্ব বাংলাকে পূর্ণ অঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন প্রদানের কার্যকর পন্থা অবলম্বনেরও দাবী জানানো হয়। প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয় যে 'এ সম্পর্কে আর অধিক দেরী করলে তার ফল জাতীয় জীবনে মারাত্মক হতে পারে।'[১০৮]

কাউন্সিল অধিবেশন শেষে ১৯৫৭ সনের ৮ ফেব্রুয়ারী বিকেলে মওলানা ভাসানী সাংবাদিকদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহিত প্রস্তাব-

গুলি পাঠ করার এক পর্যায়ে শেখ মুজিবুর রহমান উপস্থিত হয়ে এমনভাবে বাধা দিয়েছিলেন যা থেকে 'পাকিস্তান অবজারভার'-এর সাংবাদিকের ভাষায় 'এ কথা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো যে প্রস্তাবগুলি মুজিবদের মতামতের বিরুদ্ধে গৃহিত হয়েছিলো এবং সাংবাদিকদের পেশা ও কাজের ধারা সম্পর্কে আওয়ামী লীগ সম্পাদক অত্যন্ত কম জ্ঞান ও ধারণা রাখেন।'[১০৯] মুজিবের বাধা সত্ত্বেও উপস্থিত সাংবাদিকরা মওলানা ভাসানীর কাছ থেকে প্রস্তাবের কপি এবং এ সম্পর্কিত 'সুনির্দিষ্ট বিবৃতি' লাভ করেছিলেন।

মওলানা ভাসানীকে 'নিরস্ত' করার পর অত্যন্ত অভদ্রভাবে মুজিব সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে একমাত্র তিনিই অধিবেশন সম্পর্কিত যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দেবেন এবং এ ব্যাপারে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার 'অধিকার' আর কারো নেই। তিনি ব্যতীত অন্য কারো বক্তব্যের ভিত্তিতে প্রকাশিত সংবাদের 'বৈধতা' থাকবে না বলেও তিনি জানিয়ে দেন। এরপর মুজিব বলেন, 'পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে কাউন্সিল অধিবেশনে কোনো নতুন প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়নি।'

৯. প্রস্তাব সম্পর্কে সোহরাওয়ার্দী: আবার 'শতকরা ৯৮ ভাগ'

মুজিবের বক্তব্যের সমর্থনে পরদিনই এগিয়ে আসেন প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী। তিনি কাগমারী সম্মেলনে ভাষনদানের পর ৭ ফেব্রুয়ারী ঢাকা ফিরেছিলেন, রাতে তার 'নৈশভোজ ও নাচের নিমন্ত্রণ' ছিলো: দীর্ঘনৃত্যের পর নাচের আসর থেকেই তিনি রাত দুটোয় বিমান বন্দরে গিয়েছিলেন করাচী যাওয়ার উদ্দেশ্যে।[১১০] ৯ ফেব্রুয়ারী সকালে করাচীতে রিপাবলিকান পার্টি ও আওয়ামী লীগের আড়াই ঘন্টাস্থায়ী যৌথ সভার পর সাংবাদিকদের তিনি বলেন: 'কাগমারী সম্মেলনে সমবেত কাউন্সিলারদের মধ্যে অন্ততঃ ৯৮ শতাংশ তার পররাষ্ট্রনীতিকে অনুমোদন করেছেন।'

১০ ফেব্রুয়ারী সংখ্যা 'পাকিস্তান অবজারভার'-এর প্রতিবেদনে বলা হয়: কাগমারী সম্মেলনের পর্যালোচনাকালে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী আরো বলেছেন: 'প্রথমতঃ একটি আস্থা প্রস্তাব পাশ হয়, দ্বিতীয়তঃ

পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে কোনো নতুন প্রস্তাব উথাপিত হয়নি, তৃতীয়তঃ পূর্ব-বর্তী অধিবেশনের কার্যবিবরণী অনুমোদিত হয়, এবং চতুর্থতঃ পাকিস্তানকে সমর্থনদানের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহিত হয়।' এরপর ১৫ ফেব্রুয়ারী সোহরাওয়ার্দী আবার বলেনঃ 'বিগত কাউন্সিলের কার্যবিবরণীকে এই কাউন্সিলে বহাল রাখা হয়েছে এ কারণে যে সংগঠনের বিধানানুযায়ী আগের অধিবেশনের কার্যবিবরণীকে নিশ্চিত করতে হয়। আগের কার্যবিবরণীতে বাগদাদ চুক্তিকে অনুমোদন করা হয়নি এই যুক্তিতে যে এই চুক্তি পাকিস্তানকে মুসলিম বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে।' পরিশেষে সোহরাওয়ার্দী বলেন: 'আগের কাউন্সিলের কার্যবিবরণীকে বহাল রাখায় ধ্বংসাত্মক উদ্দেশ্যে সংগঠনে আগত কিছু গোলযোগকামী এটাকেই নতুনভাবে প্রস্তাব গ্রহণ বলতে চাচ্ছে।'[১১১]

২. আতাউর রহমানের 'সুনির্দিষ্ট সত্য কথা'

প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর পর এগিয়ে আসেন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানঃ 'এক শ্রেণীর, বিশেষ করে ভারতীয় সংবাদ-পত্রের ভুল তথ্য, মিথ্যে ব্যাখ্যা এবং জল্পনা-কল্পনার প্রেক্ষিতে বাধ্য হয়ে' ১০ ফেব্রুয়ারী রাতে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি বলেন যে পররাষ্ট্রনীতি প্রসংগে 'নতুন প্রস্তাব গ্রহণ' বা 'কাউন্সিলের পূর্বতন প্রস্তাবের সংশোধন'-এ দুটির কোনোটাই সত্য নয়। 'সুনির্দিষ্টভাবে সত্য কথাটি' বলতে গিয়ে আতাউর রহমান খান বলেনঃ 'কাগমারী অধি-বেশনে আওয়ামী লীগের ১৯৫৬ সনের ১৯-২০ মে গৃহিত পররাষ্ট্র-নীতি সম্পর্কিত প্রস্তাবকেই বহাল রাখা হয়েছে।' মুখ্যমন্ত্রী তার বিবৃতিতে আরো একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেনঃ একথাও সত্য নয় যে আওয়ামী লীগের মন্ত্রীমণ্ডলী ও পরিষদ সদস্যদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মওলানা ভাসানীকে কোনো 'একক ক্ষমতা' দেয়া হয়েছে।[১১২] প্রসংগত উল্লেখ্য যে কাগমারী সম্মেলনে গৃহিত একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছিলো যে কোনো মন্ত্রী বা পরিষদ সদস্য সংগঠনের নীতি ও কর্মসূচী বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আওয়ামী লীগ তাকে দল থেকে বহিষ্কার করবে। কিন্তু

'স্টেটসম্যান' সহ ভারতের কোনো কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে বলা হয় যে মওলানা ভাসানীকে এ-ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। করাচীর 'ডন'-ও একই সংবাদ প্রকাশ করেছিলো।[১১৩] মওলানা ভাসানী নিজে এই দাবীটি কখনো করেছেন বলে জানা যায় না।

৩. প্রস্তাব সম্পর্কীত পর্যালোচনা

কাগমারী সম্মেলনে পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে প্রস্তাব সম্পর্কে বিতর্কের সৃষ্টি হতে পেরেছিলো প্রধানত একটি কারণেঃ প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীকে পদত্যাগ করতে বলা হয়নি। এই না বলাকে সোহরাওয়ার্দী যেমন তার নীতির 'সাফল্য' হিসেবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, তেমনি তার সমর্থকরা এবং 'বন্ধুরা' এর মধ্যে পেয়েছিলেন আওয়ামী লীগের নীতি থেকে 'সরে আসার' আভাস। 'কাগজে-কলমে বিরোধিতা' সত্ত্বেও সরকার পরিচালনায় সোহরাওয়ার্দীর প্রতি 'বাস্তব সমর্থনের' এই ঘটনাকে কেউ কেউ প্রধানমন্ত্রীর সাথে মওলানা ভাসানীর 'কুৎসিত সমঝোতা' হিসেবেও বর্ণনা করেছেন।[১১৪]

বিতর্কের অবসান ঘটাতে হলে কাগমারী সম্মেলনের পর্যালোচনা করা দরকার এবং সেক্ষেত্রে তৎকালীন পত্র-পত্রিকার প্রতিবেদন ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত নেতৃবৃন্দের ভাষ্যকে অবলম্বন করাই যুক্তিসংগত হবে। সত্যভাষণে অনভ্যস্থতার কারণে সেকালের নেতৃবৃন্দ বা প্রত্যক্ষদর্শীদের পরবর্তীকালীন বক্তব্যের ওপর নির্ভর করতে গেলে সত্যোদ্ধার কণ্টকর হয়ে পড়বে।

দৃষ্টান্ত হিসেবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় সেকালের 'অগ্রসেনানী' অলি আহাদের কথা স্মরণীয়ঃ পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থান ও সম্পর্কের প্রভাবে তিনি তার গ্রন্থে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেনঃ অভিমান এবং অসন্তোষের শিকার হয়ে মওলানা ভাসানী প্রসংগে তিনি যে উক্তি করেছেন পরবর্তীকালের ঘটনা প্রবাহ তাকে সত্য প্রমাণ করেনি (পৃ-২৬৫-৭১)।

'নতুন প্রস্তাব উথাপিত হয়নি' বললেও লক্ষ্যনীয়ঃ সোহরাওয়ার্দী এবং আতাউর রহমান খান তাদের বিবৃতিতে একথা স্বীকার করেছেন যে

কাগমারী কাউন্সিল অধিবেশনে পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধিবেশনে গৃহিত প্রস্তাবকে 'অনুমোদনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা' এবং 'বহাল রাখা' হয়েছে। এই স্বীকৃতিই সত্যোদ্ধারের জন্য যথেষ্ট ঃ আওয়ামী লীগের মতো একটি সংগঠনের জন্যে নীতিগত কোনো প্রশ্নে বারবার 'নতুন প্রস্তাব' উত্থাপন বা গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। একবার গৃহিত প্রস্তাবকে 'নিশ্চিত করা', 'বহাল রাখা' কিংবা প্রস্তাব গ্রহণকালীন কার্যবিবরণীকে 'অনুমোদন করা' হলেই বুঝে নিতে হবে যে সংগঠনটি তার পূর্ব-বর্তী সিদ্ধান্ত এবং অবস্থানকেই অব্যাহত রেখেছে। 'অনুমোদন' বা 'বহাল রাখার জন্য উত্থাপিত' প্রস্তাবকেই আবার ঘুরিয়ে নতুন প্রস্তাবও বলা যেতে পারে—অন্ততঃ তারা যে অর্থে 'নতুন' বলতে চান। ফলে কাগজে-কলমে প্রস্তাব উত্থাপিত কিংবা গৃহিত না হলেও কিছু যায় আসে না। তদুপরী সংবাদপত্রগুলিতো বটেই, এমনকি অলি আহা-দের মতো অসন্তুষ্ট রাজনীতিবিদরাও একথা স্বীকার করেছেন যে স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির সমর্থনে ভাষণদানকালে মওলানা ভাসানী কাউন্সিলারদের অভিমত জানতে চাইলে উপস্থিত সকলেই তাকে সমর্থন দিয়েছিলেন। এটা একটি সর্বজনস্বীকৃত ঘটনা। এই প্রেক্ষিতে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে কাগমারী সম্মেলনে সোহরাওয়ার্দী অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ তার সর্বসময়ের স্বাধীন ও জোটনির-পেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির ঘোষণাকেই আবার তুলে ধরেছিলো। মওলানা ভাসানী-বিরোধীরা যে অর্থে 'নতুন' প্রস্তাবের কথা অস্বীকার করেছেন, সে অর্থে প্রস্তাব আনীত না হয়ে থাকলেও অন্ততঃ একথা বলা যায় যে আওয়ামী লীগ তার নীতি থেকে 'বিচ্যুত' হয়েছিলো কিংবা সমর্থন জানিয়েছিলো সোহরাওয়ার্দীর নীতির প্রতি।

দ্বিতীয়তঃ সোহরাওয়ার্দীকে পদত্যাগ করতে না বলার যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে,তাকেও ওপরের আলোচনার প্রেক্ষাপটে সঠিক বলা যায় না। রাতারাতি পরিবর্তনের পরিবর্তে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলাররা অপেক্ষা ও পর্যবেক্ষণের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। কাগমারী সম্মেলনের কার্যক্রম ছিলো সোহরাওয়ার্দীর জন্য সর্বশেষ সতর্কবাণীর মতো, পরবর্তীকালের ঘটনা প্রবাহও সেকথাই প্রমাণ করেছেন। মওলানা ভাসানীও বলেছেন ঃ 'আমরা আশা করিয়াছিলাম, জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী নিজের ভুল বুঝিতে পারিবেন। সেজন্য তাহাকে আমরা

সময়ও দিয়াছিলাম। কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হয় নাই। তিনি নিজ ইচ্ছা অনুসারে সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিয়াছেন।'[১১৫]

কাগমারী সম্মেলনে সোহরাওয়ার্দী যে তার অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতির সাফল্য প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছেন এবং আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভা যে পূর্ব ঘোষিত নীতিকেই বহাল রেখেছিলো, তার আর এক প্রমাণ সাংবাদিকদের সাথে শেখ মুজিবের অভদ্র আচরণ। পরাজয় তাকে ক্রোধান্ধ করেছিলো, মওলানা ভাসানীকে 'দেখিয়ে দেয়ার' ইচ্ছায় তিনি আন্দোলিত হয়েছিলেন, 'সংগঠনের অভ্যন্তরে মওলানা ভাসানীর অবস্থান যে কতো অসহায় এবং অনিশ্চয়তাপূর্ণ' সেটা প্রমাণ করার জন্য অচিরেই তিনি দলের জেলা কমিটি সমূহের সভাপতি ও সম্পাদকদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলেন।[১১৬] রাজনীতির ভালো খেলোয়াড় মুজিব অবশ্য নিজের ক্রোধান্ধ মনোভাব গোপন করারও প্রয়াস পেয়েছিলেন ঃ ১৩ ফেব্রুয়ারী করাচীতে তিনি বল্লেন যে মওলানা ভাসানীর সাথে তার কোনো বিরোধ নেই এবং 'আমি তার অনুগত সম্পাদক।'[১১৭]

ওপরের পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে কাগমারী সম্মেলনের প্রস্তাব সম্পর্কে বলা যায় ঃ পূর্ব বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সহ একুশ দফার বাস্তবায়ন, স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি প্রতিষ্ঠার [পূর্ববর্তী প্রস্তাব সমূহের 'অনুমোদন' কিংবা 'বহাল রাখার' অর্থে হলেও] দাবী জানানো হয় এবং এই শর্তে কেন্দ্র ও প্রদেশে আওয়ামী লীগের মন্ত্রীসভাকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমোদন দেয়া হয়। পাশাপাশি এক সাংগঠনিক প্রস্তাবে বলা হয় যে মন্ত্রীসভা বা পরিষদ সদস্যদের কেউ সাংগঠনের গঠনতন্ত্র বা গৃহিত সিদ্ধান্ত পরিপন্থী কাজ করলে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হবে। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং প্রাদেশিক সরকারের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৫৭ সনের ৩১ মে-র মধ্যে যে কোনো একটি পদ ত্যাগের নির্দেশ দিয়ে অপর এক প্রস্তাবে জুনের প্রথম সপ্তাহে নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এক ইউনিট সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানের জনমত যাচাইয়ের পূর্ব ঘোষিত সিদ্ধান্তের আলোকে পদক্ষেপ নেয়ার আহবান জানানো হয়। ৯ ফেব্রুয়ারী সংখ্যার দৈনিক 'সংবাদ' জানায় ঃ সমাপ্তি অধিবেশনে 'দেশের স্বার্থানুকূলে' সর্বমোট চল্লিশটি প্রস্তাব গৃহিত হয়েছিলো।[১১৮]

৪

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রতিষ্ঠা

কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানীর বক্তৃতা, বিশেষ করে পূর্ব বাংলাকে শোষণের বিরুদ্ধে তার বলীষ্ঠ প্রতিবাদ, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী এবং 'আসসালামু আলাইকুম' জানানোর সম্ভাবনা সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী পাকিস্তানের তৎকালীন রাজনীতিতে এক অভূত-পূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় মওলানা ভাসানীর বিরোধিতার নামে পূর্ব বাংলার স্বার্থ বিরোধী চক্রগুলি আরো একবার ঐক্যবদ্ধভাবে সোচ্চার হয়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় সরকারে আওয়ামী লীগের সাথে যৌথভাবে ক্ষমতাসীন রিপাবলিকান পার্টির সুপারভাইজারী কাউ-ন্সিলের সদস্য মওলানা জহির কাসমী ১৯৫৭ সনের ৯ ফেব্রুয়ারী করাচীতে এক বিবৃতিতে বলেনঃ 'পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকি-স্তানকে শোষণের অভিযোগ জানাতে গিয়ে মওলানা ভাসানী বিচ্ছিন্নতার যে ইংগিত দিয়েছেন তা পাকিস্তানের সংহতির পরিষ্কার বিরুদ্ধাচরণ এবং দন্ডবিধির ১২৩-ক ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।.... মওলানা ভাসানীর বক্তৃতার ফলে কাশ্মির প্রশ্নে পাকিস্তানের স্বার্থ ক্ষতি-গ্রস্থ হয়েছে, তার বক্তৃতা আকাশবাণীও প্রচার করেছে। এদিকটির প্রতি দৃষ্টি প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের চূড়ান্ত সময় এসে গেছে।' গান্ধী এবং সুভাষ বোসের নামে তোরণ নির্মাণের কঠোর সমালোচনা করে মওলানা কাসমী অবিলম্বে এই 'ধ্বংসাত্মক প্রবণতার' বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের 'কর্তব্য' পালনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহবান জানান। মওলানা কাসমী বলেনঃ 'মওলানা ভাসানী এবং তার গোত্রের লোকদের চাইতে পাকিস্তান অনেক বড়।'[১১৯]

লাহোরে রিপাবলিকান পার্টির সম্পাদক সৈয়দ আবুল হোসেন ১১ ফেব্রুয়ারী এক বিবৃতিতে মওলানা ভাসানীর বক্তৃতার কঠোর সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রীর অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। 'আন্তর্জাতিক সমঝোতা ও জোটবদ্ধতার যুগে আমরা বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতির অংশিদার হতে পারিনা' বলে তিনি ঘোষণা করেন।[১২০]

পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সদস্য লাহোরের পীর সালাহ উদ্দিন এবং করাচী আওয়ামী লীগের সদস্য মঞ্জুরুল হক ও আমজাদ মুখতার মীর্জা তাদের বিবৃতিতে পররাষ্ট্রনীতি সহ সকল বিষয়ে সোহরাওয়ার্দীর প্রতি 'পূর্ণ সমথন ও সহযোগিতার' ঘোষণা দেন।[১২১] উল্লেখ্য যে এরা সহ কাগমারী সম্মেলনে যোগদানকারী পশ্চিম পাকিস্তন আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের একটি অংশ মওলানা ভাসানীর সাথে বিদায়ী সাক্ষাৎ করেননি।[১২২]

নিজাম-ই-ইসলাম পার্টির সভাপতি মওলানা আতাহার আলী এম. পি. তার বিবৃতিতে বলেন ঃ "জনাব ভাসানী পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মধ্যে বিদ্বেষ ও তিক্ততার প্রচারণা চালাইয়া ও পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান এছলামী জমহুরিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার ভয় দেখাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, লেনিন গেট, গান্ধী গেট ও সুভাষ গেট প্রভৃতি নামে তোরণ নির্মাণ করিয়া পাকিস্তানকে কি ধাঁচে গড়িয়া তুলিতে চান তাহারও প্রমাণ দিয়াছেন। পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতিতে আঘাত করিয়া এইরূপ উক্তি যে কোন ব্যক্তি বা মহল হইতে চালান হউক না কেন, তাহা প্রতিরোধ করার যথোচিত ব্যবস্থা করার জন্য আমি পাকিস্তান সরকারকে অনুরোধ জানাইতেছি।" বিবৃতির শেষাংশে মওলানা আতাহার আলী বলেন ঃ "পাকিস্তান এছলামী জমহুরীয়াকে 'আচ্ছালামু আলায়কুম' না বলিয়া প্রয়োজন হইলে জনাব ভাসানী সাহেবকে 'আচ্ছালামু আলায়কুম' জানাইবার জন্য দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানাইতেছি।"[১২৩]

১. দৈনিক 'আজাদ'-এর সম্পাদকীয় আক্রমণ

মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ সমর্থক দৈনিক 'আজাদ' এগিয়ে আসে তার 'শাণিত ভাষা' আর 'ক্ষুরধার লেখনী' নিয়ে। ১৯৫৭

সনের ১২ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত পর পর পাঁচদিন এর সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিলো 'কাগমারী সম্মেলন'। ১২ ফেব্রুয়ারী সংখ্যা দৈনিক 'আজাদ' এর সম্পাদকীয়তে পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে বলা হয়ঃ "............ এই ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য শুধু এইটুকু যে, মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে যারা পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি বদলাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তারা পাকিস্তানকে কোথায় লইয়া যাইতে চান? পররাষ্ট্রনীতিতে নিরপেক্ষতা মানে বন্ধুহীনতা, শুধু তা-ই নয়, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর ভাষায় 'ব্ল্যাকমেলিং'। এই বাদুড়নীতি আজ ভারতকে বন্ধুহীন করিয়াছে, কাশ্মির প্রশ্নে আজ একজনও তার সমর্থক নাই। এসব দেখিবার পরও তারা পাকিস্তানকে ভারতের অনুসরণ করিতে বলিতেছেন কোন সদুদ্দেশ্যে? কাশ্মির সমস্যার সমাধান যতদিন না হইতেছে, ততদিন প্রতিবেশী হইলেও ভারতকে পাকিস্তান বন্ধু রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃতি দিতে পারে না। কাজেই এই সময়ে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ভারতের বাদুড়নীতির অনুসরণ করিতে যারা বলেন, পাকিস্তানের মঙ্গল তাদের কতটুকু কাম্য?........."

মওলানা ভাসানীর 'আসসালামু আলাইকুম' সম্পর্কে সম্পাদকীয়তে বলা হয়"........পাকিস্তান সম্পর্কে কোনো পাকিস্তানীর মুখে পাকিস্তান বিচ্ছেদের মারাত্মক কথা যে এমন হাল্কাভাবে উচ্চারিত হইতে পারে, ইহা কে কবে ভাবিতে পারিয়াছিলেন?........পশ্চিম পাকিস্তান বিদ্বেষে এমন কথা কোনো পাকিস্তানী উচ্চারণ করিলে তাতে তার পূর্ব পাকিস্তান-প্রীতি হয়ত প্রকাশ পাইতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের প্রতি ইহা রাষ্ট্রদ্রোহকর উক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাছাড়া মওলানা ভাসানীর দলই যখন বর্তমানে রাষ্ট্রতরণীর কর্ণধার, তখন এমন উক্তির মাত্র একটি অর্থই হইতে পারে এবং তা হইতেছে, যিনি এমন উক্তি করেন, পাকিস্তান হিসাবে এই রাষ্ট্রের টিকিয়া থাকা তার কাম্য নয়।"

১৪ ফেব্রুয়ারী 'কাগমারী সম্মেলন (৩)' সম্পাদকীয়তে 'আজাদ' লেখে: "........এর আগেও তিনি কয়েকবার পশ্চিম পাকিস্তান ও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এমনই ধরণে তর্জন-গর্জন করিয়াছিলেন। তিনি একবার বলিয়াছিলেন যে, যে বাংলা আশোকের দম্ভের নিকট পরাজয় স্বীকার

করে নাই, মোগলের নিকট নতি স্বীকার করে নাই.........ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে তার কথায় এ ধরণের ইংগিত বারবারই ফুটিয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তান, কেন্দ্র এবং পাকিস্তানের সংহতি বিরোধী একটা প্রবণতা তার মনের মধ্যে লালিত হইয়া আসিতেছে এবং দিন দিন তা বাড়িতেছে। ভাংগা পা যে গর্তে পড়ে, তা কেবল গর্তেরই দোষ নয়, পা'টাও বাঁকা ভংগিতে গর্তের দিকে নামিয়া যায়। মওলানা ভাসানীর অবস্থাও যেন তাই।.........”

'কাগমারী সম্মেলন (৫)' শিরোনামে ১৬ ফেব্রুয়ারী দৈনিক 'আজাদ' লেখে ঃ “ঘরোয়া ব্যাপারেও দেখি, মওলানা ভাসানী একটি সাংঘাতিক ক্ষতিকর উক্তি করিয়াছেন। তার 'আচ্ছালামু আলায়কুম' বিবৃতির কথাই বলিতেছি। এই দায়িত্বহীন ও বলগাহীন উক্তি অমার্জনীয়। এক-দল ভাসানী সমর্থক 'জনতা', 'জনস্বার্থ', 'আঞ্চলিক অধিকারের সংগ্রা-মে'র ধূম্রাবরণ সৃষ্টি করিয়া মওলানা ভাসানীকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করার প্রাণপন চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এ চেষ্টা সফল হইবে না।......... জনতা, জনস্বার্থ ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অনুষ্ঠিত অবিচার ও অনা-চারের সবল প্রতিবাদ মওলানা ভাসানী করিয়া থাকেন সত্য এবং এর জন্য তিনি দেশবরেণ্য হইয়াছেন, তাও খাঁটি কথা। কিন্তু তার মুখে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতার ইংগিত বেফাঁস না হইলে বলিতেই হইবে, তা দুর্বুদ্ধিতাপূর্ণ। ইহা দেশবাসী ক্ষমা করি-বেনা। সুতরাং জনতা, জনস্বার্থ ও আঞ্চলিক অধিকারের তর্কজাল ও ভাবাবেগের কুয়াসা সৃষ্টি করিয়া দেশবাসীর অতন্দ্র দৃষ্টি আজ আর বিভ্রান্ত করা যাইবেনা। দোষ স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে এবং ইহাই শোভন হইবে।.........”

'আজাদ' কেবল নয়, তৎকালীন পাকিস্তানের অধিকাংশ সংবাদপত্রই মওলানা ভাসানী বিরোধী বিষোদ্গারে একাত্ম হয়েছিলো, দৈনিক 'ইত্তে-ফাক'ও সেই সাথে তাল মিলিয়েছে। অলি আহাদের মতে 'ইত্তেফাক' সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া 'বেসামাল ও জঘন্য ভাষায় আক্রমণ' পরিচালনা করেছিলেন।[১২৪] মানিক মিয়া নিজেও লিখেছেন ঃ “তৎকালীন 'ইত্তেফাকে' তার (মওলানা ভাসানীর) এই ক্রিয়াকান্ডের তীব্র সমালোচনা করা হয়।”[১২৫]

এখানে উল্লেখ্য যে, 'আসসালামু আলাইকুম' তথা পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলার বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনার কথা কাগমারী সম্মেলনেই মওলানা ভাসানী প্রথম বলেননি, এরও আগে ১৯৫৫ সনের ১৭ জুন শুক্রবার ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভায় তিনি একই ভাষায় সতর্কবাণীটি উচ্চারণ করেছিলেন। তার বক্তব্যটি 'সে সময় পশ্চিম পাকিস্তান ও কেন্দ্রীয় রাজধানী করাচীতে এক মহা আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল।'[১২৬] এরপর ১৯৫৬ সনের ৭ ও ১৫ জানুয়ারী দুটি জনসভায় একুশ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্রের দাবী জানাতে গিয়েও মওলানা ভাসানী বলেছিলেন ঃ নাহলে পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্নতার কথা চিন্তা করতে হবে। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা সে সময় মওলানা ভাসানীকে 'বিদেশের প্রতি অনুগত রাষ্ট্রদ্রোহী' আখ্যায়িত করে শাস্তিবিধানের হুমকি দেন। সোহরাওয়ার্দী সেবার কথাটিকে 'ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কে' মওলানা ভাসানীর 'বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাভাবনা' হিসেবে ব্যাখ্যা করে প্রেসিডেন্টকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন ঃ পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক নেতাও অতীতে বিচ্ছিন্নতার কথা বলেছেন।[১২৭]

২. সোহরাওয়ার্দী এবং তার অনুসারীদের কার্যক্রম

সেদিনের 'বিপদে' রক্ষা করলেও এবার পরিপ্রেক্ষিত পাল্টে গিয়েছিলো ঃ কাগমারী সম্মেলনে পরিষ্কার পরাজয়ের গ্লানি, বৃটেন ও আমেরিকা সহ জোটের বন্ধুদের সন্তুষ্টি বিধানের তাড়া এবং ক্ষমতার চাবিকাঠির প্রকৃত নিয়ন্ত্রকদের খুশী করে প্রধানমন্ত্রীত্ব রক্ষার তাগিদ সোহরাওয়ার্দীকে এত বেশী ক্ষিপ্ত করেছিলো যে চারদিক থেকে ভয়ংকারভাবে আক্রান্ত মওলানা ভাসানীকে 'ঘায়েল' করে 'যথোচিত শিক্ষা দেয়ার' জন্যে তিনি উঠে পড়ে লেগে যান। 'গণতন্ত্রের মানসপুত্র' সোহরাওয়ার্দীর অনুসারীরা 'লীডারের' নির্দেশিত পথে প্রগতিশীলদের ওপর চড়াও হতে শুরু করেন এবং সে অভিযানের প্রথম শিকার হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। ১৩ ফেব্রুয়ারী মওলানা ভাসানীর সমর্থকদের ওপর 'সফল হামলা' পরিচালনার পর সোহরাওয়ার্দী নির্মিত 'ঘাঁটি' সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি শামসুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে 'গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার অংগীকার' ঘোষণা করা হয়। সভায় ধ্বনিত

স্লোগান সমূহের মধ্যে ছিলো 'মওলানা ভাসানী মুর্দাবাদ' এবং 'ভারতীয় দালাল মুর্দাবাদ।'[১২৮] অন্যদিকে ফজলুল হক হল ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে মওলানা ভাসানীর সমর্থকরা যুদ্ধবাজ পররাষ্ট্রনীতির এবং ব্যক্তিস্বার্থ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সূচিত গুন্ডামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।[১২৯] মওলানা ভাসানী এক বিবৃতিতে তার বক্তব্যের বিকৃতি ও স্বার্থান্বেষী মহলের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান।[১৩০]

৩. জাতীয় পরিষদে পররাষ্ট্রনীতির প্রসঙ্গ : মুসলিম লীগের প্রশংসায় সোহরাওয়ার্দী : 'যাদের দেখার মতো চোখ আছে………'

কাগমারী সম্মেলনের ফলাফলকে নিজের পক্ষে টানার প্রচেষ্টায় প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী কোনো ত্রুটি করেননি। কাশ্মির ভারতের অংগ রাজ্যে পরিণত হওয়ার পর থেকে বিরাজমান ভারত-বিরোধী পরিস্থিতিতে মওলানা ভাসানীর 'আসসালামু আলাইকুম' এবং তার প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব বাংলার স্বার্থবিরোধী চক্রগুলির অভূতপূর্ব ঐক্যের পরিপূর্ণ সুযোগ তিনি গ্রহণ করেছিলেন। 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' মওলানা ভাসানীর জোট-নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির দাবীকে সে সময় ভারতমুখিতা হিসেবে ব্যাখ্যা করার সহজ সুযোগ ছাড়ার মতো বুদ্ধিহীন তিনি ছিলেন না। পরিস্থিতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে চমৎকার অনুকূল পরিবেশে সোহরওয়ার্দী পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে পররাষ্ট্রনীতির প্রসংগটি উপস্থাপিত করে-করেছিলেন। ১৯৫৭ সনের ২২ ফেব্রুয়ারী 'অপ্রত্যাশিত রকম দৃঢ়তার সাথে' সামরিক চুক্তি ও জোট সহ সে পর্যন্ত অনুসৃত নীতির সাফল্য বর্ণনা করতে গিয়ে এই 'কৃতিত্বের, জন্য তিনি সাবেক মুসলিম লীগ সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। তার মতে মুসলিম লীগ সরকারের ব্যর্থতা বা দুর্বলতা নিহিত ছিলো কেবল একটি ক্ষেত্রে : 'জনগণের মুখোমুখী হওয়ার সৎসাহস তাদের ছিলোনা।' থাকলে 'আজ আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে এই বক্তৃতা করতেন তারা' বলেছিলেন সৎসাহসী সোহরাওয়ার্দী। 'কোনো দেশেই পররাষ্ট্রনীতির মতো চুক্তি ও কূটনৈতিক সম্পর্কের কারণে গোপনীয় বিষয় জনগণকে অবহিত করা হয় না।' তাই জাতীয় পরিষদে বিষয়টির উপস্থাপনা ছিলো সোহরা-

ওয়ার্দীর ভাষায় 'প্রতিষ্ঠিত রীতির বাইরে এক ব্যতিক্রমী ঘটনা', আর তা তিনি করেছেন, কারণ জনগণকে তিনি 'আস্থার মধ্যে' নিয়েছিলেন। [উল্লেখ্য যে, জাতীয় পরিষদে ইউসুফ হারুণের প্রশ্নের জবাবে বিদেশ সফররত পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পক্ষে তথ্য ও বেতার মন্ত্রী সরদার আমীর আজম খান ১২ ফেব্রুয়ারী বলেছিলেন যে পররাষ্ট্রনীতির প্রসংগটি আলোচনার জন্য পরিষদে আনা হবে না এবং এ ব্যাপারে শাসনতন্ত্রেও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু মওলানা ভাসানী সহ নেতৃবৃন্দের প্রতিবাদের ফলে সেটা উত্থাপন করা হয়।[১৩১]]

১৯৫৭ সনের ২২ ফেব্রুয়ারী জাতীয় পরিষদে প্রদত্ত দীর্ঘ ভাষণে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী সামরিক চুক্তি ও জোটগুলিকে 'আত্মরক্ষামূলক' আখ্যা দিয়ে বলেন: 'পাকিস্তানের একার পক্ষে নিজেকে রক্ষা করার মতো শক্তিশালী হওয়া কোনো দিনই সম্ভব হবে না' এবং তাই অন্যের সহযোগিতা তথা জোটভুক্ত থাকা 'অস্তিত্বের স্বার্থেই প্রয়োজন'। উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি ৬৫টি 'ক্যানবেরা জেট' বিমান ক্রয়ের জন্য ভারতের অর্ডারের প্রসংগে বলেন: পাকিস্তানের পক্ষে একটিও তেমন বিমান কেনা সম্ভব নয়। তিনি 'সিয়্যাটো'কেউ 'আত্মরক্ষামূলক' জোট হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। সোহরাওয়ার্দী তার ভাষণে কাশ্মির দখলকারী ভারতকে 'উস্কানীদাতা সার্বক্ষণিক শত্রু' আখ্যা দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আফগানিস্তানকে 'অবন্ধুসুলভ প্রতিবেশী' হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি ক্ষমতায় থাকাকালে 'বিচ্ছিন্নতা ও নিরপেক্ষতার নীতি' গ্রহণের মাধ্যমে দেশের 'স্বাধীনতা ও সংহতি বিপন্ন করার মতো ঝুঁকি' নিতে পারবেন না বলে সোহরাওয়ার্দী পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেন। তার মতে পাকিস্তানকে 'গিলে খাওয়ার জন্যে হা করে থাকা শক্তির উপস্থিতিতে' জোটনিরপেক্ষ থাকলে অত্যন্ত ভয়াবহ পরিণাম অনিবার্য হয়ে উঠবে। অনুসৃত নীতির সাফল্য বর্ণনা প্রসংগে তিনি সুয়েজ সংকটকালে বাগদাদ চুক্তির 'ফলদায়ক অবদানের' কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর এই ভাষণের সময় জাতীয় পরিষদের পর্যবেক্ষকদের সারিতে উপবিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন আমেরিকা ও ইরাক সহ কয়েকটি 'বন্ধু দেশের' রাষ্ট্রদূত। এ দিকটির প্রতি ইংগিত দিয়ে এক পর্যায়ে সোহরাওয়ার্দী বলেন: 'যাদের দেখার মতো চোখ আছে তারা চুক্তিগুলির ফলপ্রসূ সাফল্য দেখতে পারেন।'[১৩২]

সোহরাওয়ার্দীর 'সময়োপযোগী, বাস্তবসম্মত, যুক্তিপূর্ণ এবং প্রাণস্পর্শী' ভাষণের পর ১৯৫৭ সনের ২৫ ফেব্রুয়ারী পররাষ্ট্রনীতির ওপর জাতীয় পরিষদে ভোট গ্রহণ করা হয়ঃ মুসলিম লীগ সহ বিরোধী দলগুলি ভোটদানে বিরত থাকে, পক্ষে চল্লিশটি এবং বিপক্ষে দুটি ভোট পড়ে [মিয়া ইফতিখার উদ্দিন ও মিয়া অবদুল বারী]।[১৩৩] সোহরাওয়ার্দীর বিজয় এত সুনিশ্চিত ছিলো যে ভোট গ্রহণের আগেই আতাউর রহমান খান এবং শেখ মুজিবুর রহমান করাচী থেকে ফিরে এসেছিলেন। মন্ত্রীসভার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশ নেয়াই তাদের উদ্দেশ্য ছিলো, ভোটপর্ব এড়ানো নয়, কেননা, তারা 'লীডারের নীতির পূর্ণ সমর্থক' ছিলেন।[১৩৪] আওয়ামী লীগের ১৩ জন সদস্যের মধ্যে একমাত্র সিলেটের নূরুর রহমান মওলানা ভাসানীর সমর্থক ছিলেন, ওদিকে জাতীয় পরিষদে বক্তব্য রাখার সুযোগ না দেয়ায় গণতন্ত্রী দলের নেতা ও প্রদেশিক রাজস্বমন্ত্রী মাহমুদ আলীও ঢাকা ফিরে এসেছিলেন।

বিরাট এই 'সাফল্য' লাভের পর সোহরাওয়ার্দী আওয়ামী লীগকে ঝামেলা মুক্ত করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ও পশ্চিম পাকিস্তান শাখা দুটিকে বাতিল ঘোষণা করেন। ইতিপূর্বে পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে সংগঠনের সিদ্ধান্ত বিরোধী কার্যক্রমের জন্য পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সদস্যরা কেন্দ্রীয় আহবায়ক হিসেবে সোহরাওয়ার্দীকে অস্বীকার করে মওলানা ভাসানীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন। ভবিষ্যত সাংগঠনিক পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার জন্য মাহমুদুল হক ওসমানী, সি. আর. আসলাম, আরবাব আবদুল গাফফার, কাজী ফয়েজ মোহাম্মদ এবং এম. কে. ঝাঞ্জুয়া সহ কতিপয় নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছিলো।

৪. স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে আতাউর রহমানদের গড়িমসি ঃ মওলানা ভাসানীর পদত্যাগ

পশ্চিম পাকিস্তানের মতো অতি সহজে সোহরাওয়ার্দী পূর্ব বাংলায় 'বিজয়' লাভ করতে পারেননি। স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে তার 'শতকরা ৯৮ ভাগ স্বীকৃত হয়েছে' অভিমতের সাথে তখনও প্রাদেশিক নেতাদের অধিকাংশ, এমনকি প্রিয় মন্ত্রীরাও প্রকাশ্যে একমত ছিলেন না। সদ্য সমাপ্ত

কাউন্সিল অধিবেশনের সিদ্ধান্ত এবং মওলানা ভাসানীর ক্রমাগত চাপের ফলে ১৯৫৭ সনের ২ মার্চ আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায় দলের এম. এল. এ. দের প্রতি অবিলম্বে প্রাদেশিক পরিষদে স্বায়ত্তশাসনের ওপর সরকারীভাবে প্রস্তাব উত্থাপনের নির্দেশ দেয়া হয়। ৫ মার্চ মওলানা ভাসানী বলেন : স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে পূর্ব বাংলার সর্বস্তরের মানুষ এখন এমন ঐক্যবদ্ধ যে এর বিরোধিতা করে কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষেই প্রদেশের মাটিতে টিকে থাকা সম্ভব হবেনা,সে দল ছোট বা বড়, নতুন বা পুরাতন—যা-ই হোক না কেন।[১৩৫]

প্রস্তাব উত্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে সোহরাওয়ার্দী অনুসারীরা নানাভাবে একে বিলম্বিত করতে শুরু করেন। ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত ও একুশ দফা বাস্তবায়নে গাফলতি এবং খাদ্য সংকট সমাধানে ব্যর্থতার প্রতিবাদে ১৯৫৭ সনের ১৮ মার্চ মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের সভাপতির পদটি ত্যাগ করেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদককে লিখিত পদত্যাগ পত্রটি বাহক অলি আহাদ শেখ মুজিবকে না দেখিয়ে সরাসরি দৈনিক 'সংবাদ' সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরীর হাতে দেন এবং সেটা 'সংবাদ' প্রকাশ করে। [অলি আহাদ তার গ্রন্থে (পৃঃ-২৭৩-৭৮) দাবী করেছেন যে মওলানা ভাসানীর 'নির্দেশেই' তিনি দায়িত্বটি পালন করেছিলেন। এ প্রশ্নে আর কারো সমর্থনের তথ্য পাওয়া যায় না। 'নির্দেশ' মান্য করলেও অলি আহাদ অন্যায় করেছিলেন এবং তারই ভিত্তিতে আওয়ামী লীগেরও উচিত হয়নি পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া।][১৩৬]

পদত্যাগ করলেও মওলানা ভাসানী স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে এগিয়ে নিতে থাকেন। ১৯৫৭ সনের ২৬ মার্চ তিনি 'আওয়ামী লীগ কর্মী ও দেশবাসীর প্রতি' আবেদনে বলেন : 'উভয় পাকিস্তানের সংহতি ও মিলন নির্ভর করে একমাত্র আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দানের উপর।·········আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ব্যতীত সাড়ে চার কোটি বাংগালীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সমাজ জীবনের মুক্তি অসম্ভব।' ক্ষমতার মোহে যারা ১৯৫৬ সনে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার মানুষকে 'ক্রীতদাস' বানিয়েছে তাদের সম্পর্কে প্রচারপত্রে মওলানা ভাসানী বলেন :'...তাহারাই

পুনরায় সাম্রাজ্যবাদ ও কোটিপতি শোষকদের সহিত হাত মিলাইয়া বর্তমানে আমার ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে বিবৃতি, পোস্টার, বিজ্ঞাপন ছড়াইয়া সারা দেশময় মিথ্যা প্রচার শুরু করিয়াছে। এই সব কুচক্রীদের দেশবাসী ভাল করিয়াই চিনে।' পূর্ব বাংলা তথা পাকিস্তানের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করার জন্য এদের দায়ী করে পরিশেষে মওলানা ভাসানী বলেন ঃ '... ..কিন্তু রাখে আল্লা মারে কে ? মিথ্যা প্রচারে কর্ণপাত না করিয়া ২১ দফা দাবী আদায়ের জন্য সারা দেশময় আন্দোলন করুন।'[১৩৭]

এদিকে মওলানা ভাসানীর পদত্যাগপত্র দৈনিক 'সংবাদ' সম্পাদকের হাতে দেয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে সোহরাওয়ার্দী অনুসারীরা সক্রিয় হয়ে ওঠেন ঃ পুরাতন আক্রোশ মেটানোর নবতর সুযোগে এবারও শক্তহাতে হাল ধরেন শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৫৭ সনের ৩০ মার্চ আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সাংগঠনিক সম্পাদক অলি আহাদের বিরুদ্ধে সংগঠনের শৃংখলা ভংগের অভিযোগটি উত্থাপন করেন মুজিব নিজেই। রাতে দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আবুল মনসুর আহমদ অলি আহাদকে সাংগঠনিক সম্পাদকের পদ থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার কথা ঘোষণা করেন। উপস্থিত ৩০ জনের (সর্বমোট ৩৭জন) মধ্যে ১৪ জন পক্ষে ভোট দেন, বিপক্ষে ভোটদানকারী ৯ জন সিদ্ধান্তটির প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন ঃ এরা ছিলেন আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ ইয়ার মোহাম্মদ খান, প্রচার সম্পাদক আবদুল হাই, শ্রম সম্পাদক আবদুস সামাদ, মহিলা সম্পাদিকা সেলিনা বানু, রংপুর জেলা শাখার সভাপতি দবিরউদ্দিন আহমদ, সিলেটের হাবিবুর রহমান, টাংগাইলের হাতেম আলী খান, বগুড়া জেলা শাখার সভাপতি আকবর হোসেন আখন্দ এবং অধ্যাপক আসহাব উদ্দিন আহমদ। উল্লেখ্য যে, এরা সবাই প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য, তথা এম. এল. এ. ছিলেন।[১৩৮]

৫. প্রাদেশিক পরিষদে স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব ঃ সোহরাওয়ার্দীর উপহাস ঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হুমকি

এমনিভাবে সংগঠনের আভ্যন্তরে ভাসানী সমর্থকদের অবদমনের পাশাপাশি আতাউর-মুজিবরা মওলানা ভাসানীকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের

জন্যও অনুরোধ অব্যাহত রাখেন। কিন্তু মওলানা ভাসানীর অস্বীকৃতি এবং স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে ক্রমাগত চাপের ফলে তারা প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন আহবান করতে বাধ্য হন। অবশ্য সরকারীভাবে প্রস্তাব আনার ব্যাপারে গড়িমসি আগের মতোই চলতে থাকে। ১৯৫৭ সনের ৩ এপ্রিল প্রাদেশিক পরিষদে বেসরকারীভাবে স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন আওয়ামী লীগের মহিউদ্দিন আহমদ।[১৩৯] তার পক্ষে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মোজাফফর আহমদ এবং আসহাব উদ্দিন আহমদ। সবাইকে অবাক করে অত্যন্ত জোরালোভাবে এগিয়ে আসেন শেখ মুজিবুর রহমানও। বিরোধিতা তেমন কেউ করেননি, খন্দকার মোশতাক আহমদের প্রশ্ন ছিলো : 'আপনারা একেবারে স্বাধীন হতে চান?' বিরোধী দলের নেতা আবু হোসেন সরকারও প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। দীর্ঘ আলোচনার পর বিনা বিরোধিতায় এই মর্মে প্রস্তাব গৃহিত হয় যে, মুদ্রা, পররাষ্ট্রনীতি ও দেশরক্ষা বিভাগ কেন্দ্রের হাতে রেখে বাকী সকল বিষয় পূর্ব বাংলার হাতে প্রদান করতে হবে। প্রস্তাবটি কেন্দ্রকে জানানোর এবং স্বায়ত্তশাসন আদায়ের জন্য প্রাদেশিক সরকারকেও অনুরোধ করা হয়।[১৪০] উল্লেখ্য যে, মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান বিতর্ক চলাকালে তার দফতরে 'বিশ্রাম' করেছিলেন।[১৪১]

পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদে সর্বসম্মতভাবে গৃহিত স্বায়ত্তশাসনের এই প্রস্তাবটিকেও সোহরাওয়ার্দী 'বিবেচনার অযোগ্য' ঘোষণা করেন, কেননা, তার ভাষায় এটা ছিলো এক 'রাজনৈতিক চমক'। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মীর গোলাম আলী তালপুরও এক বিবৃতিতে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী যে কোনো প্রচেষ্টাকে কঠোর হস্তে দমনের' হুমকি দিয়েছিলেন।[১৪২] উল্লেখ্য যে, আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির ২ মার্চের সভায় স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে পরিষদ সদস্যদের প্রস্তাব উত্থাপনের নির্দেশ দানের পর থেকেই প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী নতুন করে এর বিরোধিতা শুরু করেছিলেন। আতাউর রহমান খানদের গড়িমসির প্রেক্ষিতে পদত্যাগপত্র পেশের পর বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে মওলানা ভাসানী তার চাপ অব্যাহত রাখলে সোহরাওয়ার্দী তার অনুসারীদের নিরস্ত্র করার উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলা সফরে আসেন, সে সময়ে ২৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমাবেশে ভাষণদানকালে সোহারাওয়ার্দী বলেছিলেন : 'পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে প্রাদেশিকতার মনোভাব উস্কে দিয়ে কিছু ব্যক্তি নায়ক হতে চাচ্ছেন এবং তার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানীদের

মনে এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, পূর্ব পাকিস্তানীরা তাদের সংগে একত্রে থাকতে চান না।'[১৪৩]

স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত প্রাদেশিক পরিষদে গৃহিত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর বক্তব্য এবং তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হুমকির বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানী তীব্র প্রতিবাদ জনিয়েছিলেন। ৫ এপ্রিল অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ ওয়াকিং কমিটির সভায় তিনি 'প্রধানমন্ত্রীর সাথে ফলপ্রসূ আলোচনা না হওয়া পর্যন্ত' পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করেন। সেদিনই এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি তার দাবীর পুনরুল্লেখ করেন।

অন্যদিকে সোহরাওয়ার্দীর সমর্থনে এগিয়ে আসেন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান। ৬ এপ্রিল এক বিবৃতিতে তিনি জানান ঃ প্রধানমন্ত্রী তাদের কাছে জানতে চেয়েছেন যে পূর্ব বাংলার নেতারা 'পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন বলতে ঠিক কী বোঝাতে চান।' সোহরাওয়ার্দী অবশ্য প্রাদেশিক পরিষদে প্রস্তাব গৃহিত হওয়ার পর আতাউর ও মুজিবদের সাথে এ বিষয়ে আর কোনো আলোচনা করেননি, 'পূর্ব পাকিস্তানের নেতারা বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছেন'-এই অভিযোগে অতঃপর প্রসংগটি তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় পেশ করেছিলেন। সেখানে তাকে 'স্বায়ত্তশাসনের পরিমাণ নির্দ্ধারণের জন্য' কমিটি গঠনের ক্ষমতা দেয় হয়, অবশ্য তেমন কোনো কমিটি কখনো গঠিত হয়েছিলো বলে জানা যায় না।[১৪৪]

৬. খাদ্য আন্দোলন এবং ভাসানীর সপ্তাহব্যাপী অনশন

মওলানা ভাসানী এরপর স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে গ্রাম পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৫৭ সনের ১৮ ও ১৯ মে বগুড়ায় কৃষক সম্মেলন অহবান করেন এবং পূর্ব বাংলায় বিরাজমান খাদ্য সংকট সমাধানের দাবীতে প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে তোলেন। প্রধানতঃ তার দাবীর প্রেক্ষিতেই প্রাদেশিক সরকার আটটি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন খাদ্য কাউন্সিল গঠন করতে বাধ্য হন।[১৪৫] দলগুলি ছিলো আওয়ামী লীগ, কৃষক-শ্রমীক পার্টি, গণতন্ত্রী দল, নিজাম-ই-ইসলাম. মুসলিম লীগ, ন্যাশনাল কংগ্রেস, তফশীলি ফেডারেশন এবং ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ পার্টি। এসময়টিতেই মওলানা ভাসানী শ্রেণী ভিত্তিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু করেন, যার ফলশ্রুতিতে ১৯৫৭ সনের ডিসেম্বরে গঠিত হয় কৃষক সমিতি।

খাদ্য সংকট, স্বায়ত্তশাসন এবং পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে নিজের দাবীকে বলীষ্ঠতাদানের উদ্দেশ্যে ১৯৫৭ সনের ১ জুন থেকে মওলানা ভাসানী সপ্তাহব্যাপী অনশন অরম্ভ করেন (৬ জুন পর্যন্ত)। অনাহার-ক্লিষ্ট মানুষের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপনের পাশাপাশি তার সে অনশনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো বাগদাদ চুক্তিভুক্ত দেশসমূহের আসন্ন বৈঠকের বিরোধিতা করা। তার অনশন চলাকালেই ৩ জুন অনুষ্ঠিত সভায় আওয়ামী লীগ ওর্য়াকিং কমিটি অলি আহাদকে তিন বৎসরের জন্য বহিষ্কার করে, পদত্যাগী নয়জন সদস্যের স্থলে চারজন সম্পাদক সহ নতুন সদস্যও নিয়োগ করা হয় (তাদের পদত্যাগ গৃহিত হয়েছিলো ২১ মে-র সভায়)। উল্লেখ্য যে, বিরূপ সমালোচনার মুখে দীর্ঘদিন অনমনীয় থাকার পর সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ ও পুনর্গঠন করার প্রয়োজনে শেখ মুজিবুর রহমান ৩১ মে তার মন্ত্রীর পদটি ত্যাগ করেছিলেন।

৭. সোহরাওয়ার্দীপন্থী 'কাউন্সিল অধিবেশন' ঃ পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন ঃ স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে উপেক্ষা

স্বায়ত্তশাসন ও পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে আপোষহীন এবং পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারে অস্বীকৃত মওলানা ভাসানীকে শেষবারের মতো 'শিক্ষাদানের' জন্য কাগমারী সম্মেলনের পর থেকে বিভিন্নভাবে যে আয়োজন চলছিলো, তাকে চূড়ান্ত রূপদানের প্রয়োজনীয়তা ততোদিনে সোহরাওয়ার্দী-অনুসারীদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছিলো। অলি আহাদকে বহিষ্কার উপলক্ষে নয়জন নেতার পদত্যাগ এ প্রেক্ষিতে আর্শীবাদ হয়ে আসে এবং সংগঠনকে মওলানা ভাসানীর প্রভাবমুক্ত করার সুবর্ণ সুযোগ এসে যায়। গোপনে দীর্ঘ প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর অনুষ্ঠিত ৩ জুনের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় মাত্র দশ দিনের বিজ্ঞপ্তিতে ১৩ ও ১৪ জুন কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

নজিরবিহীন সংক্ষিপ্ত সময়ের বিজ্ঞপ্তিতে কাউন্সিল অধিবেশনটি আহবানের পেছনে মুজিবের নেতৃত্বে সোহরাওয়ার্দী অনুসারীদের উদ্দেশ্য এত পরিষ্কার ছিলো যে, মওলানা ভাসানী প্রথমে এতে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। ১৯৫৪ সনে ৯২-ক ধারা প্রবর্তন-পরবর্তী সময়ের মতো নতুন করে 'কমিউনিস্ট এবং রুশ-ভারতের দালালদের' বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করার কথা তখন প্রকাশ্যেই বলা হচ্ছিলো। সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে জানা যায় ঃ বাগদাদ চুক্তিভুক্ত দেশগুলির সদ্য সমাপ্ত

বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী 'ধ্বংসাত্মক তৎপরতার বিরুদ্ধে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য' পাকিস্তানকে পর্যাপ্ত অর্থ সাহায্য দানের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। ঢাকার পত্রপত্রিকায় ১২ জুন প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়ঃ প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী প্রথম থেকেই বলে আসছেন যে একমাত্র পূর্ব পাকিস্তানেই বিদেশী তথা ভারত ও সোভিয়েত অনুচররা সক্রিয় রয়েছে এবং বাগদাদ চুক্তির বৈঠকেও তিনি এই মর্মে তার বক্তব্য জানিয়ে দিয়েছেন।[১৪৬]

এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৭ সনের ১৩ জুন ঢাকার 'পিকচার প্যালেস' (শাবিস্তান) সিনেমা হলে আওয়ামী লীগের 'সুসংগঠিত' কাউন্সিল অধিবেশনটি শুরু হয়েছিলো। ভাসানী-সমর্থক হিসেবে পরিচিত কাউন্সিলারদের অধিকাংশকেই প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি, জালিয়াতির নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এমনকি প্রধানমন্ত্রীর সাথে আগত দেহরক্ষী ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদেরকেও 'হাত তোলার অধিকার' দেয়া হয়েছিলো। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বিছানা থেকে আগত অসুস্থ নেতা মওলানা ভাসানীকে 'ভারতের দালাল মুর্দাবাদ' জাতীয় অশালীন শ্লোগানের মাধ্যমে অপমান করা হয়, তাকে স্বচ্ছন্দে বলতে দেয়া হয়নি এবং ফলে তিনি ভাষণ 'শেষ' করেই ফিরে গিয়েছিলেন হাসপাতালে। এরপর 'উজিরে আজম জিন্দাবাদ' ধ্বনির মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী তার ভাষণ দান করেন, এতে তিনি অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতির সপক্ষে জোরালো বক্তব্য রেখেছিলেন। মোহাম্মদ তোয়াহা, মোজাফফর আহমদ এবং মহিউদ্দিন আহমদ সহ ভাসানী-সমর্থকদের কথা বলার প্রয়াস থামানো হয়েছিলো অত্যন্ত অসভ্যভাবে।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আওয়ামী লীগ গৃহিত, ঘোষিত এবং অনুসৃত স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী সোহরাওয়ার্দীর সাম্রাজ্যবাদমুখী পররাষ্ট্রনীতির অনুমোদন ছিলো কাউন্সিল অধিবেশনের নামে আয়োজিত এই সমাবেশের প্রধান কার্যক্রম। প্রসংগটি উত্থাপন করেছিলেন সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান এবং সাথে সাথে তার সমর্থনে 'ফেটে' পড়েছিলেন 'কাউন্সিলাররা'। বিরোধিতাকারীদের স্তব্ধ করার কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছিলো বিশ্রীভাবে। পরদিন ১৪ জুন 'গুলিস্তান' সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনেও প্রস্তাবটি উত্থাপিত হলে গৃহিত হয়ে যায় 'বিপুল উদ্দীপনার' মধ্য দিয়ে। উপস্থিত কাউন্সিলারদের সংখ্যা আটশ বলা হলেও সমবেতদের সংখ্যা ছিলো প্রায়

দু'হাজার। এদের সবাই সোহরাওয়ার্দীর নীতির 'পক্ষে' ভোট দেন, মুজিবের মতে বিরোধিতাকারীদের সংখ্যা ছিলো ২৫ থেকে ৪৫ জনের মতো।[১৪৭]

আওয়ামী লীগের এই 'কাউন্সিল অধিবেশনে' গৃহিত এক প্রস্তাবে মওলানা ভাসানীকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের অনুরোধ জানানো হয়। অলি আহাদকে বহিষ্কার এবং আওয়ামী লীগ সদস্যদের যুবলীগের সদস্যপদ গ্রহণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেও প্রস্তাব গৃহিত হয়। স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৮ সনের নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন পর্যন্ত 'অপেক্ষা' করার আহবান জানান এবং ফলে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ থেকে কাউন্সিল 'বিরত' থাকে। উল্লেখ্য যে সেদিন, ১৪ জুন অনুষ্ঠিত পল্টন ময়দানের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী আবারও ঘোষণা করেন ঃ 'পূর্ব পাকিস্তানকে শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়েছে।'[১৪৮]

৮. নীতি ও কর্মসূচী পরিবর্তনের প্রতিবাদে ভাসানী

১৬ জুন হাসপাতাল থেকে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে মওলানা ভাসানী 'কাউন্সিল অধিবেশনের' কার্য প্রণালী ও সিদ্ধান্ত সমূহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। তিনি অধিবেশন ত্যাগ করার পর উত্থাপিত ও গৃহিত পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত প্রস্তাব সম্পর্কে 'বুকে হাত দিয়ে চিন্তা করতে, হৃদয়ের গভীরে খুঁজতে এবং নিজেদের বিবেককে প্রশ্ন করার জন্য' কাউন্সিলারদের প্রতি আহবান জানান। সাংবাদিকদের সাথে আলোচনাকালে মওলানা ভাসানী বলেন ঃ সামরিক চুক্তি ও জোট বিরোধী সংগ্রাম ব্যতীত পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন আদায় করা সম্ভব নয়, এরা (মুজিবরা) বুঝতে পারছেননা যে চুক্তি গুলির অধীনে সংগৃহিত অস্ত্রশস্ত্র পূর্ব বাংলার কন্ঠরোধের কাজেই ব্যবহৃত হবে।[১৪৯]

কাউন্সিল অধিবেশন সম্পর্কে মওলানা ভাসানী বলেছেন ঃ "কাউন্সিলের এই অধিবেশনে বহু জাল কাউন্সিলারের উপস্থিতি, মন্ত্রীদের সমালোচনাকারী কাউন্সিলারদের বক্তব্য অধিবেশনে পেশ করিতে না দেওয়া প্রভৃতি মারাত্মক অভিযোগ বহু কাউন্সিলার প্রকাশ্যে করিয়াছেন। আওয়ামী লীগের কোন দায়িত্বশীল নেতা আজ পর্যন্তও ঐ সব অভিযোগের জওয়াব দেন নাই। ইহাতে অভিযোগ গুলির সত্যতা প্রমানিত হয়। আমার শারীরিক অসুস্থতার জন্য আমি মাত্র স্বল্পক্ষণের জন্য এই কাউন্সিল অধিবেশনে উপস্থিত ছিলাম।

"এই কাউন্সিল অধিবেশনে দেশের অতীব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা খাদ্য সংকট সম্পর্কে শুধু মাত্র 'সরকারকে ধন্যবাদ' জানাইয়া যে প্রস্তাব পাশ হইয়াছে, উহা ভুখা জনসাধারণকে নির্মম পরিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। ভূমি সংস্কার, দুর্নীতি, শ্রমিক কর্মচারীদের মজুরী, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রভৃতি জরুরী সমস্যাবলী সম্পর্কে ঐ কাউন্সিল অধিবেশনে কোন আলোচনাই হয় নাই।

"সংগঠনের গঠনতন্ত্র মাফিক অলি আহাদের আপীল কাউন্সিলে পেশ না করিয়াই তাহার উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কাউন্সিল দ্বারা অনুমোদন করানো হইয়াছে। গঠনতন্ত্র লংঘন করিয়া আওয়ামী লীগের কাউন্সিল ও বিভিন্ন কমিটির নির্বাচন স্থগিত রাখা হইয়াছে। একটি ভুল অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তান যুব সমাজের প্রতিষ্ঠান যুবলীগের সদস্যদের পক্ষে আওয়ামী লীগে যোগদান নিষিদ্ধ করিয়াও আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রের বরখেলাপ করা হইয়াছে।

"সর্বোপরি এই কাউন্সিল অধিবেশনে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল বৈদেশিক নীতির অনুমোদন সূচক প্রস্তাব পাশ করাইয়া আওয়ামী লীগকে উহার সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী ঐতিহ্য ও নীতি হইতে বিচ্যুত করা হইয়াছে। আওয়ামী লীগ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের যে পতাকা উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়াছিল, কাউন্সিলের এই অধিবেশন সে পতাকা অবনমিত করিয়াছে।

আওয়ামী লীগের কাউন্সিলের ঢাকা অধিবেশনের কার্যাবলীতে ইহা প্রতিয়মান হয় যে মন্ত্রীত্বে অধিষ্ঠিত আওয়ামী লীগের নেতারা নিজেদের গদির স্বার্থের জন্য আওয়ামী লীগের নীতি ও একুশ দফা কর্মসূচী হইতে আজ যে ভাবে বিচ্যুত হইয়াছেন, ঠিক তেমনিভাবে তাহারা আওয়ামী লীগ সংগঠনকেও নীতি বিচ্যুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের মহান আদর্শ নিয়া যে আওয়ামী লীগের জন্ম হইয়াছিল, যে আওয়ামী লীগের কার্যকলাপ পাকিস্তানের জনগণের হৃদয়ে নুতন আশার সঞ্চার করিয়াছিল, সেই আওয়ামী লীগের ও উহার নেতাদের আদর্শ ও নীতি হইতে এই বিচ্যুতি গভীরভাবে দুঃখজনক। ....আওয়ামী লীগ নেতাদের নিকট আমি অনুরোধ জানাইতেছি যে, এখনো সময় আছে। আদর্শ বিচ্যুতির যে পথে আপনারা চলিয়াছেন তাহা হইতে ফিরিয়া আসুন।"[১৫০]

৯. সোহরাওয়ার্দীর 'প্রতিশোধ' : 'অশ্রুতপূর্ব' প্রস্তাব

কাগমারী সম্মেলনে ব্যর্থতা ও পরাজয়ের যে গ্লানি প্রধানমন্ত্রী সোহ-রাওয়ার্দীকে বিপর্যস্ত করছিলো, এমনি অগণতান্ত্রিক পন্থায় তিনি তার 'প্রতিশোধ' নিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে ব্যক্তি হিসেবে সোহরাওয়ার্দী লাভবান হয়েছিলেন, ওই সাথে আরো দু'চারজনও হয়তো, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলো পূর্ব বাংলা এবং সে ক্ষতি ছিলো অপূরণীয়। সংগঠনের প্রতিষ্ঠা-কাল থেকে অনুসৃত নীতিকে পাল্টে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি সভাপতি হিসেবে মওলানা ভাসানীর 'স্বীকৃতি' এবং পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের জন্য 'সর্বসম্মত অনুরোধ' প্রকৃত প্রস্তাবে তার প্রতি কেবল অনাস্থা প্রকাশের নামান্তরই ছিলোনা, এ ছিলো তাকে নিয়ে নতুনভাবে তামাশা করার, তাকে অবমাননা করার এক অসৎ ফন্দীও। অথচ কাগমারী সম্মেলনে এ ধরণের আচরণ কারো সাথে করা হয়নি। সেখানে আওয়ামী লীগ তার নীতিতে কোনো মৌলিক পরিবর্তন আনেনি, ঘোষিত নীতিকেই কেবল বলীষ্ঠতার সাথে তুলে ধরেছিলো। ফলে একে সোহরাওয়ার্দীর প্রতি রীতিমাফিক অনাস্থা প্রকাশ বলা যায় না, তাকে বরং দলীয় নীতির অনুকূলে সংশোধিত হওয়ার সময় দেয়া হয়েছিলো। এ কারণেই ব্যক্তিগত অভিলাষ চরিতার্থ না হলেও সোহরাওয়ার্দীর লজ্জার কিছু ছিলোনা, বরং সংগঠন তার কর্মসূচীকে সমুন্নত রাখায় তিনি গর্বিত বোধ করতে পারতেন। কিন্তু ঢাকা অধিবেশন মওলানা ভাসানীর ওপর সরাসরি আঘাত হিসেবে এসেছিলো : এর ফলাফলে সমঝোতার সামান্য অবকাশও রাখা হয়নি, আর তাই সভাপতির পদে মওলানা ভাসানীর প্রত্যাবর্তনের অর্থ হতো তার রাজনৈতিক আত্মহত্যা এবং কেবলমাত্র পদটির লোভে সাম্রাজ্যবাদ ও তার বশংবদ ক্ষমতাসীনদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনার সাথে নতিস্বীকার করা। আওয়ামী লীগের এই কাউন্সিল অধি-বেশনের সিদ্ধান্তে বিস্ময় প্রকাশ করে ১৫ জুন লিখিত লন্ডন 'টাইমস'-এর সম্পাদকীয় মন্তব্যটি প্রসংগত উল্লেখযোগ্য : সোহরাওয়ার্দীর নীতির অনুমোদনের পাশাপাশি অনমনীয় মওলানা ভাসানীর প্রতি পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের সর্বসম্মত অনুরোধটি ইয়োরোপীয় রীতিতে অভ্যস্ত পত্রিকা-টির ভাষায় ছিলো 'অশ্রুতপূর্ব।'[১৫১]

ক. সংগ্রামের নতুন পর্যায়ে ভাসানী

মৌলিক নীতিগত প্রশ্নে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে সাধিত আওয়ামী লীগের আমূল পরিবর্তন মওলানা ভাসানীকেও সম্পূর্ণ নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করেছিলো : ১৭ জুন প্রচারিত এক ঘোষণায় তিনি ২৫ ও ২৬ জুলাই ঢাকায় 'নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলন' আহবান করেন। 'কেন এই সম্মেলন' শীর্ষক প্রচার পুস্তিকায় সম্মেলনটি আহবানের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি পাকিস্তানের রাজনীতি ও আওয়ামী লীগের সংগ্রামী ইতিহাস, নীতিগত প্রশ্নে তার সিদ্ধান্ত সমূহ এবং ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে এক দল নেতার বিশ্বাসঘাতকতার প্রসংগ তুলে ধরেন। মুষ্টিমেয় এই নেতাদের বিচ্যুতিকে উপেক্ষা করে সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোটের প্রভাব মুক্ত পাকিস্তানকে গণতান্ত্রিক ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত করার সংগ্রামকে এগিয়ে নেয়ার 'কর্মপন্থা' উদ্ভাবনকেই তিনি সম্মেলন আহবানের উদ্দেশ্য হিসেবে বর্ণনা করেন। পরিশেষে মওলানা ভাসানী বলেন : 'এই সম্মেলনের সফলতার মধ্য দিয়া পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক যুগের সূচনা হইবে এবং আমাদের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রাম নূতন শক্তিতে অগ্রসর হইবে। আমাদের এই সংগ্রাম কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবেনা।'

কাউন্সিলের নামে আওয়ামী লীগের ঢাকা অধিবেশনের কর্মকান্ড এবং মওলানা ভাসানীর আহবান পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক নতুন পরিবর্তনের আবহাওয়া তৈরী করেছিলো। বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় সর্বত্র অতঃপর আওয়ামী লীগে ভাঙন সূচিত হয়, সরকার এবং মওলানা ভাসানীর সমর্থনে পরস্পর বিরোধী দুটি দল দাঁড়িয়ে যায় অচিরেই। ইয়ার মোহাম্মদ খানের নেতৃত্বে ঢাকা নগর আওয়ামী লীগ ২৮ জুনের সভায় ঢাকা অধিবেশনের অগণতান্ত্রিক ও গঠনতন্ত্র বিরোধী কার্যক্রমের তীব্র সমালোচনা করে মওলানা ভাসানী আহূত গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলনে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রদেশের সর্বত্র আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ চলতে থাকে, একই সাথে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানও একের পর এক জনের বিরুদ্ধে 'কারণ দর্শাও' নোটিশ প্রচার করতে থাকেন। ১ জুলাই ঢাকা জেলা বোর্ড হলে শওকত আলী

খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক সমাবেশে গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলনকে সফল করার লক্ষ্যে ইয়ার মোহাম্মদ খানকে সভাপতি এবং মহিউদ্দিন আহমদকে সম্পাদক করে ৪৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি অভ্যর্থনা পরিষদ গঠন করা হয়। ১৩ জুলাই শেখ মুজিব গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলনে যোগ না দেয়ার জন্য দলীয় কর্মীদের প্রতি এক নির্দেশ প্রচার করেন।

পূর্ব বাংলার মতো পশ্চিম পাকিস্তানেও মওলানা ভাসানী ব্যাপক সমর্থন লাভ করেছিলেন। মাহমুদুল হক ওসমানী সহ পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সোহরাওয়ার্দী বিরোধীরা মওলানা ভাসানীর গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। দলগত ভাবে এগিয়ে এসেছিলো পশ্চিম পাকিস্তানে 'ক্ষমতার রদ বদল করার মতো শক্তি সম্পন্ন' বিরোধী দল পাকিস্তান ন্যাশনাল পার্টি। খান আবদুল গাফ্ফার খানের খোদাই খিদমতগার, জি. এম. সৈয়দের আওয়ামী মাহাজ এবং মিয়া ইফ্তিয়ার উদ্দিনের আজাদ পাকিস্তান পার্টি সহ ছয়টি দলের সমন্বয়ে পাকিস্তান ন্যাশনাল পার্টি গঠিত হয়েছিলো ১৯৫৬ সনের ৯ সেপ্টেম্বর। মওলানা ভাসানীর মতো এই দলটিও তার কর্মসূচীতে স্বাধীন ও জোট-নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির ঘোষণা দিয়েছিলো।[১৫২]

১. এক ইউনিট প্রশ্নে সোহরাওয়ার্দীর প্রতিশ্রুতি বিরোধী ভূমিকা

পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের সমর্থনের অন্যতম কারণ ছিলো এক ইউনিট প্রশ্নে মওলানা ভাসানীর পরিষ্কার বক্তব্য ও ভূমিকা। প্রধানতঃ পাঞ্জাবের স্বার্থে পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশ গুলিকে একত্রিত করে ১৯৫৪ সনের ২২ নভেম্বর গভর্নর জেনারেল ঘোষিত অর্ডিন্যান্সকে পাকিস্তানের গণ-পরিষদ ১৯৫৫ সনের ৩০ সেপ্টেম্বর শাসনতান্ত্রিক বিধানে পরিণত করেছিলো। পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিটের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওঠে, মওলানা ভাসানীর মতো শহীদ সোহরাওয়ার্দীও এর বিরোধিতা করেন। আওয়ামী লীগের অক্টোবর (১৯৫৫) অধিবেশনে গৃহিত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে ক্ষমতায় গেলে আওয়ামী লীগ এক ইউনিট প্রশ্নে প্রদেশের জনমত যাচাই করার ব্যবস্থা নেবে এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা করা হবে।[১৫৩]

কিন্তু ক্ষমতালাভের পর এ প্রশ্নেও সোহরাওয়ার্দী সংগঠনের সিদ্ধান্তের পরিপন্থী ভূমিকা গ্রহণ করেন। ন্যাশনাল পার্টির মতো মুসলিম লীগও এক ইউনিটের বিরোধিতা শুরু করেছিলো: ১৯৫৭ সনের ১৪ জানুয়ারী পশ্চিম পাকিস্তান পরিষদে মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য জি. আল্লানা এক ইউনিট ভেঙে ফেলার প্রস্তাব উত্থাপন করেন, কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সম্পাদক কাজী মোহাম্মদ ইসা ১৮ মার্চ বলেন যে এক ইউনিট ব্যবস্থা 'সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে' এবং তাই তার দল আর একে সমর্থন করেনা। পশ্চিম পাকিস্তানে লীগ সংসদীয় দলের নেতা সরদার বাহাদুর ২০ মার্চ 'টপ সিক্রেট এ্যাণ্ড পার্সোনাল' এক চিঠিতে জি. এম. সৈয়দকে জানান যে তার দল মুসলিম লীগ এক ইউনিট বিরোধিতায় সমর্থন দেবে।[১৫৪] এমনকি কেন্দ্রে ক্ষমতার গরিষ্ঠ অংশিদার রিপাবলিকান পার্টিও এক ইউনিটের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলো।[১৫৫]

আওয়ামী লিগের সিদ্ধান্ত এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সার্বিক জনমতকে উপেক্ষা করে আইউব খানের ভাষায় সোহরাওয়ার্দী এক ইউনিটের 'প্রচণ্ড' ও 'শক্তিশালী সমর্থকে' পরিণত হন।[১৫৬] আবুল মনসুরের মতে এক ইউনিটকে সোহরাওয়ার্দী তার 'মূল নীতি' বানিয়েছিলেন।[১৫৭] শুধু তা-ই নয়, ব্যবস্থাটির বাতিলের মধ্যে অতঃপর তিনি পাকিস্তানের 'সংহতি নস্যাতের' অনিবার্যতাও আবিষ্কার করতে থাকেন।[১৫৮] সোহরাওয়ার্দী বলেছেন: '.........আগের কথা ভুলিয়া যাও আবুল মনসুর, এখন আমি মনে করি, এক ইউনিট ভাংগিবার অর্থ পাকিস্তান ভাংগিয়া যাওয়া।[১৫৯] অনেকে মনে করেন যে সোহরাওয়ার্দীর এই কঠোর মনোভাবের পেছনে জেনারেল আইউব খানের 'চাপ' ক্রিয়া করেছিলো।[১৬০]

২. আওয়ামী লীগের সাথে ভাসানীর সম্পর্কোচ্ছেদ: আক্রমণের মুখে গণতান্ত্রিক সম্মেলন

পশ্চিম পাকিস্তানের প্রগতিশীল নেতাদের সাথে মওলানা ভাসানীর মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৫৭ সনের ২০ জুলাই ঢাকার 'শাহবাগ' হোটেলে দুই প্রদেশের ভাসানী-সমর্থকদের প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মাহমুদ আলী কাসুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আসন্ন গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলনকে সফল করার লক্ষ্যে একটি যুক্ত কমিটি গঠন করা হয়: পূর্ব বাংলার ইয়ার মোহাম্মদ খান,

মহিউদ্দিন আহমদ, সলিমুল হক খান মিল্কি, আবদুল মোত্তাকিম চৌধুরী ও আবু জাফর শামসুদ্দিন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে জি. এম. সৈয়দ, মিয়া ইফতিখার উদ্দিন, মাহমুদ আলী কাসুরী, মাহমুদুল হক ওসমানী ও অবসরপ্রাপ্ত মেজর ইসহাক এর সদস্য মনোনীত হন।

বরিশালে প্রাদেশিক রাজস্বমন্ত্রী মাহমুদ আলীর নেতৃত্বাধীন গণতন্ত্রী দলের ২১ থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত তিনদিব্যাপী সুপ্রীম কাউন্সিলের সভায়ও মওলানা ভাসানী আহূত সম্মেলনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং এ ব্যাপারে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ওয়ার্কিং কমিটিকে দেয়া হয়। স্বাধীন ও জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র-নীতির সমর্থনে গণতন্ত্রী দলের এক প্রস্তাবে বলা হয়ঃ কাশ্মির সমস্যার নাম ব্যবহার করে বৃটিশ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এদেশে তাদের স্বার্থ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে।

১৯৫৭ সনের ২৪ জুলাই মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের সাথে তার সম্পর্কোচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেন, ২৫ ও ২৬ জুলাই ঢাকার 'রূপমহল' সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত হয় 'নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলন'। খান আবদুল গাফফার খান সহ ইতিপূর্বে উল্লিখিত পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ এতে যোগ দেন। সোহরাওয়ার্দী অনুসারীরা সম্মেলন বানচালের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেঃ গণতন্ত্রী দলের প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য মীর্জা গোলাম হাফিজ ও ন্যাশনাল পার্টির নেতা মিয়া ইফতিখার উদ্দিন সহ অনেকের উপর শারীরিক আক্রমণ চালানো হয়, খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াসের কাছ থেকে প্রচার পুস্তিকা ছিনিয়ে নিয়ে অগ্নিসংযোগে ভস্মিভূত করা হয়। সিনেমা হলের বাইরে সমবেত গুণ্ডারা সোহরাওয়ার্দীর সমর্থনে এবং মওলানা ভাসানী ও গাফফার খানকে 'ভারতের দালাল' বলে অবিরাম শ্লোগান দিতে থাকে। প্রচুর বিরোধী প্রচারপত্রও বিতরণ করা হয়।

৩. মওলানা ভাসানীর বক্তৃতাঃ কৃষক শ্রমিক ও মধ্যবিত্তদের দুর্দশা প্রসঙ্গে

এমনিতর প্রতিকূল অবস্থায় গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে মওলানা ভাসানী বৃটিশ

বিরোধিতার যুগ থেকে পাকিস্তানের দশ বৎসরের ইতিহাস পর্যন্ত সবিস্তারে বর্ণনা করেন। কৃষি ও কৃষকের দুর্দশার জন্য মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও নিজাম-ই-ইসলাম পার্টির সমন্বয়ে গঠিত অতীত সরকারগুলির মতো 'নতুন আশার সঞ্চারকারী' আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকারকেও দায়ী করে তিনি দুর্নীতিপরায়ন আমলা ও আমিনদের অকথ্য জুলুম ও দুর্নীতির কাহিনী তুলে ধরেন। মওলানা ভাসানী বলেন: 'বিনা খেসারতে জমিদারী উচ্ছেদের সার্বজনীন দাবী সত্ত্বেও এই সরকার কৃষকের ঘাড় ভাংগিয়া জমিদারগণকে খেসারত দানের ব্যবস্থাই বহাল রাখিয়াছেন। এছাড়া ২১ দফা মোতাবেক খাজনা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই, বরং বহুক্ষেত্রে খাজনা বৃদ্ধি হইতেছে।' পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষকদের প্রতি মুসলিম লীগ ও রিপাবলিকান পার্টির বিশ্বাসঘাতকতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন: '………… তাই প্রাক্তন সিন্ধুর বিশ লক্ষ হারী (ভূমিহীন কৃষক) আজো জায়গীরদার জমিদারের অধীনে গোলামের জীবন যাপন করিতেছে এবং প্রাক্তন পাঞ্জাবের লাখ লাখ মজলুম কৃষক বর্বর বাটাই ও বেগারী প্রথার চাপে নিষ্পেষিত হইতেছে। পক্ষান্তরে মুষ্টিমেয় তিওয়ানা, মালিক, খিজির, মিয়া, নুন প্রভৃতি জমিদার জায়গীরদার পরিবার পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ জমি দখল করিয়া ভোগ বিলাস করিতেছে………পাকিস্তানের জনসাধারণের যারা শতকরা ৮৫ জন সেই কৃষক সমাজ স্বাধীনতার কোন আস্বাদন পায় নাই। তারা আজও ভুখা। অনাহারে কৃষকের পেট আর পিঠ আজ এক হইয়া গিয়াছে।'

মধ্যবিত্তের দুরবস্থার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে মওলানা ভাসানী বলেন: '………সরকারই এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছে। ………ফলে দেশের প্রতিটি মানুষের সংগে সংগে মধ্যবিত্ত সমাজের আর্থিক মেরুদন্ডও ভাংগিয়া পড়িতেছে। এরূপ পরিস্থিতি ঠেকাইবার জন্য কোন পরিকল্পনা বর্তমান সরকারের নাই।'

শিল্পায়নে পশ্চাদপদতা প্রসংগে বলতে গিয়ে তিনি পূর্ব বাংলার দীর্ঘদিনের দাবীর উল্লেখ করে বলেন: ন্যায্য দাবী বিবেচনার পরিবর্তে সরকার 'ইহাকে প্রাদেশিকতা বলিয়া প্রচার করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইগণকে পূর্ব পাকিস্তানের ভাইগণের বিরুদ্ধে বিষাক্ত করিবার অপচেষ্টা

করিয়াছে।' তিনি বলেন ঃ 'আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার গঠিত হওয়ার পরও দেশকে শিল্পায়িত করার প্রশ্নে পূর্বেকার নীতি অনুসৃত হইতেছে। এই সরকার ২১ দফা ওয়াদা অনুসারে দেশকে শিল্পায়িত করার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু সে ওয়াদা তারা পালন করেন নাই। তাহারা দেশকে শিল্পায়িত করার জন্য কোনরূপ সুষ্ঠু নীতি এখন পর্যন্ত প্রণয়ন করেন নাই।'

মজুরীবৃদ্ধি, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা সহ শ্রমিকদের কল্যাণ-বিধানে কোনো সরকারই কোনো পদক্ষেপ নেয়নি উল্লেখ করে তিনি বলেন ঃ 'পাকিস্তানের শ্রমিকদের অবস্থা সত্যই অবর্ণনীয়।' ক্রমবর্দ্ধমান মূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে মওলানা ভাসানী বলেন ঃ 'এই অবস্থায় ২১ দফা মোতাবেক শ্রমিকদের বেতন ও মাগগী ভাতা বৃদ্ধি করা আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকারের উচিত ছিল। কিন্তু তাহা করা হয় নাই। বরং বর্তমান পূর্ব পাকিস্তান সরকার শিল্পে শান্তি রক্ষার নামে এক চুক্তি সম্পাদন করিয়া শ্রমিকদের বৈধ ধর্মঘটের অধিকার হরণ করিয়াছেন।'

শিক্ষা প্রসংগে বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ সরকারের নীতি ও আচরণকে 'ধ্বংসাত্মক' আখ্যা দিয়ে মওলানা ভাসানী বলেন ঃ 'প্রাইমারী ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ সরকারের শিক্ষানীতি আতংকের সৃষ্টি করে। ফলে অনেক শিক্ষক শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া অন্য পেশা গ্রহণে বাধ্য হইয়াছেন। গ্রামে বহু স্কুল ও পাঠশালা গরুর খোয়াড় ও ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত হয়। মাসের পর মাস শিক্ষকদের বেতন বকেয়ার খাতায় পড়িয়া থাকে। এইরূপ কয়েক হাজার শিক্ষকের প্রায় এগার মাসের বেতন বকেয়া রাখিয়া তদানিন্তন অর্থ সচিব জনাব গোলাম মোহাম্মদ দেশবাসীর সামনে পেশ করেন এক তথাকথিত উদ্বৃত্ত বাজেট।' দেশব্যাপী প্রতিবাদ ও আন্দোলনের মুখেও একই শিক্ষানীতি অনুসৃত হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করে মওলানা ভাসানী বলেন : 'সোহরাওয়ার্দী সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর চরম আঘাত হানিলেন ৭৭১৭ টি প্রাইমারী স্কুল বন্ধ করিবার পরিকল্পনা করিয়া। আমাদের মুখ্য মন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান ও শেখ মুজিবুর রহমান প্ল্যানিং কমিশনের সভ্য হিসাবে তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন।' একে তিনি 'ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনা' আখ্যা দেন।

প্রশাসন ও সমাজ জীবনের সর্বত্র দুর্নীতির সর্বব্যাপকতার বিবরণ দিয়ে তিনি বলেন ঃ 'দুর্নীতি আজ প্রায় সমগ্র সমাজ জীবনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে'। ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রসংগে অতীত ও বর্তমান সকল সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন ঃ 'সোহরাওয়ার্দী সরকার অর্ডিন্যান্স দ্বারা কেন্দ্রীয় কালাকানুন পুনরায় প্রয়োগ করিয়াছেন।'

৪. স্বায়ত্তশাসন ও এক ইউনিট প্রসঙ্গ ঃ 'বন্ধ্যা ও দেউলিয়া' পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে

স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন প্রস্তাব, একুশ দফার অংগীকার এবং আন্দোলনের সাথে সোহরাওয়ার্দী সরকারের বিশ্বাস-ঘাতকতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি উভয় প্রদেশের জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের এবং পশ্চিম পাকিস্তানে জবরদস্তিমূলকভাবে চাপিয়ে দেয়া এক ইউনিট ব্যবস্থা বাতিলের দাবী জানান।

পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণনাকালে তিনি বলেন ঃ 'বলা হইয়া থাকে যে আমাদের দেশের আর্থিক উন্নয়নের জন্য আমেরিকার ডলার সাহায্যের প্রয়োজন। শর্তহীন বৈদেশিক আর্থিক সাহায্য গ্রহণে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু আমেরি-কার শর্তাধীন ডলার সাহায্যে কোন দেশ উন্নতি করিয়াছে, এরূপ কোন দৃষ্টান্ত কেহ দেখাইতে পারিবেন কি?' প্রসংগতঃ তিনি চিয়াং কাইশেক শাসিত চীন এবং তুরস্ক ও ইরাক সহ বিভিন্ন দেশের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। ডলার সাহায্যের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন ঃ 'যেসব চুক্তি মারফত আমেরিকা ঐসব সাহায্য দান করে সে সব চুক্তিতে এমন সব শর্ত জুড়িয়া দেওয়া হয়, যাহাতে সাহায্য প্রাপ্ত দেশের রাজনৈতিক ও আর্থিক স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়। পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির প্রমাণিত কুফল সমূহের উল্লেখ ও সোহরাওয়ার্দীর বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ভূমিকার সমালোচনা করে মওলানা ভাসানী বলেন ঃ 'এই কাজ দ্বারা তিনি যেমন আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানের নীতি ও আদর্শগত শৃংখলা ভংগ করিয়াছেন, তেমনি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নকেও ভুলিয়া গিয়াছেন।'

কাশ্মির লাভ করার যে যুক্তি সামরিক চুক্তির সপক্ষে উত্থাপন করা হয় সে সম্পর্কে মুসলিম লীগ ও সোহরাওয়ার্দী সরকারের প্রচেষ্টা

প্রসংগে মওলানা ভাসানী বলেন: 'কিন্তু পর্বত মুষিক প্রসব করিয়াছে। কাশ্মির যেস্থানে ছিল, সেই স্থানেই আছে।' কাশ্মির লাভের জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের ওপর নির্ভরশীলতা পরিত্যাগের পরামর্শ দিয়ে মওলানা ভাসানী ভারত সরকারের একগুয়েমীপূর্ণ নীতিরও সমালোচনা করেন। সোহরাওয়ার্দী অনুসৃত নীতিকে 'বন্ধ্যা ও দেউলিয়া' আখ্যায়িত করে তিনি বলেন যে এই ব্যর্থতার সুযোগে কাশ্মিরে ভারত তার অবস্থানকে সুদৃঢ় করে ফেলছে। তিনি বলেন: 'আমাদের সরকার কাশ্মিরকে ভারতের হাতে তুলিয়া দেওয়ার জন্য দায়ী। প্রকারান্তরে, কাশ্মির পাওয়ার যুক্তিতে সরকার যে সব সামরিক চুক্তিতে যোগদান করিয়াছেন তাহার শর্তগুলির ফলে পাকিস্তানের আজাদী ও সার্বভৌমত্ব বিপদগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা কাশ্মিরও পাইলামনা এবং আমাদের আজাদী ও সার্বভৌমত্বও বিনষ্ট হইতেছে। ইহাই মুসলিম লীগ সরকার ও জনাব সোহরাওয়ার্দীর পররাষ্ট্রনীতির ফল।'

৫. ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামে অংশ নেয়ার অহবান

মওলানা ভাসানী তার দীর্ঘ ভাষণের শেষ পর্যায়ে বলেন: 'উপসংহারে আমি বলিতে চাই যে সত্য ও মিথ্যার লড়াই, শোষক ও শোষিতের লড়াই, জমিদার ও প্রজার, সুদখোর মহাজন ও খাতকের লড়াই, সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্যবাদের লড়াই, ধর্ম-অধর্মের লড়াই বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যখন যেখানেই হইয়াছে তাহাতে যে সমস্ত নেতা ও কর্মী অংশ গ্রহণ করিত, তাহাদের ত্যাগ, কোরবানী, নির্যাতন ভোগের মাপকাঠিতে সেই সংগ্রাম বা লড়াই ততটা সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহার নজীর বিশ্বনবী ও তাহার ছাহাবাদের জীবনে ও বর্তমান নবীন চীনের মুক্তি ও উন্নতির ইতিহাসে আমাদের সম্মুখে মওজুত। পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বহুলোকের বহু ত্যাগ ও কোরবানীর ইতিহাসও আমাদের সম্মুখে মওজুত আছে।'

সমবেত প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে মওলানা ভাসানী বলেন: 'দেশবাসীর কল্পনার সৌধ আজ বিধ্বস্ত। অমানিশার অন্ধকারে নিমজ্জিত ও দিক-

ভ্রান্ত জাতি আজ পথের সন্ধান চায়, সন্ধান চায় মুক্তির। সে পথ নির্দেশের পবিত্র দায়িত্ব আজ অপনাদের সকলের উপর। সুদূর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত হইতে শুরু করিয়া চট্টগ্রামের কক্সবাজার পর্যন্ত আমাদের দেশের সকল মানুষ আপনাদের উপর সে মহান দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে।'

পরিশেষে আহ্বান জানিয়ে মওলানা ভাসানী বলেন: 'তাই আজ পাকিস্তানের জনসাধারণের মনে নতুন আশা ফুটাইয়া তুলিবার জন্য এবং আমাদের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শকে রূপায়িত করার জন্য আমি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্ত গণতন্ত্রকামী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হইতে আবেদন জানাইতেছি। আমি আবেদন জানাইতেছি যে কৃষক, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক ও অন্যান্য মজলুম জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি, সমাজ সংস্কার ও কৃষকের হাতে জমি, খাদ্য সংকটের সমাধান, শিল্পোন্নয়ন ও শ্রমিকের উপযুক্ত মজুরী, দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা, যুক্তনির্বাচন প্রথাকে সুদৃঢ় করা, স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সমস্ত প্রকার সামরিক জোট হইতে আমাদের দেশকে মুক্ত করিয়া পাকিস্তানকে একটি পূর্ণ স্বাধীন, সার্বভৌম ও জনকল্যাণমূলক ফেডারেল রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির আদর্শ ও লক্ষ্য নিয়া পাকিস্তানের উভয় অংশের গণতন্ত্রকামীগণ একটি মঞ্চে মিলিত হউন। আমি বিশ্বাস করি যে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেশ ও জনসাধারণের প্রতি যত বিশ্বাসঘাতকতাই করিয়া থাকুকনা কেন পাকিস্তানের উভয় অংশের গণতন্ত্রকামীগণ যদি আজ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের অদর্শে ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহা হইলেই পাকিস্তানের মজলুম জনসাধারণের মুক্তি আসিবে এবং আমাদের দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হইবে এবং আমাদের পাকিস্তান সেদিন দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইবে।' [১৬১]

৬. ন্যাপের প্রতিষ্ঠাকালীন ঘোষণা

মওলানা ভাসানীর এই বক্তৃতার উর্দু অনুবাদও সম্মেলনে শোনানো হয়। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের বক্তৃতার পর ইয়ার মোহাম্মদ খান 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' নামে পাকিস্তানভিত্তিক একটি নতুন

রাজনৈতিক দল গঠনের প্রস্তাব করেন, মোহাম্মদ তোয়াহা তাকে সমর্থন করেন। প্রস্তাবটিতে বলা হয়ঃ 'পাকিস্তানের উভয় অংশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দল এবং সকল গণতান্ত্রিক নাগরিকদের প্রতিনিধিবৃন্দের এই সম্মেলন দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনার পর এবং ১। পাকিস্তানকে সাম্প্রদায়িকতা প্রাদেশিকতা, সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণমুক্ত একটি শক্তিশালী জাতিতে সংগঠিতকরণ, ২। জনসধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন, ৩। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ও দেশের উভয় অংশের স্বায়ত্তশাসন কায়েম করার উদ্দেশ্যে দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সম্মেলন পাকিস্তানবাসীর সেবায় উৎসর্গীকৃত নতুন একটি জাতীয় দল গঠনের প্রস্তাব করছে। এই নতুন দলটির নাম হবে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি।'[১৬২]

গণতন্ত্রী দল ও পাকিস্তান ন্যাশনাল পার্টি দলগতভাবে এবং উভয় প্রদেশের আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীরা ভাসানী-সমর্থক হিসেবে নতুন দলটিতে যোগদান করেন। বিকেলের অধিবেশনে বিষয় নির্বাচনী কমিটি সংশোধিত ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র পেশ করলে প্রতিনিধি সভা অস্থায়ীভাবে তা গ্রহণ করেন। সাংগঠনিক তৎপরতা আরম্ভ করার উদ্দেশ্যে মওলানা ভাসানীকে সভাপতি ও মাহমুদুল হক ওসমানীকে সাধারণ সম্পাদক করে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠনিক কমিটিও গঠিত হয়।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রতিষ্ঠাকালীন ঘোষণায় পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশান প্রতিষ্ঠার অংগীকার করে বলা হয়ঃ দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি ও মুদ্রা ব্যতীত সকল বিষয় প্রদেশের কর্তৃত্বে দেয়া হবে। অপর এক প্রস্তাবে এক ইউনিট বাতিল এবং ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে সাবেক প্রদেশ গুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে তাদের সমন্বয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে একটি আঞ্চলিক ফেডারেশন গঠনের কথা বলা হয়। এছাড়া দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসন ও পরিবেশ প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নকে সংগঠনের মৌলিক লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। দলের কর্মসূচীতে ভূমি সংস্কার, বিনা খেসারতে জমিদারী উচ্ছেদ, দ্রুত শিল্পায়ন, শিক্ষার প্রসার, শ্রমের যথোচিত মূল্যদান এবং দুর্নীতি উৎখাতের বিষয়গুলিকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত

ঘোষণায় স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ নীতি প্রতিষ্ঠার অংগীকার করে বলা হয়ঃ 'জাতীয় স্বার্থের আদর্শে এই নীতি পরিচালিত হবে এবং পাকিস্তানের স্বাধীনতার শক্তিবৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মর্যাদাবৃদ্ধি ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠাই পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য হবে।'[১৬৩]

৭. নেতৃবৃন্দের ওপর আক্রমণঃ মানিক মিয়ার 'মসির যুদ্ধ'

সম্মেলনের প্রস্তাবে এবং নেতৃবৃন্দের ভাষণে গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলনে আগত নেতা ও কর্মীদের ওপর সরকারী দলের ভাড়াটিয়া গুণ্ডাদের পরিচালিত আক্রমণের তীব্র নিন্দা করা হয়। আবদুল মজিদ সিন্ধী তার ভাষণে বলেনঃ 'বিরোধীরা আমাদের নেতাদের ওপর আক্রমণ করেই আজ আমাদের সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করে দিয়েছে।' ২৬ জুলাই মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গাফফার খান, জি. এম. সৈয়দ, মিয়া ইফতিখার উদ্দিন, মাহমুদুল হক ওসমানী, মাহমুদ আলী কাসুরী, ইয়ার মোহাম্মদ খান, মোহাম্মদ তোয়াহা, মোজাফফর আহমদ এবং মাহমুদ আলী সহ নবগঠিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতৃবৃন্দ 'রূপমহল' থেকে মিছিলযোগে পল্টন ময়দানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে আরো এক দফা আক্রমণ পরিচালিত হয়। পূর্বঘোষিত সভাস্থল পল্টন ময়দানে আগে থেকেই সোহরাওয়ার্দী অনুসারী গুণ্ডাবাহিনী প্রস্তুত এবং সুসজ্জিত অবস্থায় ছিলো। নেতৃবৃন্দ পৌঁছানোর সাথে সাথে শুরু হয় প্রবল আক্রমণ। এর কবল থেকে মওলানা ভাসানী ও গাফফার খানের মতো সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দও নিস্তার পাননিঃ ইট-পাটকেল নিক্ষেপ থেকে লাঠির আঘাত পর্যন্ত সর্বভাবেই তাদের আহত ও অপদস্থ করা হয়। গোলযোগের এক পর্যায়ে পুলিশ তার 'কর্তব্য' পালনে এগিয়ে আসে, তারপর ঢাকার এস. ডি. ও. এসে ১৪৪ ধারা ঘোষণার মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যবস্থা করেন।

'গণতন্ত্রের মানসপুত্র' সোহরাওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে তারই দলের সদ্যপদত্যাগী সভাপতির নেতৃত্বে গঠিত বিরোধীদল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিকে এমনি 'গণতান্ত্রিক' আচরণের মধ্য দিয়ে 'অভ্যর্থনা' জানানো হয়েছিলো। 'অভ্যর্থনার' এই ধারা ও পন্থাকে পাকিস্তানের সর্বত্রই সম্প্রসারিত করা হয়ঃ এমন একটি দৃষ্টান্তও, বিশেষ করে পূর্ব

বাংলায় পাওয়া যাবেনা, যেখানে সরকার সমর্থিত গুণ্ডাবাহিনীর মারাত্মক আক্রমণ মোকাবিলা ছাড়া ন্যাপ কোন জনসভা বা সম্মেলন করতে পেরেছে। সশস্ত্র এই আক্রামণের পাশাপাশি 'মসির যুদ্ধ' শুরু করে-ছিলেন তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ঃ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির তিন আদ্যক্ষর এন. এ. পি.-কে বিকৃতভাবে সমন্বিত করে 'নেহরু এইডেড পার্টি' হিসেবে আখ্যাদানের মাধ্যমে তিনি ভারত বিরোধী চলতি হাও-য়ার বেগকে প্রবলতর করতে চেয়েছিলেন, 'ইত্তেফাক' এর 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামে মওলানা ভাসানীকে 'লুঙ্গি সর্বস্ব মওলানা' বলতেও তিনি পিছপা হননি।[১৬৪] গণতন্ত্রের জন্য চিৎকারে ব্যতিব্যস্ত মানিক মিয়া এই একটি ক্ষেত্রে অন্ততঃ দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন ঃ 'পরমত সহিষ্ণুতা' কাকে বলে, গণতন্ত্রের 'সেবা' করতে গিয়ে বিরোধী মতামতকে কীভাবে 'স্বাগত' জানাতে হয় এবং 'গণতন্ত্র সম্মত' কেমনতর 'শালীন' ভাষায় জাতীয় নেতাদের সম্বোধন ও সমালোচনা করতে হয়। একই মানিক মিয়া সোহরাওয়ার্দী সরকারের প্রশংসার বর্ণনা দিতে গিয়ে তার গ্রন্থে (পৃ-১১৩) বলেছেন ঃ 'এই ভাবে আওয়ামী লীগের শাসন আমলে ব্যক্তি স্বাধীনতার যে দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়, পাক-ভারতে কেন, এশিয়া-আফ্রিকার কোথাও তার নজির নাই।' ন্যাপের প্রতি সোহরাওয়ার্দী-অনুসারী গুন্ডাবাহিনীর এবং মানিক মিয়ার নিজেরও আচরণকে 'গণতান্ত্রিক' কিংবা 'গণতন্ত্রসম্মত' হিসেবে স্বীকার করতে হলো 'ফ্যাসীবাদ' এবং 'ফ্যাসীবাদী আচরণ' কাকে বলে সেকথা 'নির্ভিক' ও 'সৎ' এই 'গণতন্ত্রী' সাংবাদিকটি কোথাও লিখে গেছেন কিনা তা জানা যায়নি।

৫
আওয়ামী লীগের শাসনকালে পূর্ব বাংলা

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে একথা দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় যে পূর্ব বাংলার জনগণ এবং তাদের সমর্থিত বৃহত্তম রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের সাফল্য-নির্মিত সিঁড়ি বেয়ে প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হওয়ার পর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সরাসরি গণবিরোধী পথ ধরেছিলেন : তিনি কেবল দলীয় নীতি ও কর্মসূচীর পরিপন্থী ভূমিকাই গ্রহণ করেননি, সংগঠনকেও বিচ্যুত করে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে সপক্ষে টেনেছিলেন, দীর্ঘ-দিনের সংগ্রামী আওয়ামী লীগকে পরিণত করেছিলেন নিজের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে। অসৎ এই উদ্দেশ্যটি সফল করার জন্য তিনি নয়া ঔপ-নিবেশিক দেশের নৈতিক দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করেছেন : মাঠে মরে পড়ে থাকা গরু ছাগলের দেহ ভোজনের জন্য যেমন শকুন বা কুকুরের অভাব হয়না, রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীনদের চারপাশেও তেমনি সুযোগ-সন্ধানী-দের ভীড় জমে : পদলেহনে ব্যতিব্যস্ত মানুষের সংখ্যা হয় অগণিত। এদের আজ্ঞাবহে পরিণত করতে তাই তিক্ষ্ম বুদ্ধি, বিচক্ষণতা বা বিরাট ব্যক্তিত্বের দরকার হয় না। অনুগ্রহের হাত বাড়াতে পারলে সে অবস্থায় পুরোনো দল ভাঙা নয় শুধু, রাতারাতি নতুন দলও যে কত সহজে গড়া যায়, তার দৃষ্টান্তের খোঁজে স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের দিকে তাকালেই চলে। আবুল মনসুর আহমদ, আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান এবং মানিক মিয়াদের সহযোগিতায় প্রধানমন্ত্রী সোহরা-ওয়ার্দী মানুষের চরিত্র হননের সহজ সে পথটিই ধরেছিলেন। প্রাসাদ কেন্দ্রিক রাজনীতি এবং আওয়ামী লীগের প্রবল প্রতিরোধের মুখে মুসলিম লীগ যেখানে ব্যর্থ হয়েছিলো, কেন্দ্র ও প্রদেশের ক্ষমতা ব্যবহার করে

সোহরাওয়ার্দী এবং তার অনুসারীরা সেখানে সাফল্যের সাথে এদেশের মানুষের সংগ্রামী চরিত্রের বিনাশ সূচিত করেছিলেন। এর পরিণতি হয়েছিলো সুদূরপ্রসারী এবং অত্যন্ত ভয়াবহ। সে আলোচনায় যাওয়ার আগে সোহরাওয়ার্দী অনুসৃত নীতির প্রভাব ও ফলাফল আলোচিত হওয়া দরকার।

১. স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে পরিপন্থী ভূমিকা ঃ পূর্বসূরী ক্ষমতাসীনদের অনুকরণ

পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে সোহরাওয়ার্দীর অবস্থান ও ভূমিকা পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রতারণার এক ন্যাক্কারজনক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। দেশ রক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি ও মুদ্রা ব্যতীত সকল বিষয়ে প্রদেশের ক্ষমতা সহ স্বায়ত্তশাসনর যে দাবীটির ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ তার জন্মকাল থেকে আন্দোলন করে আসছিলো, চুয়ান্নর নির্বাচনে যুক্তফ্রণ্টের সবব্যাপী বিজয়ের পেছনে যে দাবীর ছিলো প্রধান ভূমিকা, সর্বোপরী যে দাবীটি শাসনতন্ত্রের সংযোজিত না হওয়ার প্রতিবাদেই মূলতঃ গণপরিষদের অধিবেশন বর্জনে সোহরাওয়ার্দী স্বয়ং নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সাথে সাথে সে দাবীটির প্রশ্নেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন পূর্বসূরী পাকিস্তানী কর্ণধারদের ভূমিকাই। শুধু তা-ই নয়, পূর্বসূরীদের চাইতে কয়েক ধাপ এগিয়ে পূর্ব বাংলাকে 'শতকরা ৯৮ ভাগ' স্বায়ত্তশাসন প্রদানের উদ্ভট ও শঠতাপূর্ণ তত্ত্ব হাজির করে তিনি নিজেকে অধিষ্ঠিত করেছিলেন নিজেরই নেতৃত্বে প্রত্যাখ্যাত শাসনতন্ত্রের রক্ষক এবং অভিভাবকের আসনে।

প্রধানমন্ত্রীত্ব রক্ষার প্রয়োজনে পূর্বসূরীদের মতোই তিনি পূর্ব বাংলাকে অবদমনের পথে এগিয়েছেন ঃ স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' 'উগ্র প্রাদেশিকতা,' এবং 'পাকিস্তানের সংহতি নস্যাতকারী' আখ্যা দিয়ে তিনি এর প্রধান প্রবক্তা মওলানা ভাসানীকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করেছিলেন। পন্থা এবং ভাষাও তার ছিলো পূর্বসূরীদের মতোই ঃ যে তিনি নিজে একদিন সরকার বিরোধিতার কারণে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের কাছে 'হিন্দুস্থানের লেলিয়ে দেয়া

পাগলা কুকুর' ('Mad dog let loose by India') গাল শুনেছিলেন, সে তিনিই প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর মওলানা ভাসানীকেও একইভাবে আক্রমণ করেছেন। অবশ্য পরিস্থিতির কারণে তাকে ভাষার ব্যাপারে সংযত হতে হয়েছিলো ঃ নিজের মতো 'পাগলা কুকুর' না বানিয়ে মওলানা ভাসানীকে তিনি 'ভারতের অর্থ প্রাপ্ত অনুচর' বলেছেন, লিয়াকত আলীর অনুকরণে দেশ থেকে বহিষ্কারের পরিবর্তে তিনি গণ আদালতের বিচারে মৃত্যুদণ্ডের 'গণতান্ত্রিক হুমকি' দিয়েছেন। অভিযোগ প্রমাণের চ্যালেঞ্জ তিনি গ্রহণ করেননি, কেননা, সেটা প্রমাণযোগ্য ছিলোনা, তবু তিনি বলতেন, তাকে বলতে হতো, শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীত্ব রক্ষার স্বার্থে, আর তাই তিনি পাকিস্তানের ক্ষমতাসীনদের বহু ব্যবহৃত এবং প্রতিবারই ব্যর্থ প্রমাণিত অস্ত্রই ব্যবহার করেছেন। পূর্ব বাংলা সহ পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে ভারত বিরোধিতার নামে ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িকতার যে বিষ বৃক্ষের চাড়া রোপন করা হয়েছিলো, তিনি সযত্নে তারই পরিচর্যা করে গেছেন, প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন। ক্ষমতার লোভ তাকে আচ্ছন্ন করেছিলো এবং তাই তিনিও পারেননি বিরোধী দলের দাবী ও সমালোচনার মুখে সহনশীল থাকতে, বারবার তিনি স্বায়ত্তশাসনের দাবীর মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন পাকিস্তানের সংহতি নাশের ষড়যন্ত্র, অভিযোগ তুলেছেন তিনি নিজেরই দলের-সভাপতি মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে-যিনি এক সময় 'ভারতের লেলিয়ে দেয়া পাগলা কুকুর' হিসেবে পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত সোহরাওয়ার্দীকে পাকিস্তানে ফিরিয়ে এনেছিলেন হুমকি আর দলনের মুখে অনমনীয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

২. পূর্ব বাংলার দুর্দশা অব্যাহত ঃ আতাউর রহমানের প্রতারণাপূর্ণ ভূমিকা

পূর্ব বাংলার জনগণের ভোটে, তাদেরই সমর্থিত আওয়ামী লীগের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হওয়ার তিন দিন পর অনুষ্ঠিত পল্টন ময়দানের জনসভা থেকে শুরু করে কাগমারী সম্মেলন সহ সকল সমাবেশেই তিনি বলতে শুরু করেছিলেন যে তিনি কেবল পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী নন, তাকে সারা পাকিস্তানের স্বার্থই দেখতে হয়। পূর্ব বাংলার স্বার্থের জন্য পাকিস্তানের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে তাকে কেউ কখনো বলেননি, কিন্তু পূর্বসূরীদের মতো তিনিও যে পাকিস্তানের স্বার্থচিন্তা করেছিলেন, সে পাকিস্তানে

কোনোদিনই পূর্ব বাংলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি, সেটা ছিলো কেবল পশ্চিম পাকিস্তান। 'আওয়ামী লীগ ক্ষমতা পাওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানও শোষিত হওয়ার একই অভিযোগ করতে পারে'-এটা ছিলো তার আর এক অদ্ভুত যুক্তি এবং এই অজুহাতে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি তোষণ নীতি চালাতে গিয়ে তিনি সুচতুরভাবে যে পদক্ষেপ সমূহ নিয়েছিলেন সেগুলি সরাসরি পূর্ব বাংলার স্বাথকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। প্রসংগত সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভার শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী আবুল মনসুর আহমদের গ্রন্থে (পৃ-৪৮৭-৮৯) বর্ণিত একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারেঃ কেবল মাত্র পূর্ব বাংলার শিল্পায়নের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রদত্ত পাঁচ কোটি টাকার শিল্পঋণের অর্থ থেকে সোহরাওয়ার্দী পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য এক কোটি টাকা আদায় করেছিলেন। আদায়কালে আবুল মনসুরকে তিনি বলেছিলেনঃ 'আমি শুধু পূব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নই। উভয় পাকিস্তানের প্রধান-মন্ত্রী……… বেশীনা, এই তহবিল হইতে মাত্র এক কোটি টাকা পশ্চিম পাকিস্তানকে দিয়া পশ্চিমা ভাইদেরে দেখাইয়া দাও, আমরা তাদের চেয়ে বেশী বিচারী লোক।' পূর্ব বাংলার অংশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানকে অর্থ দেয়ার আইনগত ফাঁক খুঁজতে গিয়ে লাল-নীল পেন্সিলে দাগ কাটতে কাটতে তিনি গলদঘর্ম হয়েছেন। এটা তিনি করেছিলেন পশ্চিম পাকিস্তান না চাইতেই, কিন্তু এমন একটি ঘটনারও উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না, যেখানে সোহরাওয়ার্দী পূর্ব বাংলার জন্য পশ্চিম পাকি-স্তানের স্বার্থে হাত দিয়েছিলেন। পূর্ব বাংলা বরং তার সময়েও ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিতই হয়েছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে কাগমারী সম্মেলনে ভাষণদানকালে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী স্বায়ত্তশাসনের দাবীর বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে 'বৈদেশিক সাহায্য বন্টনের' মতো বিষয় গুলিতে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছিলেন। এটা সোহরাওয়ার্দীর উদ্ভাবিত নীতি ছিলোনা, কেন্দ্র অনুসৃত নীতির পক্ষই তিনি অবলম্বন করেছিলেন মাত্র। কেন্দ্রের হস্ত-ক্ষেপের ফলে বৈদেশিক সাহায্যে পূর্ব বাংলার ভাগ্যে ১৯৫৬ সন পর্যন্ত জুটেছিলো মাত্র ১৫ কোটি টাকা, পশ্চিম পাকিস্তান সেখানে পেয়েছিলো ৭৩ কোটি টাকা।[১৬৫] এই অবস্থার পরও সোহরাওয়ার্দী বিষয়টিকে কেন্দ্রের হাতের রাখার সপক্ষেই ওকালতী করেছেন, তদুপরী বাঙালী মন্ত্রী

অবুল মনসুর আহমদের কাছ থেকেও প্রদেশের অংশে ভাগ বসিয়ে তিনি অতীতের মতো ভবিষ্যতের জন্যও পূর্ব বাংলার ভাগ্য নির্দ্ধারিত করে দিয়েছিলেন।

পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্যের দীর্ঘ তালিকাকে সংক্ষিপ্ত করার পরিবর্তে সোহরাওয়ার্দী বরং আরো দীর্ঘ করেছিলেন। ঢাকায় আহূত গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে মওলানা ভাসানী পরিসংখ্যান সহ এ ব্যাপারে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। এখানে কেবল প্রতিরক্ষা ব্যয়ের হিসেবটির কথাই বলা যাক : ১৯৫৬-৫৭ সন পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় ব্যয়িত হয়েছিলো মাত্র ১৮ কোটি টাকা, অন্য দিকে পশ্চিম পাকিস্তানে এই ব্যয়ের পরিমাণ ছিলো ৪৮০ কোটি টাকা।[১৬৬] সোহরাওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে এই অবস্থার উন্নতির কোনো প্রমাণ মেলেনা, বরং 'হস্তক্ষেপ না করার' যে ওয়াদা তিনি মন্ত্রীত্ব গ্রহণকালে প্রধান সেনাপতি আইউব খানের কাছে করেছিলেন, সে ওয়াদা এমন সুনির্দিষ্টভাবে তার দ্বারা পালিত হয়েছিলো যে, এক কালে 'শত্রু' মনে করলেও আইউব খান তার প্রশংসা না করে পারননি।[১৬৭] উল্লেখ্য যে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সোহরাওয়ার্দী দেশরক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করতেন।

প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণকালে পূর্ব বাংলায় বিরাজমান খাদ্য সংকট মোকাবিলায় সোহরাওয়ার্দী অনুসৃত নীতির ফলাফল বর্ণনা করেছেন তারই আর এক অনুসারী আতাউর রহমান খান। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ১৯৫৮ সনের ৪ জুন করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আতাউর রহমান খান জানান : বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানীর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলাকে ১৯৫৬-৫৭ সনে ২ কোটি ২৯ লক্ষ এবং ১৯৫৭-৫৮ সনে ৯ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছিলেন। কিন্তু একই সাথে 'অনাবশ্যক' এমন কতিপয় ব্যবস্থাও কেন্দ্র প্রবর্তন করেছিলো যার ফলে পূর্ব বাংলাকে বছর দু'টিতে যথাক্রমে ১ কোটি ৬৮ লক্ষ এবং ২ কোটি ২ লক্ষ টাকা লোকসান দিতে হয়েছিলো। কারণ, পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীদের স্বার্থে খাদ্যশস্য খালাস করা হতো লারকানা, দাদু, জ্যাকোবাবাদ ও শুককুর সহ কয়েকটি স্থানে। আর সে উপলক্ষে পূর্ব বাংলার কাছ থেকে পশ্চিম পাকিস্তান সরকার আদায় করতেন মণ প্রতি এক টাকা হিসেবে, অথচ আগে এই খাতে সাবেক সিন্ধু সর-

কার টন প্রতি নিতেন মাত্র ছ' আনা করে। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাধ্যতামূলকভাবে বার্মার চাইতে প্রতি মণে তিন টাকা বেশী দরে এই চাল কিনতে হতো। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার প্রবর্তিত এই অন্যায় ব্যবস্থার ফলে পূর্ব বাংলা সরকারের মণ প্রতি খরচ পড়েছিলো ২৩ টাকা ১৪ আনা ৭ পাই এবং ২ টাকা ১০ আনা ৭ পাই হারে লোকসান দিয়ে সে খাদ্যশস্য টাকা ২১ টাকা ৫ আনা দরে বিক্রী করতে হওয়ায় বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২ কোটি ৮৯ লক্ষ ৮০ হাজার ৩২৪ টাকা (সর্বমোট ১ কোটি ৮ লক্ষ ৬৮ হাজার ৮০৯ মণে)। [১৬৮]

পূর্ব বাংলার এই বিরাট ক্ষতির কারণ ঘটিয়েছিলো সোহরাওয়ার্দী সরকারের প্রবর্তিত নীতি এবং তার সমালোচনায় সোচ্চার হয়েছিলেন তারই অনুসারী আতাউর রহমান খান। কিন্তু পূর্ব বাংলার মানুষের দুর্ভাগ্য : আতাউর রহমান তার 'লীডার' এবং নিজেরও স্বার্থে যথাসময়ে, অর্থাৎ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে অভিযোগটি তুলে ধরেননি। প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বাঙালীদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যকে অবহেলা করে আরো অনেকের মতো আতাউর রহমানও সে সময় মওলানা ভাসানী বিরোধী শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন। সেই একই ব্যক্তি আবার সোহরাওয়ার্দী অপসারীত হওয়ার পর বাঙালীদের 'নায়ক' হওয়ার আকাংখাতাড়িত হয়ে পূর্ব বাংলার পক্ষে অভিযোগ তুলে ধরেছিলেন। এই আলোকে তাই একথা বলা যায় যে আতাউর রহমানদের ইচ্ছের মর্যাদা দিয়ে সোহরাওয়ার্দীকে আরো একবার প্রধানমন্ত্রী বানানো হলো পূর্ব বাংলার অভাব-অভিযোগের ব্যাপারে চির দিনের মতো মুখ বন্ধ করতেও তাদের আপত্তি থাকতোনা। প্রসংগতঃ স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে প্রাদেশিক পরিষদে সরকারীভাবে প্রস্তাব উত্থাপন প্রশ্নে আতাউর রহমান খানের ন্যাক্কারজনক ভূমিকার কথাও স্মরণীয় : নিজেরই সভাপতিত্বে গৃহিত আওয়ামী লীগ ওয়াকিং কমিটির (২ মার্চ, ১৯৫৭) নির্দেশ এড়িয়ে তিনি প্রস্তাবটি উত্থাপনই করতে দেননি, বেসরকারীভাবে পরিষদে প্রস্তাবটি উত্থাপিত হলেও বিতর্কের সময় তিনি দফতরে 'বিশ্রাম' নিয়েছিলেন (৩ এপ্রিল, ১৯৫৭)। শুধু তা-ই নয়, প্রাদেশিক পরিষদে প্রস্তাবটি গ্রহণকালে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের ব্যাপারে কেন্দ্রকে অনুরোধ জ্ঞাপন সহ

প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার জন্য পরিষদ সদস্যদের সর্বসম্মত অনুরোধটি পর্যন্ত তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেননি। তাছাড়া প্রাদেশিক পরিষদের স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত সর্বসম্মত প্রস্তাবটিকে 'রাজনৈতিক চমক' আখ্যা দিয়ে সোহরাওয়ার্দী পূর্ব বাংলার সমগ্র জনগণকে অবমাননা করার পর এবং 'বিচ্ছিন্নতাবাদীদের' বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর 'কঠোর হস্তে দমনের' অগণতান্ত্রিক হুমকির প্রেক্ষিতেও মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আতাউর রহমান খান একটি কথা উচ্চারণ করেননি।

অর্থাৎ সোহরাওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রীত্বের দিনগুলিতেও পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্য ও অবিচারের চলতি ধারাকেই অব্যাহত রাখা হয়েছিলো। দেশ রক্ষা, মুদ্রা ও পররাষ্ট্রনীতি ব্যতীত বাকী বিষয় সমূহকে প্রদেশের হাতে দেয়ার বিধানবিহীন শাসনতন্ত্রকে 'শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন দানকারী' হিসেবে বর্ণনা করেই সোহরাওয়ার্দী থেমে থাকেননি. শিল্প, বাণিজ্য, রেলওয়ে, যোগাযোগ এবং আবগারী ও শুল্কের মতো শাসনতন্ত্র স্বীকৃত বিষয়গুলিকেও প্রদেশের হাতে দেয়ার কোনো ব্যবস্থা তিনি করেননি। সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভার 'অতি উদ্যমী' শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী আবুল মনসুর আহমদের প্রচেষ্টায় একবার কিছু শিল্প, সাপ্লাই ও ডেভেলোপমেন্ট বিভাগ, আমদানী-রফতানী কন্ট্রোলারের অফিস এবং বৈদেশিক মুদ্রার অংশ ব্যবহারের কর্তৃত্ব পূর্ব বাংলাকে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছিলো। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে গিয়ে দেখা গেলো : প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা যে কেবল নেই তা-ই নয়, পরবর্তী দু'বৎসরের আনুমানিক আয়ের সমপরিমাণ অর্থও ইতিমধ্যে ব্যয়িত হয়ে গেছে। এক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সোহরাওয়ার্দী কোনো অনুকূল ব্যবস্থা করার উদ্যোগ পর্যন্ত নেননি, উল্টো পশ্চিম পাকিস্তানীদের মধ্যে 'নাহক-দুশমনী' সৃষ্টির জন্য মন্ত্রী আবুল মনসুরকে তিরস্কার করেছেন।[১৬৯] বলা বাহুল্য, আবুল মনসুর আহমদের উদ্দেশ্যও পূর্ব বাংলার কল্যাণে নিবেদিত ছিলো না, তিনি পরবর্তী নির্বাচনে ভোট পাওয়ার লক্ষ্যে 'প্রস্তুতি' নিতে চেয়েছিলেন।

৩. সংখ্যালঘিষ্ঠতাজনিত 'অক্ষমতা' কারণ নয়

তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার মতো সোহরাওয়ার্দী অনুসারীদের

কেউ কেউ তাকে রক্ষা করার অজুহাত হিসেবে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভায় আওয়ামী লীগের লঘিষ্ঠ অংশীদারিত্বের দিকটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে একে সোহরাওয়ার্দীর 'সীমাবদ্ধতা জনিত অক্ষমতা' মনে হতে পারে, কিন্তু বিষয়টিকে সামগ্রিক পরি-প্রেক্ষিতের আলোকে দেখতে হবে। প্রধানমন্ত্রীত্ব কিংবা ক্ষমতায় আও-য়ামী লীগকে অংশ দেয়াটা কোনো অনুগ্রহের ব্যাপার ছিলো না, পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ পরিচালিত আন্দোলনের সাফল্যের ফলেই প্রদেশের প্রতিনিধিত্বকারী প্রধান এই দলটিকে তখন ক্ষমতা দিতে হয়ে-ছিলো। পরিস্থিতি সেসময় এমন অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে যে পূর্ব বাংলার জনগণকে যে-কোনো মূল্যে শান্ত করা ছিলো ক্ষমতার নিয়ন্ত্রকদের জন্য অপরিহার্য এবং সে জন্যই 'লঘিষ্ঠ' অংশীদার হলেও প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী একাই পেয়েছিলেন সাতটি মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতা। এছাড়াও আওয়ামী লীগের অন্য চারজন মন্ত্রী ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে। অন্যদিকে 'গরিষ্ঠ' অংশীদার রিপাবলিকান পার্টির মাত্র চারজন মন্ত্রীত্ব পেয়েছিলেন।[১৭০] একথা তাই স্বীকার করা যায়না যে সোহরা-ওয়ার্দী লঘিষ্ট অংশীদারিত্বের কারণে দূর্বল কিংবা কম ক্ষমতাবান ছিলেন, বরং পূর্ব বাংলায় আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট জনগণের শক্তিকে সামান্য হলেও কাজে লাগানোর চেষ্টা নলে সোহরাওয়ার্দী স্বায়ত্ত-শাসন সহ অনেক দাবী ও অধিকারই আদায় করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি, উল্টো জনগণের আশা আকাংখাকে নস্যাত করে তিনিও পাকিস্তানের ক্ষমতাসীনদের সর্বসময় গৃহিত পূর্ব বাংলা বিরোধী তৎপরতার পন্থাকেই বেছে নিয়েছিলেন। একে তাই অক্ষমতা বলে পাশ কাটানো যায়না।

ওপরের পর্যালোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে সোহরাওয়ার্দীর প্রধান-মন্ত্রীত্বকালে পূর্ব বাংলা কোনো দিকে থেকেই লাভবান হতে পারেনি, তার কাছে তাই এদেশের ঋণী থাকারও কোনো কারণ ঘটেনি। তিনিই বরং সাফল্যের সাথে এদেশের ওপর সওয়ার হয়েছিলেন। এমনিতর পরিষ্কার প্রতারণা সত্ত্বেও তিনি এদেশের 'জাতীয় নেতা' হতে পেরেছেন, কারণ, আতাউর, মনসুর, মুজিব এবং মানিক মিয়াদের মতো ক্ষমতাবান কতিপয় রাজনীতিক-সাংবাদিকদের তিনি জোগাড় ও

একত্রিত করেছিলেন ঃ একটি দেশ ও তার অধিবাসীদের মংগলবিধানের চাইতে কিছু 'প্রতিভাধর' অনুসারী সৃষ্টির মাধ্যমে নিজের ভবিষ্যত মর্যাদালাভের স্থায়ী ব্যবস্থাটি তিনি অনেক সহজে এবং বিচক্ষণতার সাথে করে গেছেন।

ক. সোহরাওয়াদী'র পররাষ্ট্রনীতির পর্যালোচনা

এবার বিতর্কের দ্বিতীয় বিষয় পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে সোহরাওয়াদীর অবস্থান ও ভূমিকা এবং তার ফলাফলের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। আওয়ামী লীগের সুস্পষ্ট ঘোষণা ও কর্মসূচী কেবল নয়, ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা বাতিল ও ৯২-ক ধারা প্রবর্তন সহ বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে একথা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিলো যে আমেরিকার নেতৃত্বে সম্পাদিত সামরিক চুক্তি ও জোট-গুলি ছিলো প্রত্যক্ষভাবে স্বায়ত্তশাসন সহ পূর্ব বাংলার স্বার্থবিরোধী। সেই পূর্ব বাংলার প্রতিনিধি হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হওয়ার পর পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নেও সোহরাওয়াদী গ্রহণ করেছিলেন আওয়ামী লীগের কর্মসূচী তথা পূর্ব বাংলার স্বার্থের পরিপন্থী অবস্থান। এক্ষেত্রে তিনি পাকিস্তানের সর্বকালীন শাসকদের অনুকরণে 'শত্রু প্রতিবেশী' ভারতের অনিবার্য 'হামলার মুখে অস্তিত্ব রক্ষা' এবং 'অধিকৃত কাশ্মির উদ্ধার' সহ শস্তা জনমনহরণকারী যুক্তির অবতারণা করেছেন। ভারত-বিরোধী তৈরী করা মনোভাবের সুযোগ কাজে লাগিয়ে তিনি মওলানা ভাসানী সহ স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির প্রবক্তা ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে ভারতমুখীতার অপ্রমাণীয় অভিযোগ এনেছিলেন। আর এই অন্যায় কাজটি করতে গিয়ে তিনি গণতন্ত্র সম্মত আচরণের সীমানা অতিক্রম করে বর্বর ফ্যাসীবাদী পন্থার আশ্রয় নিতেও লজ্জা বোধ করেননি।

১. সোহরাওয়াদীর দম্ভপূর্ণ ঘোষণা এবং 'মিত্র' রাষ্ট্রগুলির প্রতিক্রিয়া

ইতিপূর্বে পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত প্রাথমিক আলোচনাকালে এর পরি-প্রেক্ষিত এবং তৎকালীন প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে, এখন

কেবল সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকা ও উদ্যোগ এবং তার ফলাফল আলোচিত হবে। প্রথম থেকেই সোহরাওয়ার্দী দাবী করে আসছিলেন যে পাক-মার্কিন, সিয়্যাটো এবং বাগদাদ চুক্তির প্রতিটিই ভারতের সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার লক্ষ্যে প্রণীত ঃ বাগদাদ চুক্তিকে তিনি মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। কাগমারী সম্মেলনের এক সপ্তাহ পর, ১৯৫৭ সনের ১৬ ফেব্রুয়ারী রেডিও পাকিস্তানে প্রচারিত ভাষণে তিনি সীমান্তে ভারতীয় সৈন্য সমাবেশের সংবাদ সম্পর্কে বলেন ঃ এর ফলে 'আমাদের সন্ত্রস্ত হওয়ার তেমন কারণ নেই' কেননা 'আল্লাহর অনুগ্রহে যে কোনো হামলার মুখে আত্মরক্ষার মতো যথেষ্ট শক্তি পাকিস্তান অর্জন করেছে।' সোহরাওয়াদী আরো বলেন ঃ 'সিয়্যাটো এবং বাগদাদ চুক্তির শর্তানুসারে পাকিস্তান আক্রান্ত হলে আমাদের মিত্ররা, যাদের মধ্যে কেউ কেউ অত্যন্ত শক্তিশালী, পাকিস্তানের পক্ষে এগিয়ে আসতে বাধ্য।[১৭১] বলা বাহুল্য ঃ এই 'শক্তিশালী মিত্রদের' বলতে তিনি বৃটেন ও আমেরিকাকে বুঝিয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর এই দম্ভপূর্ণ বক্তব্যের একদিন পর ১৯৫৭ সনের ১৮ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় প্রাদেশিক প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হোরেস এ, হিলড্রেথ ঘোষণা করেন ঃ 'সিয়্যাটোর শর্তানুযায়ী আমেরিকা কেবল তখনই পাকিস্তান কিংবা চুক্তিভুক্ত অন্য দেশের সাহায্যে এগিয়ে যাবে, যখন কোনো কমিউনিস্ট দেশ বা শক্তির দ্বারা সে আক্রান্ত হবে।' ভারতের আক্রমণের মুখে এগিয়ে আসার ব্যাপারে সোহরাওয়ার্দীর বক্তব্য সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন ঃ 'আপনাদের প্রধানমন্ত্রী কী বলেছেন জানিনা, এ নিয়ে তার সাথে বিতর্কেও যাবোনা, কিন্তু সিয়্যাটোর প্রশ্নে আমি সুনিশ্চিতভাবে কেবল একথাই বলতে পারি যে এটা কমিউনিস্ট আক্রমণ বিরোধী একটি মৈত্রীজোট।'

বৃটিশ পররাষ্ট্র দফতরও সিয়্যাটো এবং বাগদাদ চুক্তির শর্তাবলী উল্লেখ করে লণ্ডনে এক ঘোষণায় বলে ঃ 'বৃটেন একথা ভাবতেই পারে না যে সে কমনওয়েলথভুক্ত একটি দেশের (তথা ভারতের) বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে।' সিয়্যাটোর অন্যতম সদস্যদেশ নিউজিল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রীও

একই কথা বলেছিলেন ঃ 'বিষয়টি ম্যানিলাতেই পাকিস্তানকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।'[১৭২]

'অত্যন্ত শক্তিশালী মিত্র' রাষ্ট্রগুলির বক্তব্য প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর জন্য মারাত্মক আঘাত হিসেবে এসেছিলো, তৈরী করেছিলো অত্যন্ত অস্বস্তিকর পরিবেশের। চুক্তিগুলি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময় থেকে পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ ও যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে 'কমিউনিস্টদের' অবস্থান আবিষ্কার, আদমজীর দাংগায় কমিউনিস্টদের 'যোগসাজশের' অভিযোগ এবং সর্বোপরী পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীর মধ্যেও 'বিচ্ছিন্নতাবাদীদের' সাথে কমিউনিস্টদের তৎপরতা সংক্রান্ত নতুন নতুন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে সামরিক চুক্তিগুলির প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা আগেই উন্মোচিত হয়ে গিয়েছিলো, মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ প্রথম থেকেই এগুলিকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' ও 'কমিউনিস্ট' দলনের নামে পূর্ব বাংলার স্বার্থকেন্দ্রিক আন্দোলনকে অবদমনের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত ষড়যন্ত্র হিসেবে সঠিকভাবেই চিহ্নিত করে আসছিলো। সেই চুক্তি গুলিকেই ভারত বিরোধী আখ্যা দিয়ে সোহরাওয়ার্দী তার নীতির যৌক্তিকতা প্রমাণের চেষ্টা করেছিলেন। সে অবস্থায় বৃটেন ও আমেরিকা সহ 'মিত্র দেশগুলির' প্রকাশ্য ঘোষণা একদিকে যেমন মওলানা ভাসানী সহ সাম্রাজ্যবাদী বিরোধীদের অভিযোগকে সত্য প্রমাণিত করেছিলো, অন্যদিকে সোহরাওয়ার্দীও চিহ্নিত হয়েছিলেন পূর্ব বাংলার স্বার্থবিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদের মিথ্যেবাদী অনচর হিসেবে। তেমন একটি অপমানকর পরিবেশেও তাই বলে সোহরাওয়ার্দীর বাগাড়ম্বর কমেনি, ক'দিন পর ১৯৫৭ সনের ২২ ফেব্রুয়ারী জাতীয় পরিষদের ভাষণেও তিনি একই ভাষায় কথা বলেছেন ঃ অতিথিদের সারিতে উপবিষ্ট মার্কিন ও ইরাকী রাষ্ট্রদূতদের দিকে ইঙ্গিত করে আরো একবার বলেছেন ঃ 'যাদের চোখ আছে তারা দেখতে পারে।'

২. সোহরাওয়ার্দী-আইসেনহাওয়ার যুক্ত ঘোষণা

সিয়্যাটো এবং বাগদাদ চুক্তিকে 'ভারত বিরোধী' হিসেবে চিহ্নিত করতে গিয়ে সোহরাওয়ার্দী যে কত বড় মিথ্যের আশ্রয় গ্রহণ করতেন

তার প্রমাণ মেলে ১৯৫৭ সনের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে প্রকাশিত সোহরাওয়ার্দী-আইসেনহাওয়ার যুক্ত ঘোষণার বক্তব্য থেকে। ১৩ জুলাই প্রকাশিত যুক্ত ঘোষণায় বলা হয় ঃ' ....প্রেসিডেন্ট (আইসেন-হাওয়ার) এবং প্রধানমন্ত্রী (সোহরাওয়ার্দী) এ বিষয়ে একমত হন যে স্বাধীন বিশ্বের নিরাপত্তার পথে আন্তর্জাতিক কমিউনিজম এক বিরাট হুমকি হিসেবে অবস্থান করছে। এশিয়ায় প্রবর্তিত সমষ্টিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি তারা পুনরায় সমর্থনের অংগীকার ব্যক্ত করেন। তারা (কমিউনিস্ট) আক্রমণ বিরোধিতার প্রত্যয়ও পুনরায় ঘোষণা করেন। তারা ঐক্যমত পোষণ করেন যে সাউথ-ইস্ট এশিয়া ট্রিটি অরগনাই-জেশন (সিয়্যাটো), বাগদাদ চুক্তি এবং পাক-মাকিন পারস্পরিক নিরাপত্তা চুক্তির মাধ্যমে (কমিউনিস্ট) আক্রমণ বিরোধিতার যে প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছে, তা কমিউনিস্ট আক্রমণ প্রতিরোধে অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিবন্ধক হিসেবে ভূমিকা রেখে চলেছে, এবং এর ফলে চুক্তিভুক্ত অঞ্চলে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।.........'

'.........কমিউনিস্ট প্রভাব ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের অনুপ্রবেশের ফলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে নিরাপত্তা ও সংহতির পথে যে হুমকির সৃষ্টি হয়েছে, তা নিয়ে তারা আলোচনা করেন। এ বিষয়ে তাদের মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয় যে পাকিস্তান এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই একযোগে প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে, যাতে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি স্বাধীনতা ও শান্তির সাথে নিজেদের অবস্থার উন্নতি বিধান করতে পারে।.........'[১৭৩]

মাকিন প্রেসিডেন্টের সাথে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সোহরাওয়ার্দী স্বয়ং এই ঘোষণায় স্বাক্ষর করেছিলেন, এর কোথাও ভারতের বিরুদ্ধে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বা যুদ্ধজোটগুলির সামান্য ভূমিকার সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করা হয়নি। বরং এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে কল্পিত কমিউনিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে 'শক্তিশালী প্রতিবন্ধক' হিসেবে ভূমিকা রাখার জন্যই যে যুদ্ধজোটগুলি পরিকল্পিত ও গঠিত হয়েছিলো সেকথাই তারা সদর্পে ঘোষণা করেছেন। শুধু তা-ই নয়, এগুলি যে কতটা 'ভারত বিরোধী' ছিলো তারও নিদর্শন রয়েছে যুক্ত ঘোষণাটিরই শেষদিকে ঃ কাশ্মির এবং সিন্ধুনদের পানি নিয়ে ভারতের সাথে পাকিস্তানের বিরোধের প্রসংগটি সোহরাওয়ার্দী উত্থাপন করলে 'প্রেসিডেন্ট আশা প্রকাশ করেন যে এই জাতীয় আঞ্চলিক বিরোধ সমূহ জাতিসংঘের নীতিমালার আলোকে সমতার

ভিত্তিতে স্থায়ীভাবে দ্রুত মীমাংসা করা হবে।'[১] অর্থাৎ পাক-ভারত বিরোধের প্রশ্নে আমেরিকা এমনকি সামান্য সমর্থন সূচক বক্তব্যও রাখেনি। এত কিছুর পরও সোহরাওয়ার্দী যুদ্ধজোট ও চুক্তিগুলিকে 'ভারত-বিরোধী' হিসেবে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন।

৩. ভারত বিরোধী প্রচারণার ফলাফল ঃ
প্রগতিশীলদের ওপর নির্যাতন

এবার দেখা যাক যে দেশটির বিরুদ্ধে এত উদ্যোগ-আয়োজন, সে ভারতের ব্যাপারে সোহরাওয়ার্দী কতটা সাফল্যলাভ করেছেন। ইতিপূর্বে আলোচনাকালে বলা হয়েছে যে পাকিস্তান আমেরিকার সাথে সামরিক চুক্তিতে জড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে কাশ্মিরে গণভোট অনুষ্ঠান প্রশ্নে ভারত তার অংগীকার অস্বীকার করার অজুহাত খুঁজে নিয়েছিলো, সিয়্যাটো এবং বাগদাদ চুক্তির পর রাশিয়াও চলে যায় ভারতের পক্ষে। সোহরাওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে ১৯৫৬ সনের ১৭ নভেম্বর কাশ্মিরের গণপরিষদ এক সিদ্ধান্তে ১৯৫৭ সনের ২৬ জানুয়ারী থেকে ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত হওয়ার পরিকল্পনা করলে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ভারত বিরোধী যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারে এগিয়ে আসেন সোহরাওয়ার্দী। সুযোগটি তিনি ভারতকে আক্রমণ করার চাইতে অনেক বেশী নিয়েছিলেন মওলানা ভাসানী সহ সামরিক চুক্তি তথা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের আঘাত করার উদ্দেশ্যে। এজন্যই একমাত্র জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব গ্রহণ করানো (২৪ জানুয়ারী, ১৯৫৭) ব্যতীত আর কোনো সাফল্য তিনি ভারতের বিরুদ্ধে অর্জন করতে পারেননি। তার এই না পারার কারণ ঃ চুক্তিগুলির লক্ষ্যস্থল আশলেই ভারত ছিলোনা, ছিলো রাশিয়া ও গণচীন সহ সমাজতান্ত্রিক নতুন দুনিয়া এবং সোহরাওয়ার্দী তা জানতেন বলেই চুক্তিগুলির শর্ত পূরণের উদ্দেশ্যে বহির্বিশ্বে ভারত বিরোধী কূটনৈতিক তৎপরতার চাইতে অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন তিনি দেশের অভ্যন্তরে আন্দোলনকারী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীদের উৎখাত করার প্রচেষ্টায়। এজন্যেই কাশ্মির উদ্ধার সম্ভব হয়নি, হওয়ার কথাও ছিলোনা। এর ফলে ভারতের বিরুদ্ধে চুক্তি গুলির অসারতা

ও সীমাবদ্ধতা যেমন প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি উন্মোচিত হয়েছিলো সোহরাওয়ার্দীর প্রকৃত স্বরূপও। মাঝখান থেকে ভারতের সাথে নতুন করে তিক্ততা বেড়েছিলো, ভারতই উল্টো সুযোগ নিয়েছিলো পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঃ ১৯৫৭ সনের ১৬ জানুয়ারী কোলকাতায় প্রধানমন্ত্রী নেহরু বলেছিলেন ঃ 'পাকিস্তান কাশ্মিরের একটি অংশ দখল করেছে, এবার সে সম্পূর্ণ রাজ্যটি দখল করতে চায়।' সোহরাওয়ার্দীর উগ্র এবং দাম্ভিক বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট পরিস্থিতিকে 'দু'দেশের সম্পর্কের ইতিহাসে শীতল লড়াই-এর সবচাইতে খারাপ অধ্যায়' আখ্যা দিয়ে নেহরু অভিযোগ করেছিলেন ঃ 'পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ সৌজন্যতার সকল সীমা অতিক্রম করে ফেলেছেন।'[১৭৪] নেহরুকে এই সুযোগটিই দিয়েছিলেন সোহরাওয়ার্দী।

মওলানা ভাসানী সহ প্রগতিশীলদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে সাময়িকভাবে সফল হলেও প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ভারত বিরোধী কোনো সাফল্য পাননি। 'অধিকৃত' কাশ্মির বরং তার শাসনামলেই আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের 'অন্তর্ভুক্ত' হয়েছিলো, কিংবা ভারতই তাকে স্থায়ীভাবে 'দখল' করে নিয়েছিলো। জাতিসংঘে ভোটদান এবং কাশ্মির ও খালের পানির মতো আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক সমস্যার' ব্যাপারে 'শুভেচ্ছাজ্ঞাপন' ব্যতীত আর কোনোভাবে আমেরিকা বা অন্য কোনো 'শক্তিশালী মিত্র' তার সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। আন্তর্জাতিক কুটনীতির এশীয় মঞ্চে আমেরিকার শিখণ্ডির ভূমিকা তিনি সাফল্যের সাথে পালন করেছেন, দেশের অভ্যন্তরেও মওলানা ভাসানীর মতো আবিষ্কৃত 'কমিউনিস্টদের' বিরুদ্ধে তার 'সাফল্য' ছিলো সর্বব্যাপী, তথাপি তার 'বৃহৎ বন্ধুরা' তাকে হতাশ করেছিলো। এই হালছাড়া হতাশার কথাই বেরিয়ে এসেছিলো সোহরাওয়ার্দীর মুখ দিয়ে ঃ ১৯৫৭ সনের ১ জুন তিনি এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ এ্যামেরিকার সাংবাদিকের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন ঃ 'খালের পানি বিরোধ ও কাশ্মির সমস্যা আমাদের ওপর সাঁড়াশি অভিযানের দু'টি দিক। কিন্তু আমরা কিছুই করিতে পারিনা। ভারত এতই শক্তিশালী যে আমেরিকা সহ প্রত্যেকেই তার বন্ধুত্ব কামনা করে।'[১৭৫]

বস্তুতঃ সোহরাওয়ার্দীর এই উপলব্ধিটি অত্যন্ত সঠিক ছিলো। ইতিপূর্বে আলোচনাকালে দেখা গেছে যে পাক-ভারত সৃষ্টির পর থেকে

বেশ কিছুদিন পর্যন্ত আমেরিকা কেবল ভারতকেই দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করেছে, পাকিস্তানের দিকে দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। সে অবস্থায় মার্কিন দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান সোভিয়েত নেতা স্ট্যালিনের আমন্ত্রণকে আমেরিকার সাথে দর কষাকষির বিষয় বানিয়েছিলেন। আমেরিকাও এ ঘটনা থেকে শিক্ষা নেয় ঃ মর্মাহত পাকিস্তানকে দলে ভিড়িয়ে খুশী করার পাশাপাশি পাক-মার্কিন সম্পর্ককে সেও আবার ভারতের সাথে দর কষাকষির বিষয়ে পরিণত করে। নতিস্বীকার না করলেও ভারত তার নিজের সামরিক প্রয়োজনেই আমেরিকার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে থাকে ঃ ১৯৫১ সনে স্বাক্ষরিত হয় ভারত-মার্কিন পারস্পরিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তি।[১১৬] কিন্তু সামরিক জোটের মতো শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা এতে ছিলোনা, এটা ছিলো ভারতের যথার্থ জোট নিরপেক্ষ নীতির এক বিরাট সাফল্য। মওলানা ভাসানী এমনিতর পররাষ্ট্রনীতিই চেয়েছিলেন- যাকে সোহরাওয়ার্দী 'সুবিধাবাদ' ও 'ব্ল্যাকমেলিং' আখ্যা দিয়েছেন।

৪. ভারতীয় নীতির সাফল্য ঃ আইউব খানের আক্ষেপ

আখ্যা যা-ই দেয়া হোকনা কেন, একথা কিন্তু প্রমাণিত হয়নি যে পাকিস্তান সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোটে সরাসরি অন্তর্ভুক্ত হয়ে খুব বেশী লাভবান হয়েছিলো, কিংবা ভারত কেবল পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করে পাকিস্তানের তুলনায় আমেরিকার কাছ থেকে কিছু কম আদায় করতে পেরেছে। সোহরাওয়ার্দীর বিরামহীন তৎপরতা সত্ত্বেও ভারত-মার্কিন সহযোগিতা অব্যাহতই ছিলো ঃ ১৯৫১ সনের সামরিক চুক্তিকে নবায়ন করা হয়েছিলো ১৯৫৮ সনেও। এরও পর ১৯৬২ সনে চীন-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে আমেরিকার নেতৃত্বে সাম্রাজ্য-বাদী শক্তির উদ্দেশ্য ও স্বার্থ অত্যন্ত নগ্নভাবে উন্মোচিত হয়ে পড়ে ঃ পাকিস্তানের সনির্বন্ধ বিরোধিতা সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের বিপুল পরিমাণ সমরাস্ত্র আসতে থাকে ভারতে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডী এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড ম্যাকমিলানকে এই সাহায্য প্রদান না করার জন্য প্রেসিডেন্ট আইউব খান নানাভাবে চেষ্টা করেছিলেন ঃ পাক-মার্কিন সম্পর্কের বয়েস, জোটের শর্তগত বাধ্যবাধকতার উল্লেখ

থেকে শুরু করে তাদের 'মিত্র' পাকিস্তানের বিপন্ন হওয়ার আশংকা পর্যন্ত জানিয়েছেন তিনি, কিন্তু লাভ হয়নি। সবশেষে চীনের আক্রমণের মুখে দুর্বলতার সুযোগে কাশ্মির সমস্যা সমাধানের তথা সাহায্যের পূর্বশর্ত হিসেবে কাশ্মির প্রশ্নে ফয়সালার সহজ সুযোগ গ্রহণের জন্য আকুতি পর্যন্ত ব্যক্ত করেছেন আইউব, কিন্তু জবাবে 'সন্ত্রস্ত না হওয়ার' উপদেশ এসেছে, পাকিস্তানকে 'আশ্বস্ত' করা হয়েছে।[১৭৫] পাকিস্তানের সে দুর্দশার অর্থ ছিলো ভারতের আর এক বিজয় ঃ সে বিজয় ভারতকে কাশ্মিরের ওপর দখল ও নিয়ন্ত্রণ সংহত করতে সাহায্য করেছে। অন্যদিকে এর মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে হলেও কাশ্মির প্রশ্নে আমেরিকা সহ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের দাবীকেই সমর্থন দিয়েছিলো। পাশাপাশি 'দেখার মতো চোখ থাকলে' পাকিস্তানের দেখা উচিত ছিলো যে বিশাল ভারতের তুলনায় সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের কাছে পাকিস্তানের মূল্য ছিলো আশলে কতটকু। সোহরাওয়ার্দী-দের নানাবিধ দাবী থাকলেও ঘটনাটি একথাই প্রমাণ করেছে যে ভারতের প্রশ্নই আসেনা, সিয়্যাটো সহ সকল চুক্তিরই তথা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির লক্ষ্যস্থল ছিলো সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া। এ জন্যেই গণচীনের বিরুদ্ধে অস্ত্রসাহায্যের বেলায় ভারতের কাছে তারা কোনো রকম পূর্ব-শর্তেরই উল্লেখ করেনি।

এখানেই শেষ নয়, ভারতের হুমকির কারণে সোহরাওয়ার্দী সহ পাকিস্তানের শাসকদের অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতির 'বন্ধ্যাত্ব' এবং ব্যর্থতা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে ১৯৬৫ সনের পাক-ভারত যুদ্ধকালেও। চীন-ভারত যুদ্ধের পর থেকে ভারত-মার্কিন বন্ধুত্বের নবতর অধ্যায়ে আমেরিকা এই উপ-মহাদেশে 'নিরপেক্ষ' হওয়ার প্রচেষ্টা নিয়েছে। আর সেজন্যই পাক ভারত যুদ্ধের সময় আমেরিকা উভয় দেশকেই অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। এর ফলে বেকায়দায় পড়ে পাকিস্তান, কেননা তার সকল অস্ত্র, গুলী ও যন্ত্রাংশের জন্যই তাকে তাকিয়ে থাকতে হতো 'মিত্র' আমেরিকার দিকে। অপরদিকে ভারতের প্রধান সরবরাহকারী দেশ ছিলো সোভিয়েত ইউনিয়ন, তদুপরী বৃটেন এবং ফ্রান্সের কাছ থেকেও ভারত সাহায্য পেয়েছে। ওই সাথে পাকিস্তানের একমাত্র সরবরাহকারী আমেরিকার নিরপেক্ষ' হয়ে যাওয়ার ঘটনাটিও ভারতের পক্ষেই গিয়েছিলো। 'অস্ত্র প্রতিযোগিতা নিরুৎ-সাহিত' করার নামে আমেরিকা বস্তুতঃ পাকিস্তানের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে

তুলেছিলো। এজন্যেই প্রথম থেকে সাম্রাজ্যবাদমুখী পররাষ্ট্রনীতির উদ্যোক্তা, নির্মাতা এবং পরবর্তীকালের দশকব্যাপী প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইউব খান ১৯৬৬ সনে প্রকাশ্যেই আক্ষেপ করেছেন : 'সেন্টো (সাবেক বাগদাদ চুক্তি) এবং সিয়্যাটো আমাদের প্রতিরক্ষায় কোনো সাহায্য করেনা ... ... গত বছর আমরা আক্রান্ত হলেও এগুলি সাহায্যে এগিয়ে আসেনি, (মিত্রদের) কেউ একটা আঙ্গুল পর্যন্ত তোলেনি, কেউ কিছুই করেনি।' ১৭৮ উল্লেখ্য যে, ১৯৬৫ সনের পাক-ভারত যুদ্ধের অবসানে মধ্যস্থতা করে পাকিস্তানকে বিপদমুক্ত করেছিলো তার 'অবন্ধুসুলভ প্রতিবেশী' সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমেরিকা বা অন্য কোনো 'মিত্র' দেশ নয়।

অর্থাৎ, প্রচুর বাগাড়ম্বর এবং উদ্যোগ-আয়োজন সহ সোহরাওয়ার্দী যে পররাষ্ট্রনীতির অনুসরণ করেছিলেন তা কোনো সাফল্যই আনতে পারেনি, এর ফলে বরং ভারত কাশ্মিরে তার নিয়ন্ত্রণকে সংহত করার লক্ষ্যে অগ্রসর হয়েছিলো অত্যন্ত দ্রুততার সাথে এবং পাকিস্তানের যুদ্ধবাদী মনোভাব, নীতি ও তৎপরতার অজুহাতে এক পর্যায়ে সে কাশ্মিরকে স্থায়ী ভাবে 'দখল'ও করে নিয়েছিলো। সোহরাওয়ার্দী তো বটেই, এমনকি আইউব খানের মতো ফিল্ড মার্শাল 'লৌহমানব', প্রয়োজনে 'ঘাস খেয়ে' যুদ্ধজয়ে প্রতিজ্ঞ জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং কঠিন 'ঈমানদার' জেনারেল জিয়াউল হকের মতো উত্তরসূরীরাও আর সে কাশ্মিরকে 'উদ্ধার' করতে পারেননি। এতটাই 'সফল এবং ফলপ্রসূ' ছিলো সোহরাওয়ার্দীর পররাষ্ট নীতি।

৫. মধ্যপ্রাচ্যে পাকিস্তানের ক্ষতিকর ব্যর্থতা

মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলিতেও সোহরাওয়ার্দীর পররাষ্ট্রনীতি ব্যর্থ এবং মারাত্মকভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলো। ওই অঞ্চলে প্রবাহমান পাশ্চাত্য বিরোধী প্রবল হাওয়ার পরিপন্থী সে নীতির অবাঞ্ছিততা প্রমাণিত হয়েছে সুয়েজ সংকটকালে, যখন জাতিসংঘ বাহিনীতে পাকিস্তানের সৈন্য গ্রহণে মিসর অস্বীকার করেছিলো। এরই পাশাপাশি বৃটেন, ফ্রান্স ও ইসরাইলের মিলিত ত্রিদেশীয় আক্রমণকালে মিসর সফরে আগ্রহী সোহরাওয়ার্দীকে প্রেসিডেন্ট নাসেরের প্রকাশ্য প্রত্যাখ্যান ছিলো আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পাকিস্তানের জন্য এক লজ্জাকর অপমান। অর্থাৎ বৃটেন ও আমেরিকা

সহ পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ প্রতিষ্ঠার শিখণ্ডি হিসেবে ভূমিকা রাখতে গিয়ে পাকিস্তান মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলির চোখে শত্রুর অনুচর হিসেবে ঘৃণিত হয়েছে। মুসলিম দেশগুলিকে অবমাননা করে উদ্ভাবিত সোহরাওয়ার্দীর 'শূন্যতত্ত্ব' এই ঘৃণাকে ক্রোধের পর্যায়ে উন্নীত করেছিলো। আর সে সুযোগ গ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছিলো ভারত ঃ সম্পদশালী মধ্যপ্রাচ্যের ব্যবসা বাণিজ্য থেকে কূটনৈতিক নেতৃত্ব পর্যন্ত গিয়েছিলো 'হিন্দু' ভারতের দখলে। 'মুসলিম' দেশ পাকিস্তান কোনো ফায়দাই নিতে পারেনি। সোহরাওয়ার্দীর 'সাফল্য' এটাই ছিলো যে 'মুসলিম বিশ্বে শান্তি ও অগ্রগতি নিশ্চিত' করতে তৎপর একটি মুসলিম দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েও তার জুটেছিলো ঘৃণাভরা প্রত্যাখ্যানের মতো অপমান, নেহরু সেখানে আদৃত হয়েছেন জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতা হিসেবে, সম্মানিত হয়েছেন 'শান্তির দূত' আখ্যায়। উল্লেখ্য যে, মওলানা ভাসানীও তার বাগদাদ চুক্তি সহ সাম্রাজ্য-বাদ বিরোধিতার জন্য মধ্য প্রাচ্যে জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন ঃ প্রধানত সুয়েজ সংকটকালে তার নেতৃত্বে পাকিস্তানে গড়ে ওঠা গণআন্দোলনের কারণে বিশেষ করে মিসর তাকে বেশ কয়েকবার সেদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানায়। ১৯৫৮ সনে সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে যোগদান শেষে লণ্ডন গেলে মিসরীয় রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নাসের তাকে মিসর যাওয়ার জন্য সবিশেষ অনুরোধ জানান। মিসর সফরকালে নাসেরকে তিনি পাকিস্তানের জনগণের পক্ষ থেকে সমর্থনের আশ্বাস প্রদান করেন।[১৭৯]

উত্তরসূরী আইউব খানের আমলে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে পাকিস্তানের সর্বাত্মকভাবে ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা থেকেও শূন্যতত্ত্বের প্রবক্তা সোহরা-ওয়ার্দীর অনুসৃত নীতির ব্যর্থতা ও অবাস্তবতা প্রমাণিত হয়েছে। 'পাকি-স্তান মুসলিম বিশ্বের কল্যাণের যে দৃষ্টিভংগী থেকে বাগদাদ চুক্তিতে যোগ দিয়েছিলো পাশ্চাত্যের দেশগুলির উদ্দেশ্য তেমনটি ছিলোনা'— একথাটি আইউব খান অনেক পরে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ফলে তার 'সাধারণ জ্ঞান' তাকে এই 'নির্দেশই' দিয়েছিলো যে 'পাকিস্তা-নের এমন এক বৃহত্তর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত, যার ব্যাপ্তি থাকবে ক্যাসাব্লাংকা থেকে জাকার্তা পর্যন্ত।' শুধু তা-ই নয়, আইউব খানের মতে এর কেন্দ্র হতে হবে মিসরকে এবং নেতৃত্ব তথা

নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নিতে হবে প্রেসিডেন্ট নাসেরকে—যার হাতে পররাষ্ট্রনীতির সাফল্যের দাবীদার সোহরাওয়ার্দী অপমানিত হয়েছিলেন। নাসেরকে আইউব 'গোটা অঞ্চলের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি' হিসেবেও বর্ণনা করছেন।[১৮০]

অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্যের প্রশ্নেও বাগদাদ চুক্তি প্রভাবিত সোহরাওয়ার্দীর অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতি কেবল ব্যর্থ ও বন্ধ্যাই প্রমাণিত হয়নি, পাকিস্তানের জন্য ক্ষতিকর ও অকল্যাণকর হিসেবেও চিহ্নিত হয়েছে। সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে না পারলেও আইউবের আমলে তাই বাগদাদ চুক্তির প্রভাব বলয় থেকে মুক্তি লাভের প্রচেষ্টা গৃহিত হতে থাকে ঃ ১৯৬০ সনের এপ্রিলে প্রেসিডেন্ট নাসেরের পাকিস্তান সফরের মধ্য দিয়ে এর সূচনা ঘটে। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, ১৯৫৭ সনের ১৪ জুলাই ব্রিগেডিয়ার আবদুল করিম কাশেম ও আবদুস সালাম আরিফের নেতৃতে সংঘঠিত এক অভ্যুত্থানে বাগদাদ চুক্তির অন্যতম নায়ক ইরাকের প্রধানমন্ত্রী নূরী আস-সাইদ রাজপরিবারের সদস্যদের সাথে নিহত হওয়ার পর ইরাক তার সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নেয় এবং বাগদাদ চুক্তির নতুন নামকরণ করা হয় 'সেন্ট্রাল ট্রিটি অরগানাইজেশন' বা 'সেন্টো'। জানা যায় ঃ ইরাকের নতুন নেতা ব্রিগেডিয়ার কাশেম বাগদাদ চুক্তির সমুদয় দলিল পত্র নাসেরের কাছে 'উপহার' হিসেবে পাঠিয়ে কূটনৈতিক রসজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন।[১৮১]

৬. সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সাথে তিক্ততা ঃ
প্রতিবেশীদের অবিশ্বাস

সোহরাওয়ার্দী অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতির ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণচীন সহ সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সাথেও পাকিস্তানের সম্পর্কে তিক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছিলো। রুশ-মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সে শীতল যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সম্পাদিত জোটগুলিকে, বিশেষ করে সিয়াটোকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সরাসরি তার বিরুদ্ধে গঠিত আঁতাত হিসেবে গণ্য করেছে। ফলে, জুলফিকার আলী ভুট্টোর মতে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা শক্তি বৃদ্ধি পেলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সমাজতান্ত্রিক

ও জোটনিরপেক্ষ বিশ্বের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্কে অযথা জটিলতা এসেছিলো। [১৮২] প্রাথমিক ভুল বোঝাবুঝির অবসান শেষে রাশিয়া বিভিন্ন সময়ে পাকিস্তানের প্রতি তার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু সামান্য সংখ্যক শিল্প ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করলেও সেগুলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পাকিস্তান ঔদাসীন্য দেখিয়েছে, সম্পাদন করেছে 'অর্দ্ধ হৃদয়' দিয়ে। [১৮৩] জেনারেল আইউবের ভাষায় এই মানসিকতা ও কার্যক্রমের ফলাফল ছিলো পাকিস্তানের জন্য 'বিরাট লোকসান'। [১৮৪] অথচ সোহরাওয়ার্দী এই নীতিতেই অবিচল ছিলেন, তদুপরী রাশিয়া ছিলো তার মতে 'অবন্ধুসুলভ প্রতিবেশী'। আমেরিকার পরামর্শে সোহরাওয়ার্দীও 'উত্তর দিক থেকে আক্রমণের' কাল্পনিক সম্ভাবনায় আতংকিত হয়েছেন, অনেক সময় প্রকাশ্যেই হুমকি উদ্গীরণ করেছেন। আর এর ফলে দু'দেশের তিক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেক্ষেত্রেও সুযোগ নিয়েছে ভারতই। আমেরিকার সাথে সামরিক চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে লাভবান ভারত তার জোটনিরপেক্ষতার কারণে রাশিয়ারও পরিপূর্ণ সহযোগিতা লাভ করেছেঃ ভারী শিল্প থেকে সমরাস্ত্র কারখানা পর্যন্ত বিপুল শিল্প ভারত গড়ে তুলছে সোভিয়েত সহযোগিতায়। তার শিল্পায়ন হয়েছে দ্রুত এবং সর্বব্যাপী। কৃষিতেও তার উন্নতি ছিলো অকল্পণীয়। একই সাথে কাশ্মির সহ পাক-ভারত সম্পর্কের মধ্যে বিরাজমান সমস্যা সমূহের প্রশ্নেও সোভিয়েত ইউনিয়ন তার অবলম্বিত নিরপেক্ষতা পরিত্যাগ করে সরাসরি ভারতের পক্ষে চলে গিয়েছিলো। শুধু তা-ই নয়, জোটনিরপেক্ষ বিশ্বের নেতৃত্বে ভারতের প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির পেছনেও সর্বান্তকরণে ছিলো সোভিয়েত সহযোগিতা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি সোহরাওয়ার্দীর নীতি ও মনোভাবের ফলাফল পরবর্তীকালের পাকিস্তানকে ভোগ করতে হয়েছিলো। বিশেষ করে ১৯৬৫ সনের পাক-ভারত যুদ্ধের দিনগুলিতে বিপন্ন অবস্থায় সোভিয়েতের দ্বারস্থ হওয়ার ঘটনাটি সোহরাওয়ার্দীর অনুসৃত নীতির চূড়ান্ত এবং ক্ষতিকর ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। সোহরাওয়ার্দীর নীতির সে ক্ষতি ছিলো সুদূরপ্রসারী ফলশ্রুতিবাহী, পাকিস্তান তার প্রমাণ পেয়েছে ১৯৭১ সনেও ঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের বলিষ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতাই বাংলাদেশের অভ্যুদয় তথা পাকিস্তানের বিনাশের

কারণ ঘটিয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই আমেরিকা সহ সোহরাওয়ার্দীর 'শক্তি-শালী মিত্র'দের ভূমিকার দৌরাত্ম ছিলো কাগজে কলমে এবং তা'ও জাতি-সংঘের অভ্যন্তরেই কেবল।

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার উদীয়মান শক্তি গণচীনও পাকিস্তানকে নিঃশংক-চিত্তে গ্রহণ করতে পারেনি। সীমান্ত সমস্যার কারণে ভারত বিরোধিতায় মতৈক্য থাকলেও পাকিস্তানের মার্কিনমুখী নীতির অন্যতম লক্ষ্যস্থল হওয়ায় এবং সামগ্রিকভাবে সোভিয়েত প্রভাব বলয়ে থাকায় সোহরা-ওয়ার্দীর আমলে গণচীনের সাথে সম্পর্কোন্নয়ন ব্যাপকভাবে সম্ভব হয়নি। ১৯৫৬ সনের ২২ অক্টোবর থেকে সোহরাওয়ার্দীর চীন সফরের জবাবে প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ডিসেম্বরে পাকিস্তান সফর করলেও সামরিক চুক্তি ও জোটগুলির কারণে পাকিস্তান কোনোদিক থেকেই লাভবান হতে পারেনি। সোহরাওয়ার্দী অনুসারী মানিক মিয়া তার গ্রন্থে জানাচ্ছেন [পৃঃ-১৫৫] ঃ পূর্ব বাংলা সফরকালে ঢাকায় চৌ এন লাইকে যে সম্বর্ধনা দেয়া হয় তেমনটি আর কোনো বিদেশী রাষ্ট্র-নায়ককেই দেয়া হয়নি। 'এতদসত্বেও', মানিক মিয়া বলছেন ঃ 'পাকিস্তান সম্পর্কে চীনের নীতির কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা তার নিকট হইতে আদায় করা সম্ভব হয় নাই। বরং স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসমাবেশে চীনের প্রধানমন্ত্রী সেইদিন সিয়াটো সেন্টো চুক্তির কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন।' পরবর্তীকালে ১৯৬২ সনের চীন-ভারত যুদ্ধের সুযোগে এবং ভারতের প্রতি বৃটিশ-মার্কিন সহযোগিতার অজুহাতে আইউব খান পূর্বানুসৃত নীতির পরিবর্তন ঘটান। গণচীন বরং বিভিন্ন দুঃসময়ে পাকিস্তানের ভালো বন্ধু হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছে। এই আলোকে তাই বলা যায় যে, চীন-রাশিয়া সহ সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াকে সমষ্টিগত-ভাবে ঘেরাও করার লক্ষ্যে প্রণীত সামরিক চুক্তিগুলির সমর্থনে সোহ-রাওয়ার্দীর নীতি পাকিস্তানের জন্য কল্যাণকর হতে পারেনি। উল্লেখ্য যে, আফগানিস্তান তো বটেই, সোহরাওয়ার্দীর এই নীতির ফলে নেপাল, বার্মা, শ্রীংলকা এবং ইন্দোনেশিয়া সহ জোটনিরপেক্ষ প্রতিবেশী কোনো একটি দেশের সাথেই পাকিস্তানের সম্পর্কে 'সুস্থতা' ছিলোনা।[১৮৫]

ওপরের পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, পূর্ব বাংলার তো বটেই, এমনকি পাকিস্তানের দৃষ্টিকোণ থেকেও সোহরাওয়ার্দীর অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতি কোনো দিক দিয়েই সাফল্য আনতে

পারেনি। এর ফলে একই সাথে প্রতিবেশী ভারত সহ জোটনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক এবং মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি দেশের সাথেই পাকিস্তানের সন্দেহ, তিক্ততা ও শত্রুতা বৃদ্ধি পেয়েছে, আর সেজন্যই কোনো লাভের পরিবর্তে নীতিটি পাকিস্তানের জন্য এক 'ক্ষতিকর বোঝায়' পরিণত হয়েছিলো।[১৮৬] পাকিস্তানকে এই ক্ষতির বোঝা টানতে হয়েছে দীর্ঘদিন ব্যাপী ঃ এর চরম খেসারত দিতে হয়েছে ১৯৭১ সনে বাংলাদেশকে হারানোর মধ্য দিয়ে। সোহরাওয়ার্দীর নীতির বন্ধ্যাত্বের আর এক প্রমাণ ঃ যে জোটনিরপেক্ষতার আন্দোলন করার দায়ে মওলানা ভাসানী সহ প্রগতিশীলদের বিরুদ্ধে তিনি খড়্গহস্ত হয়েছিলেন, পাকিস্তানকে সেই জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনেরই সাধারণ সদস্যপদের জন্য ভিখেরীর মতো দাঁড়াতে হয়েছিলো, ভারত সেখানে ছিলো সিদ্ধান্ত দেয়ার মর্যাদা ও ক্ষমতার আসনে এবং ফলে ভারতের অনুগ্রহেই পাকিস্তানকে ধন্য হতে হয়েছে।

৭. মানিক মিয়ার 'দার্শনিক' বক্তব্য ঃ
ব্যর্থতার স্বীকৃতি

এখানে প্রসংগক্রমে সোহরাওয়ার্দী অনুসারী তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার খুবই কৌতুহলোদ্দীপক বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। 'পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন ঃ "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন দুনিয়ার মোড়ল বনিয়াছে। বিশ্বে গণতন্ত্র এবং মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ তাদের নীতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। অনুন্নত দেশকে তারা উন্নতি অগ্রগতির পথে পরিচালিত করার জন্য অর্থনৈতিক তথা সার্বিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

"যেহেতু আমরাও গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার প্রতি আগ্রহশীল ছিলাম এবং ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের দৌলতে দারিদ্রের চরম প্রান্তে পৌঁছিয়াছিলাম, সেইহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষিত মুলনীতির প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই আমরাও আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত পাকিস্তানের আঁতাত গড়িয়া উঠে। ভারত-ভীতি এবং আত্মরক্ষার তাগিদে সামরিক জোটকেও পাকিস্তান কল্যাণকর বলিয়া

মনে করে। কিন্তু কিছুকাল অতিক্রান্ত না হইতেই দেখা গেল এই অঞ্চলে এবং বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলেও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা তার বিঘোষিত নীতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে যুগ যুগ ধরিয়া যুক্তরাষ্ট্র যে 'গানবোট' কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তথায় একনায়কত্ববাদ ও পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রভুত্ব কায়েম করিয়াছে, কালক্রমে মাকিন প্রভাবিত এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশেও সেই নীতি আত্মপ্রকাশ করিতে শুরু করিয়াছে। দুনিয়ার মানচিত্রের উপরে চোখ বুলাইলে দেখা যাইবে, যে সকল দেশের সহিত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য ও সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে, সে সব দেশের কোথাও গণতন্ত্রের নাম-নিশানা কিংবা কল্যাণমুখী অর্থনীতির চিহ্নমাত্র নাই।

"ঔপনিবেশিকবাদের কবল হইতে মানব স্বাধীনতা রক্ষার ওয়াদা ও গণতন্ত্রের মহান নীতি ঘোষণা করিয়া যে ভিয়েতনামে তারা ১৯৫৬ সালে অবতরণ করিয়াছিল সেই ভিয়েতনাম আজ মাকিন রণক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। শুধু ভিয়েতনামেই নয়, এশিয়ার যে সকল দেশে গণতন্ত্রের উলট-পালট ঘটিয়াছে, তার সর্বত্রই মাকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রধানতঃ জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী শক্তির অনুকূলেই সমর্থন যোগাইতেছে। হোয়াইট হাউস হইতে গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং গণ-তন্ত্রের স্বার্থে তারা লড়াই করিতেছে বলিয়া তারস্বরে প্রচার করিলেও বিভিন্ন রাষ্ট্রে মাকিন কূটনীতিকরা বৃটেনের সুরে সুর মিলাইয়া বলিতেছেন যে, সেখানকার জনসাধারণ অজ্ঞ, অশিক্ষিত, দরিদ্র ও অসংস্কৃতমনা বলিয়া গণতন্ত্রের অযোগ্য। তাই মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিঘোষিত নীতি, যা কিনা প্রকৃত প্রস্তাবে তাদের গণতন্ত্র বিরোধী নীতি, তাদের প্রতি বহির্বিশ্বের জনসাধারণকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছে। এই জন্য তাদের নীতিই দায়ী।" (পৃঃ ১৩৩-৩৪)

মানিক মিয়া তার অভিমত ব্যক্তকালে আরো বলেছেন: "…… … … … যাহোক, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৃহত্তর শক্তিবর্গের আদর্শের ভিত্তিতে হোক বা নেতৃত্বের কারণেই হোক, আজ যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছে সেই দ্বন্দ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির জড়াইয়া না পড়া বা ইহাদের কারো উস্কানীর খপ্পরে না পড়াই বিধেয়। বর্তমান বিশ্বে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র-গুলির পক্ষে নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন।" (পৃঃ-১৩৭)

এরপর নিশ্চয়ই মানিক মিয়ার মনে 'লীডার' সোহরাওয়ার্দীর এবং নিজেরও অতীত ভূমিকা ও কীর্তির কথা জেগে উঠেছিলো, আর তাই তিনি মিথ্যে বলতে গিয়ে পরস্পর বিরোধী 'দার্শনিক উক্তি' করেছেন : "... ... ... অবশ্য নিরপেক্ষতার অর্থে নিষ্ক্রিয়তা বুঝাইতেছিনা। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভাষায় 'সকলের সহিত মৈত্রী, কারও প্রতি বিদ্বেষ নয়' ইহাই হইল রাষ্ট্রীয় নিরপেক্ষতার মর্মকথা। মোটকথা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ও মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে যখন যে নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন তখন সেই নীতি অনুসরণ করাই নিরপেক্ষতা; কিন্তু বৃহত্তর শক্তিবর্গের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে নিজকে জড়িত করা কোন ক্রমেই উচিত নয় যে একজনকে মিত্র হিসাবে পাইলেও অন্যজন শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে।" (পৃঃ ১৩৭-৩৮)

বক্তব্যের এই পর্যায়ে মানিক মিয়া সজ্ঞানে অত্যন্ত শঠতার সাথে মিথ্যে কথা বলেছেন ঃ সোহরাওয়ার্দীকে মহাপুরুষ বানানোর অসৎ নিয়তে তার নামে এমন একটি উক্তি অবলীলাক্রমে চালিয়ে দিয়েছেন—যেটা সোহরাওয়ার্দী আদৌ বলেননি, একথা তার মুখে সাজেনা, কিংবা বললেও তার অবস্থান ও তৎপরতাগত পক্ষপাতিত্বের ফলে কথাটার বৈধতাই থাকতে পারেনা। কারণ, মানিক মিয়া বৃহত্তর শক্তিবর্গের দ্বন্দ্বে জড়ানোর যে নীতিকে 'কোন ক্রমেই উচিত নয়' বলেছেন, তার লীডার সোহরাওয়ার্দী তেমন একটি ভয়ংকর নীতিরই উদ্ধত প্রবক্তা ছিলেন। মানিক মিয়ার সেকথা ভুলে যাওয়ার কথা নয়, কেননা তিনি নিজেও সেদিন সোহরাওয়ার্দীর অন্যতম সমর্থক হিসেবে কলম যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। লক্ষ্যনীয় যে, সজ্ঞানে এবং অকপটভাবে না হলেও মানিক মিয়ার এই ভাষ্যে সোহরাওয়ার্দী অনুসৃত পররাষ্ট্র-নীতির ব্যর্থতাই খুব পরিষ্কারভাবে চিত্রিত হয়েছে। মার্কিন তথা সাম্রাজ্যবাদী নীতির ক্ষতিকর সেই দিকগুলির কথাই মানিক মিয়া বলেছেন—যেগুলি তখন মওলানা ভাসানীর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হতো, জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির দাবীও ছিলো এ কারণ থেকেই উত্থাপিত। মওলানা ভাসানীর সে-আন্দোলনকে তখন তিনি 'হৈ চৈ' মনে করতেন ঃ "......... এবং এই প্রদেশের তথাকথিত বামপন্থী-দের নেতা বলিয়া কথিত অদূরদর্শী ব্যক্তিরা সিয়াটো চুক্তি ও বাগদাদ চুক্তি বাতিলের দাবীতে হৈ-চৈ শুরু করিল।"(পৃঃ ১১০)

এখানে পার্থক্য কেবল একটি ব্যাপারেই, আর তা হলো সময়ঃ সাম্রাজ্যবাদের নীতি ও উদ্দেশ্যের যে পরিণতির কথা অনুধাবন করে বৃটিশ শাসনের যুগ সহ ১৯৪৮ সন থেকে মওলানা ভাসানী তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন, সঠিক সময়ে স্বার্থের প্রয়োজনে তাকেই মানিক মিয়ার মনে হয়েছে 'অদূরদর্শী ব্যক্তিদের হৈচৈ'। তিনি এজন্যে এত বেশী ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন যে মওলানা ভাসানীর মতো নেতাদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে তার কলমে 'করিলেন' আসেনি, লিখেছেন 'করিল'। সেদিন প্রবল বিরোধিতা ও অসম্মান করার পর মওলানা ভাসানীর বক্তব্যের যৌক্তিকতা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন জীবনের শেষ দিনগুলিতে, ১৯৬৭ সনে এসেঃ বিশটি বছর সময় লেগেছিলো এই 'দূরদর্শী' মহাজ্ঞানীর। এটা তাই বলে 'স্টেটসম্যান রাজনীতিবিদ' মানিক মিয়ার মৌলিক নীতিগত পরিবর্তনের কোনো সূচক নয়, সোহরাওয়ার্দীর নীতির অনিবার্য পরিণামে সাম্রাজ্যবাদী মদদে যে-পাকিস্তান শক্তিশালী হয়েছিলো তার পরবর্তী সামরিক শাসকদের হাতে তাকে নাজেহাল হতে হয় এবং তাই তার এমন 'দার্শনিক' বক্তব্য। অর্থাৎ এটা তার অত্যাচার গ্রস্থ মস্তিষ্কের প্রলাপ জাতীয় চিন্তাভাবনা, হৃদয়গত তথা দেশ বা মানবপ্রেমসঞ্জাত কোনো ধারণা বা বিশ্বাস নয়। হলে সোহরাওয়ার্দীর ত্রুটি ও অন্যায়গুলি তার চোখে পড়তো, লেখায়ও আসতো। কিন্তু তা হয়নি, বরং এত কিছুর পরও মিথ্যে বক্তব্য আরোপ করার মধ্য দিয়ে তিনি ব্যর্থ ও ক্ষতিকারী সোহরাওয়ার্দীকেই পূজনীয়ের আসনে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছেন। পররাষ্ট্রনীতির মতো মৌলিক বিষয়গুলিতে পূর্ব বাংলার স্বার্থবিরোধী প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে পরবর্তীকালে আক্রান্ত মস্তিষ্কের চাপে রাজনীতির উপরিকাঠামোতে মানুষের সপক্ষে কলম ধরার ভণিতা করলেও মানিক মিয়ার মতো সোহরাওয়ার্দীর বুদ্ধিমান অনুসারীরা অত্যন্ত সচেতনভাবে এদেশের অনেক ক্ষতির কারণ ঘটিয়ে গেছেন।

৮. শেখ মুজিবের পূর্ব বাংলা বিরোধী ভূমিকাঃ
২১ দফা থেকে ৬ দফা

প্রসংগতঃ আতাউর রহমান খান এবং শেখ মুজিবুর রহমানের

তৎকালীন ভূমিকাও লক্ষ্যনীয়। আতাউর রহমান নীতিগত ভাবেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছিলেন না, তদুপরী সুবিধাবাদী অনুচরসুলভ মনোবৃত্তি সর্বকালেই ছিলো তার চরিত্রের নিয়ন্ত্রক [১৯৭১ এবং ১৯৮৩ পরবর্তী দাসত্বের রাজনীতির কথা স্মর্তব্য] এবং তাই পূর্ব বাংলার প্রশ্নে তার ভূমিকা অনুকূল হওয়ার কারণ ঘটেনি। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন সময়ে স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, অন্ততঃ আন্দোলনে জড়িত থাকার ভণিতা করেছেন। স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে প্রাদেশিক পরিষদে সরকারীভাবে প্রস্তাব না আনার ষড়যন্ত্রে আতাউরের সাথে গোপনে ভূমিকা রাখলেও পরিষদে উত্থাপিত বেসরকারী প্রস্তাবের সপক্ষে তিনি বক্তব্য রেখেছিলেন অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে। তার ভূমিকা তথাপি সন্দেহাতীত হয়নি মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে সোহরাওয়ার্দীর পক্ষাবলম্বন করায় ঃ সাম্রাজ্যবাদী জোটমুখী পররাষ্ট্রনীতির পরিণামে যে স্বায়ত্তশাসনে অর্জন করা সম্ভব নয় এবং ভারত বিরোধিতার নামে সংগৃহিত অস্ত্র যে পূর্ব বাংলার কন্ঠরোধের কাজেই ব্যবহৃত হবে- মওলানা ভাসানীর এই কথাটি তিনি না বোঝার ভান করেছেন। সোহরাওয়ার্দীর প্রতি আনুগত্য এবং অলী আহাদ সহ কতিপয় প্রগতিশীলের সাথে ব্যক্তিগত কোন্দলের কারণে তিনি পূর্ব বাংলার স্বার্থ-বিরোধী অবস্থানে চলে গেছেন, ওই সাথে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তার নিজের ধ্যান-ধারণাও কম ভূমিকা রাখেনি। একথা প্রমাণিতও হয়েছে যে, সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা ব্যতীত পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন অর্জন তখন সম্ভব ছিলোনা, পরবর্তীকালেও সম্ভব হয়নি। আর তাই সোহরাওয়ার্দীর পররাষ্ট্রনীতির সমর্থনে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণের পাশাপাশি সময়ে সময়ে স্বায়ত্তশাসনেরও দাবী তোলার অর্থ ছিলো সুবিধাবাদী ও শঠতাপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ, স্বায়ত্তশাসন বা পূর্ব বাংলার অধিকারের দাবীতে আন্তরিকতার সাথে ভূমিকা পালন নয়। এটা অনেকটা তলে তলে গাছের গোড়া কেটে ওপরে পানি ঢালার মতো অসৎ কর্ম করা।

কন্ঠে দাবী থাকলেও মুজিবের সেকালের ভূমিকা তাই পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে আসেনি, বরং তার সম্ভাবনাকেই বহুদূর পিছিয়ে দিয়েছিলো। অন্যদিকে ইতিহাসে মওলানা ভাসানীর

ভূমিকাই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে : সোহরাওয়ার্দীর চেষ্টায় গড়ে ওঠা শক্তিশালী কেন্দ্র পরবর্তীকালে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নেই মুজিবকে নির্মমভাবে নির্যাতন করেছে। তখনো মুজিবের তথা স্বায়ত্তশাসনের সপক্ষে সর্বাগ্রে এগিয়ে এসেছেন মওলানা ভাসানীই। কিন্তু স্বায়ত্ত-শাসনের দাবীতে আন্দোলনের সে প্রাথমিক যুগে সমর্থনে এগিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে শেখ মুজিবুর রহমান মওলানা ভাসানীকে তথা পূর্ব বাংলার দাবীকে অবদমনের ফ্যাসীবাদী প্রক্রিয়ায়ই অংশ নিয়েছিলেন। এর ফলে পূর্ব বাংলার স্বার্থবিরোধী কেন্দ্রকে শক্তিশালী করার প্রস্তুতি-পর্বে পাকিস্তানকেই সহায়তা করা হয়েছিলো।

পরবর্তীকালে ষাটের দশকে বাঙালী জাতীয়তাবাদের 'প্রবক্তা' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত শেখ মুজিবুর রহমান মওলানা ভাসানীর মতো নীতি, অবস্থান ও ভূমিকার ধারাবাহিকতা রাখতে পারেননি। ১৯৬৬ সনে তিনি যে ৬ দফা পেশ করেন, তার মধ্যে নতুন এমন কোনো প্রসংগই আসেনি, যা পঞ্চাশের দশকে ভাসানীর স্বায়ত্তশাসন দাবীর অন্ত-র্ভুক্ত না ছিলো। মূলতঃ যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার ১৯তম দফার সম্প্রসারিত রূপই ছিলো ৬ দফা। দেশ রক্ষা, মুদ্রা ও পররাষ্ট্রনীতিকে যেখানে মওলানা ভাসানী কেন্দ্রের হাতে রাখতে চেয়েছেন, মুজিব সেখানে কেবল মুদ্রার ব্যাপারে ভিন্ন কথা বলেছেন (৩য় দফা) : 'দুটি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য' কিংবা 'পাচারের বিরুদ্ধে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সহ' একই মুদ্রা চালু রাখার প্রস্তাব তিনি দিয়েছিলেন।[১৮৭] স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে ষাটের দশকে বিশেষ করে ১৯৬৫ সনের পাক ভারত যুদ্ধ পরবর্তী অনুকূল পরিপ্রেক্ষিত মুজিবকে সহায়তা করেছিলো, সেটা ভিন্ন প্রসংগ, কিন্তু মওলানা ভাসানীর 'ব্যর্থতার' পেছনে সে সময় আরো অনেকের মতো সোহরাওয়ার্দীর অনুসারী মুজিবও যে অত্যন্ত ক্ষতিকর ভূমিকা রেখেছিলেন সেকথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। মুজিবের সাফল্যের পেছনে মওলানা ভাসানীর অবদান ছিলো বিপুল। কিন্তু মুজিব সে সময় মওলানা ভাসানীর পাশে না দাঁড়িয়ে পক্ষ নিয়েছিলেন সেই সোহরাওয়ার্দীর, যিনি সকল দিক থেকেই পাকিস্তানের কেন্দ্রকে শক্তিশালী করে গেছেন। অবস্থানগত দিক থেকে নিজের পরিবর্তন আনতে মুজিবের একটি সম্পূর্ণ যুগ সময় লেগেছিলো,

অবশ্য এক্ষেত্রেও তার দৃষ্টিভংগী এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য তর্কাতীত নয়, বিশ্লেষণ সাপেক্ষ, বর্তমান আলোচনায় তার অবকাশ নেই।

৯. নিজের নীতির পরিণতিতে সোহরাওয়ার্দী

এ পর্যন্ত উপস্থাপিত আলোচনার ভিত্তিতে সোহরাওয়ার্দী অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত আলোচনার উপসংহারে সংক্ষেপে বলা যায়ঃ ভারত বিরোধী প্রস্তুতির অজুহাতে তিনি কেবল দক্ষিণ এশিয়ায় সমাজ-তন্ত্রের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তিকে প্রতিহত করার সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রে বিশ্বস্ত অনুচরের ভূমিকা পালন করে গেছেন। এর ফলে পাকিস্তানও কোনো দিক থেকে উপকৃত হয়নি, হয়েছে ক্ষতিগ্রস্থ : সে ক্ষতির মাশুল পাকি-স্তানকে টানতে হয়েছে দীর্ঘ দিনব্যাপী। পূর্ব বাংলার জন্য সোহরাওয়ার্দীর নীতির ফলাফল হয়েছিলো ভয়ংকর এবং বিষময়। নিজের নীতির সমর্থনে অবস্থান গ্রহণ করতে গিয়ে পূর্বসূরী পাকিস্তানী শাসকদের মতো তিনিও পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন সহ অধিকারের দাবী সমূহকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' আখ্যায়িত করে দমন করেছিলেন কঠোরভাবে। সরল সমীকরণের মতো অংকের নিয়মে তিনি স্বায়ত্তশাসন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির দাবীকে ভারতমুখীনতা বা ভারতের অনুচরবৃত্তি বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন, এক্ষেত্রে নিজের অভিজ্ঞতার কথা তার মনে জাগেনি। ক্ষমতার মদমত্ততা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক, শোষক, সেনাবাহিনী ও সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় মওলানা ভাসানী ও তার অনুসারীদের দমনে সাময়িকভাবে 'সফল' হলেও অনুচরের এই ভূমিকা তার নিজের জন্যও মংগল বয়ে আনেনি। ক্ষমতার প্রকৃত নিয়ন্ত্রকরা বরং পূর্ব বাংলাকে অবদমনের কৌশল হিসেবে এদেশেরই 'প্রতিনিধি' সোহরাওয়ার্দীকে ব্যবহার করেছে সাফল্যের সাথে, তিনিও তাদের সে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগী হতে গিয়ে সওয়ার হয়েছিলেন পূর্ব বাংলায় তার অনুসারীদের ওপর। তার এই ভূমিকার ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানের নামে পূর্ব বাংলা বিরোধী কেন্দ্র তথা পশ্চিম পাকিস্তান শক্তিশালী হয়েছে। আর সে শক্তিই পরবর্তীকালে ব্যক্তি হিসেবে সোহরাওয়ার্দীকে এবং সেই সাথে আওয়ামী লীগকেও

দমন করেছে কঠিনভাবে ঃ তারই এককালীন সহযোগী, পরামর্শদাতা এবং নিয়ন্ত্রক জেনারেল আইউব খান তাকে প্রথমবারের মতো কারাগারে ঢুকিয়েছিলেন (৩০ জানুয়ারী, ১৯৬২ ঃ মুক্তিলাভ ১৯ অগাস্ট ১৯৬২)। ভাগ্যের পরিহাস : যে কেন্দ্রকে শক্তিশালী করার জন্য তার প্রচেষ্টা ছিলো বিরামহীন, সে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন উত্তরসূরীর কারানির্যাতন জনিত অসুস্থতাই সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর কারণ ঘটিয়েছিলো (৫ ডিসেম্বর ১৯৬৩ ঃ বৈরুত লেবানন)।

৬

সোহরাওয়াদী'র বাঙালী-বিরোধী ষড়যন্ত্র ঃ আওয়ামী লীগের পতন

পাকিস্তানকে শক্তিশালী করার অজুহাতে পূর্ব বাংলার স্বার্থবিরোধী কার্যক্রম তথা সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে যুদ্ধবাদী পররাষ্ট্রনীতির অনুসরণ সোহরাওয়ার্দীর কোনো আকস্মিক সিদ্ধান্তের ফসল ছিলোনা, এ ছিলো তার আজীবন লালিত দৃষ্টিভংগী ও মানসিকতারই পরিচয়বাহী কর্ম-কাণ্ডের একটি পর্যায় মাত্র। নৈশক্লাবের হুল্লোড় এবং নাচ ও মদ্যপান জাতীয় আমোদ ফূর্তিতে অভ্যস্ত[১৮৮] সোহরাওয়ার্দীর রাজনীতিতে নির্যাতিত জনগণ কখনো উল্লেখযোগ্য স্থান পায়নি। তার লক্ষ্য ছিলো সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিক ঃ নিজের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে আরো অনেক বুর্জোয়া নেতার মতো তিনিও সময়ে সময়ে 'জনগণের স্বার্থ' তুলে ধরেছেন, সকল প্রকারে ব্যবহার করে প্রয়োজন শেষ হওয়ার সাথে সাথে জনগণকে ছুঁড়েও ফেলেছেন নির্দ্বিধায়। পূর্ব বাংলার অধিবাসী-দেরকেও তিনি এই দৃষ্টিভংগী থেকেই রাজনীতিতে 'ব্যবহারের সামগ্রী' বানিয়েছিলেন। সোহরাওয়ার্দীর রাজনীতির স্বরূপ অন্বেষণের লক্ষ্যে উপস্থাপিত নিচের আলোচনায় একথার প্রমাণ মিলবে।

১. লাহোর প্রস্তাবের সংশোধনী ঃ পূর্ব বাংলার প্রথম সর্বনাশ

পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব বাংলার ব্যাপারে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ক্ষতিকর একটি ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে সোহরাওয়ার্দী তার পাকিস্তানী রাজনীতির সূচনা করেছিলেন। পাকিস্তানের ভিত্তি

হিসেবে পরিচিত ১৯৪০ সনের ২৩ মার্চ উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাবে ফজলুল হক ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলে মুসলিম গরিষ্ঠ অঞ্চলগুলিতে স্বাধীন একাধিক রাষ্ট্র বা 'ইন্ডিপেণ্ডেন্ট স্টেটস' ['Independent States'] প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। সেগুলির ইউনিট তথা অংগরাষ্ট্র সমূহ হবো 'স্বায়ত্তশাসিত এবং সার্বভৌম।'[১৮৯] লাহোর প্রস্তাবের কোথাও 'পাকিস্তান' নামক 'একটি রাষ্ট্রের' কথা ছিলোনা। এর ভিত্তিতেই স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবীতে ভারতের মুসলমানরা বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেন এবং বলাই বাহুল্য যে বাঙালী মুসলমানরাই একে সাফল্যের পথে এগিয়ে নেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে পরবর্তীকালে মুসলিম প্রধান দুটি অঞ্চলকে নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠনের চিন্তা বিকশিত হয় এবং তারই পরিণতিতে সংশোধন করা হয় লাহোর প্রস্তাবকে। এদিকে বিভিন্ন প্রশ্নে মতানৈক্যের প্রেক্ষিতে মুসলিম লীগ থেকে ফজলুল হক পদত্যাগ করায়[১৯০] আন্দোলনের নিয়ামক শক্তি বাঙালী মুসলমানদের আস্থা অর্জনের অসৎ উদ্দেশ্যে পদত্যাগী শেরে বাংলার বিকল্প একজনের খোঁজ শুরু হয় এবং জিন্নাহদের সে পাতানো ফাঁদে পা দিতে এগিয়ে আসেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

১৯৪৬ সনের ৯ এপ্রিল দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের লেজিসলেটরস কনভেনশনে বাংলার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি লাহোর প্রস্তাবের সংশোধনী উত্থাপন করেন। সোহরাওয়ার্দী আনীত সংশোধনী প্রস্তাবে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা ও আসাম এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সমন্বয়ে 'পাকিস্তান' নামক 'একটি সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার দাবী জানানো হয়।[১৯১] বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সম্পাদক আবুল হাশিম সংশোধনীর বিরোধিতা করতে গিয়ে জিন্নাহর অংগুলী হেলনের হুমকিতে সেদিন নিরস্ত হতে বাধ্য হয়েছিলেন।

২. স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার অসাধু উদ্যোগ

বাংলার প্রতিনিধিকে দিয়ে বাংলার ভবিষ্যৎ সর্বনাশের কাজটি সম্পন্ন করার পর ফজলুল হকের মতো সোহরাওয়ার্দীকেও জিন্না-

হরা বিতাড়নের আয়োজন চালাতে শুরু করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হওয়ার সাথে সাথে একথাও যখন নিশ্চিত হচ্ছিলো যে পরিকল্পিত দেশটিতে পশ্চিম বাংলা ও আসাম অন্তর্ভুক্ত হবে না, মুসলিম লীগ নেতৃত্ব তখন প্রধানমন্ত্রী পদে পশ্চিম বাংলার সোহরাওয়ার্দীর স্থলে পূর্ব বাংলার 'প্রতিনিধি' খাজা নাজিমুদ্দিনকে বসানোর সিদ্ধান্ত নেন। ষড়যন্ত্র বুঝতে পারার সাথে সাথে সোহরাওয়ার্দীও 'পাল্টা ব্যবস্থা' নেন ঃ ১৯৪৭ সনের ২৭ এপ্রিল দিল্লীতে তিনি 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা' নামের নতুন একটি রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বাংলার মুসলিম লীগ সম্পাদক আবুল হাশিম এবং কংগ্রেস নেতা শরৎ চন্দ্র বোস তার সমর্থনে এগিয়ে আসেন।[১৯২] কিন্তু জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা, পাকিস্তান আন্দোলনের প্রচণ্ডতা (যার জন্য সোহরাওয়ার্দী নিজেও অবদান রেখেছিলেন) এবং একই সাথে গান্ধী ও নেহরুর বিরোধিতার ফলে সোহরাওয়ার্দীর সে-উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যায়।[১৯৩] এ-উদ্যোগটির মধ্য দিয়ে তাই বলে সোহরাওয়ার্দীর বাংলা প্রেম প্রমাণিত হওয়ার কোনো কারণ ঘটেনি, কেননা তিনি নিজেই মাত্র এক বৎসর আগে জিন্নাহর নির্দেশে লাহোর প্রস্তাবের সংশোধনী এনে বাংলার স্বাধীনতার সম্ভাবনা নস্যাত করেছিলেন। এটা বরং ছিলো জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের অনিবার্য আঘাতের মুখে 'খাজা নাজিমুদ্দিন রোগাক্রান্ত' ব্যক্তি সোহরাওয়ার্দীর এক পাল্টা পদক্ষেপ মাত্র, যার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিলো নিজের নেতৃত্বকে অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করা।

৩. পাকিস্তানে আসার কারণ ঃ উর্দু'র জন্য ওকালতী

'হিন্দুস্থানের লেলিয়ে দেয়া পাগলা কুকর' হিসেবে বিতাড়িত হলেও মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে চালিত আন্দোলনের সাফল্যের সুযোগে পাকিস্তানে এসেছিলেন তিনি পূর্ব বাংলা বা পাকিস্তানের 'সেবার' মানসে নয়, ব্যক্তিস্বার্থের প্রয়োজনেই। কেননা, দীর্ঘদিনের পাকিস্তানমুখী আন্দোলনে ভূমিকা এবং বিশেষ করে তার প্রধানমন্ত্রীত্বকালে ১৯৪৬ সনের ১৬ অগাস্ট থেকে সংঘটিত ভয়াবহ কোলকাতা দাংগার দায়িত্বের অভিযোগের[১৯৪] কারণে সোহরাওয়ার্দীর

পক্ষে ভারতে থাকা কিংবা নিজের ভাগ্য গড়া সম্ভব ছিলোনা। পাকিস্তানে এলেও তার উদ্দেশ্য যে পূর্ব বাংলার ভাগ্যোন্নয়ন ছিলোনা তার প্রমাণঃ প্রথমেই তিনি আওয়ামী লীগে যোগ দেননি, ১৯৪৯ সনের নভেম্বর মাসেও তিনি সরকারী দলে নেতৃত্বের সুযোগ চেয়ে মুসলিম লীগের সভাপতি খালিকুজ্জামানকে চিঠি লিখেছিলেন।[৯৫] প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় গঠিত আওয়ামী লীগে যোগদানের পরিবর্তে মানকী শরীফের পীর এবং মামদোতের নবাবের সাথে ১৯৫১ সনে তিনি গঠন করেছিলেন 'পাকিস্তান জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগ', ১৯৫৩ সনে আওয়ামী লীগের সাথে তার আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিলো। এটাও তিনি করেছিলেন ১৯৫৪ সনের নির্বাচনকে সামনে রেখে, লক্ষ্য ছিলো তার পূর্ব বাংলার ঘাড়ে সওয়ার হয়ে পাকিস্তানের ক্ষমতায় যাওয়া।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে 'অভিমত' থেকেও পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি সোহরাওয়ার্দীর প্রকৃত দৃষ্টিভংগীর পরিচয় মিলবে। ১৯৫২ সনের ২১ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় মিছিলের ওপর গুলী বর্ষণের পর ২৪ ফেব্রুয়ারী হায়দরাবাদ থেকে প্রদত্ত বিবৃতিতে সোহরাওয়ার্দী বল্লেন ঃ "………………ঘটনা বর্তমানে ঘটিলেও বহু পূর্বেই পূর্ব বংগে ভাষা সম্পর্কে বিতর্ক দেখা দিয়াছে। আমি সেই সময় একটি জনসভায়ও এক বিবৃতিতে বলিয়াছিলাম, যে-আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তদনুসারে উর্দুই হইবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা…… বাংলার বুকে উর্দুকে অবশ্য জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইবে না, তবে বিদ্যালয়ে আবশ্যিক দ্বিতীয় ভাষারূপে ইহা পড়ান হইবে এবং যথাসময়ে এই প্রদেশবাসীগণ এই ভাষার সহিত পরিচিত হইয়া উঠিলে প্রদেশের শিক্ষিত সমাজ ও সরকারী কর্মচারীগণ আপনা হইতেই ইহা পড়িতে ও লিখিতে শুরু করিবে। তখন উর্দু তাহাদের নিকট গৌরবজনক মর্যাদাই লাভ করিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানীরাও দুই ভাষাভাষী হইবে।………"[৯৬]

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং খাজা নাজিমুদ্দিনদের সুরে সোহরাওয়ার্দীর বিবৃতিটি সে সময় যথেষ্ট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিলো। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক ২৫ ফেব্রুয়ারী এক

প্রতিবাদ বিবৃতিতে বলেন : 'সংবাদ পত্রে জনাব শহিদ সোহরাওয়ার্দীর এক বিবৃতি দেখিয়া আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। উহাতে তিনি পরোক্ষভাবে উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষারূপে গ্রহণের জন্য ওকালতী করিয়াছেন। ....উহাতে তাহার ব্যক্তিগত অভিমতই প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে এবং আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিতেছি যে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মোছলেম লীগ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিবার দাবী করে এবং পাক গণপরিষদে বাংলা রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহিত না হওয়া পর্যন্ত এবং সরকার কর্তৃক কার্যকরী না করা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালাইবে। আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্রে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিবার দাবী করা হইয়াছে এবং এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়ার পর হইতেই আমরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিবার জন্য আন্দোলন করিয়া আসিতেছি।'[১৭]

৪. ভাঙনের রাজনীতির সূচনা : অগণতান্ত্রিক মন্ত্রীসভায় যোগদান

পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতার অভিমুখে সোহরাওয়ার্দীর ন্যাককারজনক যাত্রা শুরু হয়েছিলো ১৯৫৪ সনের নির্বাচনের পর থেকে। পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরকালে মওলানা ভাসানী সহ প্রগতিশীলরা সে সময় প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তুললেও 'বিচক্ষণতার' সাথে সোহরাওয়ার্দী কেবল নীরবতাই অবলম্বন করেননি, অনেক ক্ষেত্রে সে চুক্তিকে 'স্বাগত'ও জানিয়েছিলেন।[১৮] তৎকালীন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক অলি আহাদ জানাচ্ছেন (পৃ-২৪১) : ১৯৫৬ সনের ১৯-২০ মে-র কাউন্সিল অধিবেশনে সামরিক জোট ও চুক্তি বিরোধী প্রস্তাব গ্রহণের কারণে সোহরাওয়ার্দী 'অত্যন্ত ক্ষুব্ধ' হন এবং তার কাছে 'কৈফিয়ত' চান। অলি আহাদকে সেদিন সোহরাওয়ার্দীর 'কটু মন্তব্য হজম' করতে হয়েছিলো।

১৯৫৪ সনের ২ এপ্রিল পূর্ব বাংলায় ফজলুল হকের নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠনের সময় 'জনৈক প্রিয়পাত্রকে' মন্ত্রী বানানোর প্রশ্নে মতানৈক্যের মধ্য দিয়ে সোহরাওয়ার্দী ভাঙনের রাজনীতির সূচনা

করেছিলেন।[১৯৯] আবুল মনসুর আহমদ এই 'প্রিয়পাত্র'টির পরিচয় গোপন করলেও 'সৎ সাংবাদিক' তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া নামটি প্রকাশ করেছেন তার গ্রন্থে (পৃ-৫৬-৫৭): তিনি ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। আবদুস সালাম খান ও মোহন মিয়ার চ্যালেঞ্জের মুখে মন্ত্রী হওয়াটা নাকি মুজিবের 'মর্যাদার প্রশ্ন' হয়ে পড়েছিলো। 'প্রিয়পাত্র' মুজিবকে খুশী করতে গিয়ে যুক্তফ্রন্টের বিরাট বিজয় এবং পূর্ব বাংলার জনগণের আশা আকাংখাকে নস্যাত করেই সোহরাওয়ার্দী নিরস্ত হননি, ৯২-ক ধারা প্রবর্তনের মাধ্যমে হক মন্ত্রীসভাকে বাতিল করে যে গোলাম মোহাম্মদ পূর্ব বাংলায় গণতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটিয়েছিলেন, তারই দেয়া প্রধানমন্ত্রী পদের আশ্বাসে প্রলুব্ধ হয়ে মওলানা ভাসানীর নিষেধাজ্ঞা এবং আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটিরও সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে ১৯৫৪ সনের ২০ ডিসেম্বর তিনি পাকিস্তানের অগণতান্ত্রিক মন্ত্রীসভায় আইনমন্ত্রী পদে যোগদান করেছিলেন।[২০০] মন্ত্রীসভার তালিকায় তার ক্রমিক সংখ্যা ছিলো দশ, অন্যান্যদের মধ্যে সহকর্মী মন্ত্রীরা ছিলেন জেনারেল আইউব খান এবং মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা।[২০১] তার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বগুড়ার সেই মোহাম্মদ আলী, যিনি এক সময় সোহরা-ওয়ার্দী মন্ত্রীসভায় অর্থমন্ত্রী ছিলেন এবং যাকে ওয়াশিংটনে রাষ্ট্রদূতের পদ থেকে এই পদে আসীন করা হয়েছিলো খাজা নাজিমুদ্দিনকে অপসারণের পর। স্মর্তব্য যে অপসারণের এই ঘটনাটিকে মওলানা ভাসানী 'সম্পূর্ণ বে-আইনী এবং অগণতান্ত্রিক' আখ্যা দিয়ে তীব্র সমালোচনা করলেও জনসভার একই মঞ্চ থেকে সোহরাওয়ার্দী সেদিন (১৭ এপ্রিল, ১৯৫৩) গভর্নর জেনারেলকে 'অকুন্ঠ' সমর্থন জানিয়েছিলেন।[২০২]

মওলানা ভাসানীর নিষেধাজ্ঞা এবং সংগঠনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অগণতান্ত্রিক বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রীসভায় যোগদানের পদ-ক্ষেপটিকে সমর্থন করতে গিয়ে সোহরাওয়ার্দী সে সময় প্রকাশ্য সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছিলেন: 'আওয়ামী লীগ আবার কি? আমিই আওয়ামী লীগ।' সাংবাদিকদের প্রশ্ন 'এটা কি আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টো-বিরোধী না?'—এর জবাবে সোহরাওয়ার্দী বলেছেন: 'আমিই আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টো।'[২০৩] ঘটনাটি ইতিহাসের

পাঠক মাত্রকেই হিটলারের কথা মনে করিয়ে দেয়ঃ ১৯৩৯ সনের অক্টোবরে ফ্রান্স আক্রমণে অস্বীকৃত জেনারেলদের বিনা প্রশ্নে তার আদেশ পালনের আদেশ দিয়ে হিটলার বলেছিলেনঃ 'আমিই জার্মানী।' উল্লেখ্য যে প্রধানমন্ত্রী সেবার তাকে বানানো হয়নি, বরং মন্ত্রীত্ব গ্রহণের অনুমতির জন্য লণ্ডনে সাক্ষাৎকালে মওলানা ভাসানী উচ্চারিত সতর্ক-বাণীটিই সত্য প্রমাণিত হয়েছিলোঃ 'গোলাম মোহাম্মদদের হাতে তুমি একটি আছাড় খাবেই।'[২০৪]

৫. মানিক মিয়ার যুক্তিঃ 'ক্ষমতালিপ্সা' নয়, গণতন্ত্রের জন্য

'লীডার' সোহরাওয়ার্দীর আইনমন্ত্রীত্ব গ্রহণের সপক্ষে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার বক্তব্য বেশ উপভোগ্যঃ 'গোলাম মুহাম্মদ নয়া শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতে লাগিলেন এবং কোরানের নামে শপথ করিয়া বলিলেন যে, শাসনতন্ত্র রচনার পর দেশে পূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে। ....গোলাম মুহাম্মদের অশ্রুজল দেখিয়া এবং তার শপথ বাক্যে বিশ্বাস করিয়া শহীদ সাহেব তার উপর আস্থা স্থাপন করিলেন। তিনি কেবল শাসনতন্ত্র রচনার জন্যই আইনমন্ত্রী হইতে সম্মত হইলেন।' (পৃ-৬৪)

এককালে নিজেরই মন্ত্রীসভার অর্থমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর অধীনে মন্ত্রীত্ব গ্রহণকে যারা সোহরাওয়ার্দীর 'ক্ষমতালিপ্সা' বলেন তারা মানিক মিয়ার মতে 'বড় অবিচার' করেন, কেননা 'শহীদ সাহেব ছিলেন মনেপ্রাণে গণতান্ত্রিক আদর্শে আদর্শবান এবং পাকিস্তানের সংহতিতে বিশ্বাসী একজন নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিক। তিনি চাহিতেন দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক, পাকিস্তানের দুই অংশ সংহত থাকিয়া সম্মিলিতভাবে ধাপে ধাপে উন্নতি ও প্রগতির পথে অগ্রসর হোক।' (পৃ-৬৫) মানিক মিয়া তার 'লীডার' এর সমর্থনে অতঃপর বলেছেনঃ '.........তার চারিত্রিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যারা অবহিত আছেন, তারা জানেন এবং বিশ্বাস করেন যে, দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই তিনি বগুড়ার মুহাম্মদ আলী মন্ত্রীসভার আইন

মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সরল-সহজ বিশ্বাসে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তিনি তার আত্মার বিরাটত্ব, উদার ব্যক্তিত্ব, অনাবিল দেশ প্রেম ও অসীম জাতীয়তাবোধের পরিচয় দিয়াছিলেন।' (পৃ-৬৫-৬৬)

এই পর্যায়ে পারলে মানিক মিয়া সোহরাওয়ার্দীকে মহান এক 'অবতার'ও বানিয়ে ফেলতেন, কিন্তু তখনো অবশিষ্ট লজ্জাটুকু সম্ভবতঃ তাকে নিরস্ত করেছিলো। লক্ষ্যনীয় যে 'লীডার'কে রক্ষা করতে গিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রশ্নটিই এড়িয়ে গেছেন, কিন্তু আর আর এক 'সাংবাদিক' এবং মানিক মিয়ার চাইতে বেশী ঘনিষ্ঠ সোহরাওয়ার্দী-অনুসারী আবুল মনসুর আহমদ তার গ্রন্থে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়েছেন যে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ 'কসম' খেয়ে সোহরাওয়ার্দীকে বলেছিলেন যে মন্ত্রীসভায় যোগদানের তিন দিন বা কারো মতে তিন সপ্তাহের মধ্যে তাকে প্রধানমন্ত্রী বানানো হবে এবং প্রধানতঃ এই প্রলোভনেই তিনি আইনমন্ত্রী হয়েছিলেন (পৃ-৩৪৭)। একে যদি 'ক্ষমতালিপ্সা' না বলে 'দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে' সোহরাওয়ার্দীর 'সরল-সহজ' চরিত্রের বৈশিষ্ট্যজাত ক্রিয়া বলতে হয় তাহলে 'লিপ্সা' শব্দের অর্থ কী হবে সেকথাও মানিক মিয়ার উদ্ভাবন করা উচিত ছিলো।

পরিশেষে মানিক মিয়া সোহরাওয়ার্দীর পক্ষ সমর্থনে বলেছেন ঃ 'পরবর্তীকালে ইহাও উদঘাটিত হইয়াছে যে, জুরিখ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর, তাঁহাকে (সোহরাওয়ার্দীকে) পূর্ব পাকিস্তানে আসিতে না দেওয়া এবং মন্ত্রীত্ব গ্রহণে প্ররোচিত করাও গোলাম মুহাম্মদ, চৌধুরী মুহাম্মদ আলী এবং মোমতাজ দৌলতানা প্রমুখ রচিত একটি গোপন পরিকল্পনার অংগ। মন্ত্রীসভায় প্রবেশের অত্যল্পকালের মধ্যেই শহীদ সাহেব এই রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু তখন বিলম্ব হইয়া গিয়াছে।' (পৃ ৬৬) এই কথাটিই লণ্ডনে সাক্ষাৎকালে মওলানা ভাসানী সোহরাওয়ার্দীকে বলেছিলেন এবং বিচক্ষণ সোহরাওয়ার্দীরও তা বোঝা উচিত ছিলো। সোহরাওয়ার্দীর অবিরাম চাপের মুখে মওলানা ভাসানী 'অনুমতি' প্রদানকালে যে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ও নেতৃবৃন্দের মতামত গ্রহণের এবং পূর্ব বাংলা সফরের পরামর্শ দিয়েছিলেন। অনুসারী আবুল

মনসুর আহমদ সহ আওয়ামী লীগেরও অনেকে তাকে একই কথা বলেছিলেন, কিন্তু সোহরাওয়ার্দী নিজেই সেদিন 'আওয়ামী লীগ' এবং তার 'মেনিফেস্টো' বনেছিলেন, এবং ফলে কারো কথাই তার কানে প্রবেশ করতে পারেনি।

তাকে 'পূর্ব পাকিস্তানে আসিতে না দেওয়া' যে একটি গোপন পরিকল্পনার অংগ সেকথাটি 'মন্ত্রীসভায় প্রবেশের অত্যল্পকালের মধ্যেই' নয়, প্রথম থেকেই তিনি জানতেন, জানাটাই ছিলো স্বাভাবিক, কেননা রাজনীতির এত দক্ষ খেলোয়াড় সোহরাওয়ার্দী তখন মুখে চুষনী এঁটে হামাগুড়ি দিতেন না। ইচ্ছে থাকলে তিনি নিশ্চয়ই যেতেও পারতেন। আশলে তিনি নিজে থেকেই যাননি, কারণ পূর্ব বাংলা সফরে গেলেই সেখানে জনমত প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করতো এবং করাচীতে হোটেল 'মেট্রোপোল'—এর বৈঠকে আবুল মনসুর আহমদদের দুর্বল বিরোধিতা অতি সহজে এড়ানো গেলেও পূর্ব বাংলার জনমতের বেলায় তা সম্ভব হতোনা। শুধু তা-ই নয়, দলীয় সিদ্ধান্তের কথা গোপন করা গেলেও জনমতকে গোপন করা কষ্টসাধ্য হতো এবং সেক্ষেত্রে তার সে পরিপন্থী পদক্ষেপটি তাকে প্রকাশ্যে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করতো। এই ব্যাপারটিই সুচতুরভাবে এড়াতে চেয়েছিলেন 'সরল-সহজ' সোহরাওয়ার্দী, আর তাই তিনি পূর্ব বাংলা সফর না করার পাশাপাশি কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতাদেরকেও কাছে ঘেসতে দেননি।[২০৫] তাছাড়া 'সংসদীয় গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার জন্য 'মনে প্রাণে গণতান্ত্রিক আদর্শে আদর্শবান' সোহরাওয়ার্দী পূর্ব বাংলার জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাতকারী গোলাম মোহাম্মদের মন্ত্রী হওয়ার পরিবর্তে কেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথটি বেছে নিলেননা, সে কথার জবাবও মানিক মিয়ারা দেননি। বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর মতো এককালের বিশ্বাসঘাতক রাজনীতিক-কূটনীতিক এবং আইউব খান ও ইস্কান্দার মীর্জাদের মতো জেনারেলদের সমন্বয়ে তথাকথিত 'প্রতিভাবানদের' এই নিযুক্ত মন্ত্রীসভাটি কোন ধরণের 'গণতন্ত্র সম্মত' তারও ব্যাখ্যা কোথাও পাওয়া যায়নি।

ঘটনা প্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে তাই 'ক্ষমতালিপ্সার' অভিযোগ থেকে সোহরাওয়ার্দীকে রেহাই দেয়া যায়না। তদুপরি সম্পূর্ণ অগণ-

তান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতাসীন একটি আমলা-সামরিক মন্ত্রীসভায় যোগদানের মাধ্যমে সরকারকে 'গণতান্ত্রিক' আদলের 'বৈধতা' দানের প্রচেষ্টার কারণে একথা বলাও অসংগত হবেনা যে সোহরাওয়ার্দী নিজেও সেদিন গোলাম মোহাম্মদ সহ পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক-নিয়ন্ত্রকদের গণতন্ত্র ও পূর্ব বাংলা বিরোধী ষড়যন্ত্রে অংশ নিয়েছিলেন। যে 'রাজনৈতিক দুরভিসন্ধির' কথা বলা হয়েছে, তার প্রণয়নে অংশ না থাকলেও বাস্তবায়নে সোহরাওয়ার্দী যে 'সজ্ঞানে' ভূমিকা রেখে-ছিলেন, সেকথা স্বীকার করতেই হবে। এর পেছনে তার ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা তথা ক্ষমতালিপ্সাই যে ক্রিয়া করেছিলো সে তো বলাই বাহুল্য।

৬. অগণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র কনভেনশনের পক্ষে ভূমিকা ঃ

সামরিক শাসনের হুমকি

শান্তি সম্মেলনে যোগদানের জন্য ইয়োরোপে গিয়ে ইস্কান্দার মীর্জার হুমকির কারণে মওলানা ভাসানী সে সময় নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছিলেন। আইনমন্ত্রী হলেও সোহরাওয়ার্দী তাকে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেননি. এজন্যে বরং কৃষক-শ্রমিক পার্টিই সারাদেশে সমাবেশ আর মিছিলের মাধ্যমে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছিলো। ১৯৫৫ সনের ১০ এপ্রিল পল্টন ময়দানে 'গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দিবস' এর জনসভায় মওলানা ভাসানীকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্যে ফজলুল হকের জোরালো দাবী এবং সারা পূর্ব বাংলায় প্রগতিশীলদের প্রচারাভিযানের চাপে[২০৬] সরকার নতিস্বীকার করতে বাধ্য হন ঃ ২২ এপ্রিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইস্কান্দার মীর্জা ঘোষণা করেন যে মওলানা ভাসানীর ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। সহকর্মী মন্ত্রীর এই ঘোষণার সুযোগে কৃতিত্ব নেয়ার উদ্দেশ্যে সোহরাওয়ার্দী স্বয়ং কোলকাতা গিয়ে মওলানা ভাসানীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন ২৫ এপ্রিল।

এর পেছনেও সোহরাওয়ার্দীর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিলো, যদিও মানিক মিয়া ঘটনাটি এমনভাবে বর্ণনা করেছেন (পৃ-৬৭), যেন তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে মওলানা ভাসানীকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে গণআন্দোলনের চাপের মুখে ফিরিয়ে আনার 'কৃতিত্ব' নেয়ার পাশাপাশি দেশে বিরাজমান পরিস্থিতিতে মওলানা ভাসানীকে

ব্যবহার করাই ছিলো সোহরাওয়ার্দীর উদ্দেশ্য। ১৯৫৫ সনের ১৫ এপ্রিল গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ গণপরিষদের পরিবর্তে অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে একটি 'শাসনতন্ত্র কনভেনশন' গঠন করেছিলেন, সংখ্যা সাম্যের ভিত্তিতে এর সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হয়েছিলো। ফজলুল হক এর বিরোধিতা করেন, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, গণতন্ত্রী দল, নিজাম-ই-ইসলাম পার্টি, খিলাফত-ই-রব্বানী পার্টি, জাতীয় কংগ্রেস, এমনকি প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়, পূর্ব বাংলার সর্বত্র প্রতিবাদ ওঠে। কোলকাতা থেকে মওলানা ভাসানীও শাসনতন্ত্র কনভেনশন এবং সংখ্যা-সাম্য প্রবর্তনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। কিন্তু আইনমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী আওয়ামী লীগকে বিরোধিতা থেকে নিরস্ত করে স্বপক্ষে টানেন। তিনি তার সহকর্মী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জাকে সাথে নিয়ে পূর্ব বাংলা সফরে আসেন পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য। এই চেষ্টায় প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরই তিনি মওলানা ভাসানীকে দেশে ফিরিয়ে আনেন। মওলানা ভাসানী অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপটিকে সমর্থন করতে অস্বীকার করেন, আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিও একই মত প্রকাশ করে। সোহরাওয়ার্দী সে সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে শাসনতন্ত্র কনভেনশনের নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র দাখিল করার ব্যবস্থা করেন। ওদিকে ফেডারেল কোর্ট তার রায়ে (১০ মে, ১৯৫৫) ঘোষণা করে যে, 'কনভেনশন' গঠনের ক্ষমতা গভর্নর জেনারেলের নেই, তাকে 'গণপরিষদ'ই গঠন করতে হবে।[২০৫] ফলে ১৯৫৫ সনের ২৮ মে গণপরিষদ গঠনের অর্ডিন্যান্স জারী হয়, সোহরাওয়ার্দী পরাস্থ হন। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন (পৃ-৩৫৬)ঃ 'গণতন্ত্রের নিশ্চিত জয় হইল। কিন্তু এ জয়ে আওয়ামী লীগ শরিক হইতে পারিলনা। গণতন্ত্রের জয়ও যে কোনও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের পরাজয় ও লজ্জার কারণ হইতে পারে, ঐদিনই প্রথম আমার সে কথা মনে পড়িয়াছিল।' বলা বাহুল্য যে এই পরাজয় ও লজ্জার কারণ সোহরাওয়ার্দীর কনভেনশনপন্থী কার্যকলাপ।

শাসনতন্ত্র কনভেনশনের এই অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপকে সফল করার জন্য গোলাম মোহাম্মদের আইনমন্ত্রী হিসেবে সোহরাওয়ার্দী

সে সময় যে ভূমিকা নিয়েছিলেন তা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক কলংকজনক অধ্যায়ের সংযোজন করেছে। মন্ত্রীত্ব রক্ষার তাগিদে কনভেনশনটি মেনে নেয়ার জন্যে চাপ সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি এমনকি সামরিক শাসনের হুমকি পর্যন্ত দিয়েছিলেন। ১৯৫৫ সনের ২৪ এপ্রিল এক বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন যে কনভেনশন মানা না হলে দেশে 'তিনটি বিকল্পের' যে কোনো একটি ঘটবে ঃ বিপ্লব, সামরিক বাহিনীর সহযোগিতায় বেসামরিক একনায়কত্ব, কিংবা সামরিক শাসন।[২০৮]

৭. সংখ্যাসাম্য প্রবর্তনে অবদান ঃ সদলবলে ষড়যন্ত্র

একই সাথে সোহরাওয়ার্দী দুই প্রদেশের সংখ্যা সাম্য মেনে নেয়ার জন্যও চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। মওলানা ভাসানী ও ফজলুল হক এর বিরোধিতা করেন, কিন্তু আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ও এম. এল. এ. দের একাধিক সভায় (২০ ও ২৬ এপ্রিল, ১৯৫৫) প্রবল বিতর্ককালে সোহরাওয়ার্দী তার 'যুক্তি' হিসেবে জানান যে সংখ্যা-সাম্য মেনে নেয়া না হলে গভর্নর জেনারেল নতুন গণপরিষদ গঠন করবেন না, পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দও সম্মত হবেন না।[২০৯] মওলানা ভাসানী তখন বলেছিলেন ঃ পূর্ব বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের নিশ্চয়তা দেয়া হলে শাসনতান্ত্রিক সংকট নিরসনের স্বার্থে সমঝোতার পূর্বশর্ত হিসেবে সাময়িকভাবে, অর্থাৎ কেবল মাত্র কনভেনশনের জন্য ব্যবস্থাটি মেনে নেয়া যেতে পারে।[২১০] এই বক্তব্যের পাশাপাশি ২৬ এপ্রিল মওলানা ভাসানী সোহরাওয়ার্দীর কাছ থেকে একটি লিখিত অংগীকারপত্র আদায় করেছিলেন। এতে সোহরাওয়ার্দী বলেন যে তিনি যুক্ত ফ্রন্টের একুশ দফা ও যুক্ত নির্বাচন প্রথা শাসনতন্ত্রে স্বীকার করানোর সাধ্যমতো চেষ্টা চালাবেন এবং ব্যর্থ হলে মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করবেন।[২১১] উল্লেখ্য যে ১৯৫৭ সনের ৬ এপ্রিল এক সাংবাদিক সম্মেলনে মওলানা ভাসানী সোহরাওয়ার্দীর এই অংগীকার পত্রটি প্রদর্শন করেছিলেন।

বলা বাহুল্য ঃ সময়ের প্রয়োজনে অংগীকার করলেও চরিত্রের কারণেই সোহরাওয়ার্দী এর কোনোটিই মানা করেননি বরং তার

ওকালতীতে একবার শুধুমাত্র শাসনতন্ত্রের স্বার্থে সংখ্যা-সাম্যের নীতিটি মেনে নেয়ার যুক্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ একেই চিরস্থায়ী বিধানে রূপান্তরিত করিয়েছিলেন। ১৯৫৫ সনের ৭ জুলাই সম্পাদিত মারী চুক্তিতে 'সকল ব্যাপারে দুই অঞ্চলের মধ্যে সংখ্যাসাম্য' বলা হলেও ক্ষমতাসীনরা একে রাতারাতি শুধু 'প্রতিনিধিত্বে' সংখ্যাসাম্যে পরিণত করেছিলো। এসবই ঘটেছিলো সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগে এবং কারণটি ছিলো প্রধানমন্ত্রীর আসনে আরোহনের লক্ষ্যে তার বিরামহীন প্রচেষ্টা। প্রধানমন্ত্রীত্বের জন্য এমনকি সদলবলে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি'র নির্বাচনেও তিনি 'ক্যানভাসার' এর ভূমিকায় নেমেছিলেন ঃ বগুড়ার বাঙালী মোহাম্মদ আলী নেতা নির্বাচিত হলে তার নিজের প্রধানমন্ত্রীত্ব জুটবেনা বলে সোহরাওয়ার্দী চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর পক্ষে প্রচার চালিয়েছিলেন। চৌধুরী মোহাম্মদ আলীই মুসলিম লীগের নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন, তথাপি সোহ-রাওয়ার্দীর সেবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হয়নি। কারণ, সত্যিই তাকে 'আছাড়' দিয়ে গোলাম মোহাম্মদ অসুস্থতার নামে সরে পড়েছিলেন এবং নতুন গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা সোহ-রাওয়ার্দীর মতোই 'উর্দুভাষী বাঙালী' থাকায় ফজলুল হকের সার্টিফিকেটের বলে পূর্ব বাংলার 'প্রতিনিধি' হিসেবে পদটিতে টিকে গিয়েছিলেন। ফলে তৎকালীন রীতি অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানের চৌধুরী মোহাম্মদ আলীই প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, সোহরাওয়ার্দী হতে পারেননি (১১ অগাস্ট, ১৯৫৫)। মাঝখান দিয়ে নিজেই কেবল আছাড়টি খাননি, আওয়ামী লীগের মতো সংগ্রামী প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দকেও জড়িত করেছিলেন ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে, বানিয়েছিলেন সেই মুসলিম লীগের 'ক্যানভাসার', যার বিরুদ্ধেই আওয়ামী লীগ আজন্ম আন্দোলন করে আসছিলো। ফলে পূর্ব বাংলায় জনপ্রিয়তা কমেছিলো আওয়ামী লীগের, সুবিধে পেয়েছিলো ফজলুল হকের কৃষক-শ্রমিক পার্টি'।[৭১২]

৮. সোহরাওয়ার্দী-রাজনীতির মূলকথা

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে একথা বলা তাই অসংগত হবেনা যে সোহরাওয়ার্দী-রাজনীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো নিজের প্রতিষ্ঠা।

দেশ, জনগণ, গণতন্ত্র, এমনকি নিজের সংগঠনেরও কোনো মূল্য তার কাছে ছিলোনা, স্বার্থের প্রয়োজনে তিনি এগুলিকে ব্যবহার করতেন মাত্র। এজন্যেই তিনি লাহোর প্রস্তাবের সংশোধনী এনে পূর্ব বাংলার চিরস্থায়ী সর্বনাশ করার পর আবার স্বাধীন বাংলার 'দাবী' তুলেছেন, সকল অংগীকার ও ঘোষণা উপেক্ষা করে কেবলমাত্র মন্ত্রীত্বের জন্য অগণতান্ত্রিক একটি সরকারে অংশ নিয়েছেন, গণতন্ত্রের পরিপন্থী কনভেনশনের সপক্ষে ওকালতী করতে গিয়ে এমনকি সামরিক শাসনের হুমকি পর্যন্ত দিয়েছেন, সংখ্যা সাম্য প্রবর্তনেও সহায়তা করেছেন। নিজের প্রধানমন্ত্রীত্বকালে সংগঠনের ঘোষিত কর্মসূচী এবং নির্বাচনী অংগীকার পায়ে দলে তাই তিনি স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা করেছেন পররাষ্ট্রনীতি ও এক ইউনিটের রক্ষক হয়েছেন, প্রত্যাখ্যাত শাসনতন্ত্রেরও অভিভাবকের আসনে বসিয়েছেন নিজেকে। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে গণপরিষদে শাসনতন্ত্র গ্রহণকালে বিরোধী সদস্যদের অধিবেশন বর্জনে নেতৃত্ব দিলেও পরবর্তীকালে তিনি শাসনতন্ত্রটিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। আওয়ামী লীগের সদস্যরা স্বাক্ষরদানে অস্বীকার করেন, ১৯৫৬ সনের ১৭ মার্চ ঢাকায় 'সর্বদলীয় গণতান্ত্রিক কর্ম পরিষদ' এর সভায় ২৩ মার্চ আয়োজিত প্রজাতন্ত্র দিবসের সরকারী অনুষ্ঠান বর্জনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হলে তিনি তা পরিবর্তনের আহবান জানিয়ে মওলানা ভাসানী শেখ মুজিব এবং অলি আহাদের কাছে তারবার্তা পাঠান। ১৭ মার্চ প্রেরিত তারবার্তায় সোহরাওয়ার্দী করাচী থেকে বলেন: 'পূর্ব পাকিস্তান যোগদান না করার ফলে পাকিস্তানের স্বার্থহানী করা হবে। এর ফলে ভুল ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে এবং একে প্রজাতন্ত্রের বিরোধিতা হিসেবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।'[২১৩]

উল্লিখিত প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রেই ক্রিয়া করেছে তার স্বার্থচিন্তা। 'বুর্জোয়া গণতন্ত্রী' পরিচয়টাও সোহরাওয়ার্দীর রাজনীতির পোষাক মাত্র. প্রয়োজনে তিনি যে যে-কারো, এমনকি সামরিক বাহিনীরও পদলেহনে পিছপা হতেননা, এর প্রমাণ আইউব মীর্জাদের মতো জেনারেলদের সাথে অগণতান্ত্রিক মন্ত্রীসভায় তার মন্ত্রীত্ব গ্রহণ। অথচ তিনিই একবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন: 'সেই ভদ্রলোকেরাই পদটির জন্য লালায়িত হন যারা ক্ষমতার নিয়ন্ত্রকদের প্রয়োজনে কান ধরে বেরিয়ে যাওয়ার মতো অপমান সইতে পারবেন।'[২১৪]

ক. ষড়যন্ত্রের রাজনীতি এবং সোহরাওয়ার্দীর পতন

১. নান্না মিয়াদের সাথে প্রতিশ্রুতিভঙ্গ : রিপাবলিকানদের সাথে শত্রুতা

ইতিহাসের অনিবার্য নিয়মে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সোহরাওয়ার্দীকেও অপমানকর সে পরিণতির শিকার হতে হয়েছিলো। কিন্তু ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে অতি পারংগমতা দেখাতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীত্ব হারাতে হলেও আবুল মনসুর আহমদ ও মানিক মিয়ার মতো সোহরাওয়ার্দী অনুসারীরা সমস্ত 'দোষ' চাপানোর চেষ্টা করেছেন মওলানা ভাসানী ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ওপর। অন্যদের দোষারোপের মাধ্যমে নিজেদের ত্রুটি এবং অক্ষমতাকে আড়াল করার শস্তা রাজনৈতিক কৌশল থেকে এরা আবিষ্কার করেছেন ভাসানী-মীর্জা ষড়যন্ত্রও।

প্রকৃত পক্ষে সোহরাওয়ার্দী নিজেই তার সর্বনাশের পথটি নির্মাণ করেছিলেন, আর তার কারণ ছিলো নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে তার অতি আস্থা। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাপ গঠিত হওয়ার পর প্রাদেশিক পরিষদে ন্যাপের ২৯ জন সদস্য স্বাভাবিক কারণেই সরকার থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। সে সময় সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়ার নেতৃত্বে ক্ষমতাসীনদের আশ্বাসের ভিত্তিতে কৃষক-শ্রমিক পার্টির একটি অংশ দল থেকে আবু হোসেন সরকারকে বের করে দিয়ে ঐক্যমতে আসেন, প্রাদেশিক পরিষদে তাদের প্রায় ৩৫ জন সদস্য ছিলেন। সোহরাওয়ার্দী স্বয়ং সে 'বোঝাপড়া' অনুমোদন করেন, কিন্তু চূড়ান্ত মুহূর্তে প্রধানতঃ মুজিবের পরামর্শে তিনি কৃষক-শ্রমিক পার্টির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করায় ন্যাপের পাশাপাশি এই দলটিও সরকারের বিরুদ্ধে চলে যায় (অগাস্ট, ১৯৫৭)। ফলে পূর্ব বাংলায় সোহরাওয়ার্দী এবং আওয়ামী লীগ সরকারের অবস্থান দুর্বল হয়েছিলো।[২১৫]

এর চাইতেও বড় এবং মারাত্মক বুমেরাংটি ছুঁড়েছিলেন তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে : এক ইউনিট ভাঙার বিরোধিতায় আক্রমণাত্মক অনমনীয় ভূমিকাই সোহরাওয়ার্দীর জন্য চূড়ান্ত পরিণতি বয়ে এনেছিলো। এমন একটি সময়ে তিনি এক ইউনিটকে তার 'মূলনীতি' বানিয়েছিলেন,

যখন পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলই প্রথাটি বাতি-লের দাবীতে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিলো। নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি বলীষ্ঠ আনু-গত্যের কারণে এক ইউনিট-বিরোধী আন্দোলনে ন্যাপ অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করছিলো ঃ সাফল্যের প্রয়োজনে সুস্থ সকল রাজনৈতিক কৌশলই ন্যাপকে নিতে হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় ন্যাপ পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতা-সীন রিপাবলিকান পার্টিকেও আন্দোলনের পক্ষে আনার প্রচেষ্টা নেয়। রিপাবলিকান পার্টিও তখন বিপদের সম্মুখীন ঃ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর অভিযোগে ১৯৫৭ সনের এপ্রিলে ডাঃ খান সাহেবের নেতৃত্বা-ধীন প্রদেশের রিপাবলিকান সরকারকে সরিয়ে প্রধানমন্ত্রী সোহরা-ওয়ার্দীর পরামর্শে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৩ ধারা (সাবেক ৯২-ক) জারীর মাধ্যমে গভর্নরের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কেন্দ্রীয় কোয়ালিশনের গরিষ্ঠ অংশীদার রিপাবলিকানদের চাপের মুখে গভর্নর মুশতাক আহমদ গুরমানীর সুপারিশের ভিত্তিতে অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আবুল মনসুর আহমদ আবার রিপাবলি-কানদের সরকার গঠনের অনুমতি দিয়েছিলেন। সেই অনুসারে ১৯৫৭ সনের ১৭ জুলাই সরদার রশীদের নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানে রিপাবলিকান মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। উল্লেখ্য যে সে সময় আমেরিকা সফররত প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী সুপ্রমাণিত গরিষ্ঠতা সত্ত্বেও রিপাবলিকানদের ক্ষমতা না দেয়ার জন্য আবুল মনসুর আহমদকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।[২১৬]

২. ন্যাপ-রিপাবলিকান ঐক্য ঃ প্রাদেশিক পরিষদে ভোট

সোহরাওয়ার্দীর শত্রুতাপূর্ণ আচরণ এবং মুসলিম লীগের বিরো-ধিতার মুখে রিপাবলিকান পার্টি বাধ্য হয়ে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাথে এই মর্মে একটি চুক্তি সম্পাদন করে যে প্রাদেশিক পরিষদে এক ইউনিট বাতিলের দাবী সম্বলিত প্রস্তাব আনা হলে তারা ন্যাপকে সমর্থন দেবে। ১৯৫৭ সনের ১৩ অগাস্ট স্বাক্ষরিত এই চুক্তিতে ন্যাপের পক্ষে খান আবদুল গাফফার খান, জি, এম, সৈয়দ ও মিয়া ইফতিখার উদ্দিন এবং রিপাবলিকান পার্টির পক্ষে ফিরোজ খান নুন, সরদার রশীদ ও সৈয়দ আবিদ হোসেন স্বাক্ষর করেন।[২১৭] মুসলিম লীগও

এক ইউনিট বিরোধী আন্দোলনে ন্যাপের সাথে এগিয়ে আসার অংগীকার করেছিলো বলে জানা যায়।[২১৮]

১৯৫৭ সনের ১৭ সেপ্টেম্বর ন্যাপ-সদস্য গোলাম মোহাম্মদ ভারগুরী এক ইউনিট বাতিল করে পশ্চিম পাকিস্তানকে ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে চার বা ততোধিক স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশের একটি সাব-ফেডারেশনে পরিণত করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিন ঘন্টাব্যাপী আলোচনার পর ১৭০-৪ ভোটে প্রাদেশিক পরিষদে প্রস্তাবটি গৃহিত হয়ঃ নিজাম-ই-ইসলাম বিপক্ষে ভোট দেয়, 'দলের বৃহত্তর স্বার্থে' মুসলিম লীগ ভোটদানে বিরত থাকে।[২১৯] তিন সপ্তাহ পর ১২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে মুসলিম লীগ অবশ্য এক ইউনিটের সপক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলো।

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাত্র দু'মাস সময়ের মধ্যে প্রাদেশিক পরিষদে এক ইউনিট বিরোধী প্রস্তাব গ্রহণের এই ঘটনাটি ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির বিরাট বিজয়। এর মাধ্যমেই নাকি ন্যাপ সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জার হাতকে শক্তিশালী করেছিলো। এই শিশুসুলভ অভিযোগটি মেনে নেয়া যায় না এ কারণে যে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের মতো এক ইউনিট বাতিলের দাবীটিও ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের জাতিগত বিকাশের স্বার্থে প্রধান ও মৌলিক দাবী এবং তাই ব্যক্তি সোহরা-ওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রীত্ব রক্ষার খাতিরে দাবীটিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন ন্যাপের ছিলোনা। কেননা, সোহরাওয়ার্দী সদলবলে বিচ্যুত হলেও এই দাবীটি আওয়ামী লীগেরও কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিলো এবং ন্যাপও প্রতিষ্ঠাকালেই এর সপক্ষে কর্মসূচী হাজির করে-ছিলো। তদুপরি প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা প্রয়োগ করে যিনি তার অনুসারী গুন্ডাদের ন্যাপের বিরুদ্ধে সর্বত্র লেলিয়ে দিয়েছিলেন দলটিকে অংকুরেই ধ্বংস করার জন্য, সেই সোহরাওয়ার্দীকেই প্রধানমন্ত্রী পদে বহাল রাখার গণবিরোধী প্রচেষ্টায় নির্যাতিত ন্যাপ সহযোগিতা করবে, এই আশা ও ভাবনার অর্থ ছিলো মুর্খের স্বর্গারোহনের মতো। পশ্চিম পাকিস্তানের সমগ্র জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও বিকাশের প্রশ্ন যেখানে বিজড়িত, সেখানে জনগণের স্বার্থের প্রশ্নে প্রতিটি ক্ষেত্রে ওয়াদাভঙ্গকারী ব্যক্তি সোহরাওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রীত্ব বিপন্ন হলো কি হলোনা

তা বিবেচনার অবকাশ ন্যাপের মতো গণমুখী প্রগতিশীল সংগঠনের থাকার কথা নয়। বরং ন্যাপের বিরুদ্ধে গুণ্ডা লেলিয়ে দেয়া সহ ফ্যাসীবাদী আক্রমণের জবাবে জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে রাজনৈতিকভাবে গণতান্ত্রিক পন্থায় বিরোধিতা করাটাই ছিলো স্বাভাবিক এবং ন্যায়সংগতও। একেই যারা ইস্কান্দার মীর্জার পক্ষাবলম্বন হিসেবে চিহ্নিত করতে চান তারা যথার্থ বলেন না, বরং অন্যায় করেন। এরা তারাই, যারা পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবী এবং জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির আন্দোলনকেও ভারতের অনুচরবৃত্তি হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন।

তাছাড়া এমন প্রমাণও মেলেনি যে ইস্কান্দার মীর্জা ন্যাপের সমর্থনে 'শক্তিশালী' হয়ে এক ইউনিটের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিয়েছেন। বরং প্রাদেশিক পরিষদে এক ইউনিট বাতিলের প্রস্তাবটি গৃহিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এক সপ্তাহের মধ্যে ১৯৫৭ সনের ২৩ সেপ্টেম্বর ইস্কান্দার মীর্জা এবং সোহরাওয়ার্দী রেডিও পাকিস্তানে এক-যোগে প্রচারিত বিবৃতি ও বক্তৃতায় প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে একই জাতীয় কঠোর ভাষায় নিন্দা ও সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন।[২২০] শুধু তা-ই নয়, সে সময় পেশোয়ারে অনুষ্ঠানরত রিপাবলিকান পার্টির অধিবেশনে প্রভাব খাটিয়ে ইস্কান্দার মীর্জা এক ইউনিট প্রশ্নে ন্যাপের সাথে আর 'অগ্রসর না হওয়ার' ব্যাপারে রিপাবলিকানদের সম্মতও করিয়েছিলেন।[২২১] সবচেয়ে বড় কথা: সোহরাওয়ার্দীর পতনের পর প্রধান যে তিনটি শর্তের ভিত্তিতে রিপাবলিকান পার্টি মুসলিম লীগের সাথে কোয়ালিশন গঠন করে তার দ্বিতীয়টি ছিলো এক ইউনিট প্রশ্নে শাসনতন্ত্রের সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন না করার বিষয়ে।[২২২] এটা ছিলো ন্যাপের বিরুদ্ধে পরিষ্কার জোট গঠনের ঘটনা। তদুপরি আই, আই, চুন্দ্রীগড়ের নেতৃত্বে ১৯৫৭ সনের ১৮ অক্টোবর গঠিত মুসলিম লীগ-রিপাবলিকান কোয়ালিশনকে ন্যাপ সমর্থন করেনি, নিজাম-ই-ইসলামের সাথে সাথে সমর্থন দিয়েছে নান্না মিয়ার নেতৃত্বে সেই কৃষক শ্রমিক পার্টি—পূর্ব বাংলায় সোহরাওয়ার্দীর ওয়াদাভঙ্গ যাদের ক্ষিপ্ত করেছিলো। আর তাই সোহরাওয়ার্দীর পতনের জন্য ইস্কান্দার মীর্জার সাথে ন্যাপ বা মওলানা ভাসানীর আঁতাতের বালখিল্য অভিযোগ প্রমাণযোগ্য হতে পারেনা।

৩. রিপাবলিকানদের পাল্টা আক্রমণ : ইস্কান্দার মীর্জাকে নিয়ে ষড়যন্ত্রের ফল

সোহরাওয়ার্দী নিজেই বরং এক ইউনিট প্রশ্নে অতি উদ্যমী ভূমিকার মাধ্যমে চরম তিক্ততার সৃষ্টি করেছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপকভাবে সফরকালে রিপাবলিকান পার্টির আয়োজিত বিভিন্ন জনসভায় সে সময় তিনি ন্যাপের সাথে সাথে রিপাবলিকানদেরও কঠোর ভাষায় আক্রমণ শুরু করেন। এ ক্ষেত্রেও তিনি পাকিস্তানের 'সংহতি নস্যাতের ষড়যন্ত্র' আবিষ্কার করে রিপাবলিকানদের মতো 'পাকিস্তান ভাঙনের নৃত্যে অংশ নিতে' অস্বীকার করেন। শুধু তা-ই নয়, কোয়ালিশনের গরিষ্ঠ অংশীদার রিপাবলিকানদের তিনি পাকিস্তানের 'দুশমন' আখ্যা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্যও আহবান জানাতে থাকেন।[১২৩] রিপাবলিকান পার্টির বদান্যতায় ক্ষমতাসীন হয়ে তাদেরই আয়োজিত জনসভায় তাদেরকেই রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যা দেয়ার এই আত্মঘাতী আক্রমণাত্মক অভিযানই সোহরাওয়াদীর পতনের পরোয়ানা হয়ে ওঠে। আক্রান্ত রিপাবলিকানরা সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন, প্রেসিডেন্টকে লিখিত এক চিঠিতে তারা সোহরাওয়ার্দীর পদত্যাগ দাবী করেন। ইস্কান্দার মীর্জা তখন পদত্যাগ এবং অপসারণের মধ্যে যে কোনো একটি পথ বেছে নিতে বললে দৌলতানা জাতীয় নেতাদের সাথে গোপন সমঝোতায় উপনীত সোহরাওয়াদী তার গরিষ্ঠতা যাচাই করার জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবানের দাবী জানান। কিন্তু চাপের মুখে ১৯৫৭ সনের ১১ অক্টোবর তাকে পদত্যাগ করতে হয়।

ইস্কান্দার মীর্জাকেও সোহরাওয়ার্দী নিজেই র'গিয়ে তুলেছিলেন। ১৯৫৮ সনের ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের পর প্রেসিডেন্টের পদটি না-ও থাকতে পারে আশংকায় মীর্জা নির্বাচনী প্রস্তুতি বানচাল করতে থাকেন। আবুল মনসুর আহমদ, আতাউর রহমান খান এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে দিয়ে অংগীকার করানোর পরও কাজ না হওয়ায় সোহরাওয়াদী নিজেও তাকে প্রেসিডেন্ট রাখার ওয়াদা করেছিলেন। এর ভিত্তিতেই ইস্কান্দার মীর্জা সে সময় 'নিউইয়র্ক টাইমস' এর প্রতিনিধিকে বলেছিলেন যে তিনি এবং সোহরাওয়াদী 'কখনো

একে অন্যকে ছাড়বেননা', কেননা, 'সোহরাওয়ার্দীর মতো যোগ্য লোক পাকিস্তানে আর হয় নাই।' কিন্তু এর পর পর ১৯৫৭ সনের জুলাই মাসে বিদেশ সফরকালে লণ্ডন বিমান বন্দরে সোহরাওয়ার্দী বলেন যে আগামী নির্বাচনের পর প্রেসিডেন্ট পদের জন্য তিনি দু'জন ব্যক্তির কথা ভাবছেন।[২২৪] এই দু'জনের দ্বিতীয় জন ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর মুশতাক আহমদ গুরমানী, যার সাথে সোহরাওয়ার্দী গোপনে মীর্জা-বিরোধী সমঝোতা গড়ে তুলেছিলেন।[২২৫] বিষয়টিকে মীর্জা ষড়যন্ত্র মনে করে শক্ত হাতে তা দমনেরও পদক্ষেপ নেন ঃ পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন রিপাবলিকানদের দিয়ে তিনি গুরমানীর পদত্যাগ দাবী করান। সমঝোতা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীত্ব রক্ষার প্রয়োজনে সোহরাওয়ার্দী নতি স্বীকার করেন এবং গুরমানীকে অপসারণের জন্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় আনীত প্রস্তাবটিকে তিনি আবুল মনসুরকে দিয়ে সমর্থন করান। ১৯৫৭ সনের ২৭ অগাস্ট গুরমানী পদত্যাগ করেন।

গুরমানী প্রশ্নে সোহরাওয়ার্দীর নতিস্বীকারের ঘটনাও ইস্কান্দার মীর্জাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি, তিনি ভবিষ্যৎ বিশ্বাসঘাতকতার আশংকায় সোহরাওয়ার্দী-বিরোধী প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এর কারণ ঃ বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারটিতে সোহরাওয়ার্দীর পারংগমতার কথা সুবিদিতে ছিলো, তদুপরি আপাত-পরাজয় সত্ত্বেও সোহরাওয়ার্দী সে সময় এক ইউনিট প্রশ্নে তার সমর্থক মুসলিম লীগের সাথে গোপন আঁতাত গড়তে শুরু করেছিলেন। রিপাবলিকানদের অনিবার্য বিরোধিতার মুখে সমর্থনের আশ্বাস দিয়ে তাকে মিয়া মমতাজ দৌলতানা চিঠিও লিখেছিলেন এবং এই সমর্থনের ভরসাতেই মীর্জার পদত্যাগের নির্দ্দেশের জবাবে তিনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার দাবী জানিয়েছিলেন। কিন্তু মীর্জা অস্বীকৃতি হন, কেননা, পরিষদে আস্থা যাচাই না করেও প্রধানমন্ত্রী অপসারণের এবং তা সমর্থিত হওয়ারও দৃষ্টান্ত তার সামনে ছিলো ঃ খাজা নাজিমুদ্দিনকে সরিয়ে বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রী বানানোর অগণতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপের সময় পল্টন ময়দানের জনসভায় সোহরাওয়ার্দী স্বয়ং গভর্নর জেনারেলের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। এর স্মৃতি তখনো ইস্কান্দার মীর্জা এবং সোহরাওয়ার্দী উভয়ের মনেই জাগরূক ছিলো, সোহরাওয়ার্দী তাই বিনা-প্রতিবাদে নতি স্বীকার করেন।

দেখা গেলো : সোহরাওয়ার্দী নিজেই তার পরিণতি ডেকে এনেছিলেন। এর কারণ ছিলো পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিলের মতো সর্বব্যাপী জনপ্রিয় দাবীর বিরোধিতা করতে গিয়ে সোহরাওয়ার্দীর পাকিস্তান ধ্বংসের সম্ভাবনা আবিষ্কার। পূর্ব বাংলায় মওলানা ভাসানীকে 'পরাভূত' করতে পারলেও পশ্চিম পাকিস্তানে তিনি সেই দলটির বিরুদ্ধেই অবস্থান নিয়েছিলেন, যাদের অনুগ্রহেই তার প্রধানমন্ত্রীত্ব জুটেছিলো। এক্ষেত্রে তিনি ষড়যন্ত্রের চোরাগলিতে পথ হাতড়েছেন, কিন্তু পাল্টা ষড়যন্ত্রই তার পতনকে অনিবার্য করে তুলেছে। এর পরও যারা মওলানা ভাসানী বা ন্যাপকে দায়ী করতে চান, তারা ইতিহাসকে এড়িয়ে অন্ধ-বিদ্বেষের শিকার হন মাত্র। ন্যাপ গঠনের পেছনে ইস্কান্দার মীর্জার 'হাত'-এর আবিষ্কারক আবুল মনসুর আহমদও কিন্তু স্বীকার করেছেন : 'বিশেষতঃ ভাসানীর প্রভাব মুক্ত সোহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রী রাখিতে (মীর্জা) সত্য সত্যই উদগ্রীব ছিলেন বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল।' (পৃ-৪৯৪-৯৫) মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় 'আপদমুক্ত' সোহরাওয়ার্দীই বরং ইস্কান্দার মীর্জার হাতকে শক্তিশালী করেছিলেন, মীর্জাও করেছিলেন সোহরাওয়ার্দীকে। কিন্তু জনপ্রিয় দাবী সমূহের অস্বীকৃতি, সংগঠনের কর্মসূচী থেকে বিচ্যুতি এবং জনগণের শক্তির ওপর নির্ভরতার পথ রূদ্ধ করে কেবলমাত্র প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের অন্ধকারে বিচরণের ফলেই সোহরাওয়ার্দী শেষ পর্যন্ত ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেননি।

৪. মানিক মিয়ার আবিষ্কার : 'নামকরা রাজনীতিক' বিরোধী ষড়যন্ত্র

তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া অবশ্য আর একটি 'কারণ' এর কথা বলেছেন (পৃ-৭৪-৭৫) : "……একটা সংখ্যালঘিষ্ট দলের প্রধানকে মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগদান পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপাবলিকান দলের উদারতা ছিল, না ষড়যন্ত্রের রাজনীতির শেষ অধ্যায় রচনা করার চক্রান্ত ছিল, তা তখন স্পষ্টভাবে উপলব্ধি না হইলেও পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে নিঃসন্দেহে প্রমানিত হইয়াছে যে, পাকিস্তানের নাম করা রাজনীতিকদের মধ্যে একমাত্র শহীদ সোহরাওয়ার্দী ব্যতীত সবাইকে রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ দিয়া কলংকিত করা হইয়াছে। একমাত্র

অবশিষ্ট ছিলেন শহীদ সাহেব। তাহাকেও ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হইল। শহীদ সাহেব যে এই দুরভিসন্ধির কথা একদম জানিতেন না এমন নয়। মন্ত্রিসভা গঠনকালে তিনি উপস্থিত সকলকে বলিয়াছিলেন যে দেশের নয়া শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করাই হইবে তার প্রধান কাজ।'

বিষয়টিকে মানিক মিয়া এমনভাবে উল্লেখ করেছেন যেন পাকিস্তানের ক্ষমতার নিয়ন্ত্রকরা স্বেচ্ছায় হঠাৎ 'অনুগ্রহ' করে সোহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রীত্ব দিয়েছিলো, তাকে 'কলংকিত' করাই যেন ছিলো তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু ঠিক সেই বিশেষ সময়-টিতেই কেন তাদের মনে সোহরাওয়ার্দীর কথা স্থান পেলো, সেকথাটি মানিক মিয়া এড়িয়ে গেছেন। আশলে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে পূর্ব বাংলায় গড়ে ওঠা খাদ্য-আন্দোলনের সাফল্যই ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক-দের ঘাবড়ে দিয়েছিলো : যে কোনো প্রকারে গড়ে ওঠা আন্দোলন তথা পূর্ব বাংলার অধিকারের দাবীসমূহকে অবদমিত করাই ছিলো তাদের লক্ষ্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তারা পূর্ব বাংলার এমন এক 'প্রতিনিধি' সোহরাওয়ার্দীকে মনোনীত করেছিলো, যিনি বাঙালী-বিরোধী ষড়যন্ত্রে পশ্চিম পাকিস্তানী কুচক্রীদের বিশ্বস্ত তল্পীবাহক হিসেবে আগেই নিজের 'যোগ্যতার' প্রমাণ রেখেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তার সে বাঙালী বিরোধী উদ্যম দিন দিন বেড়েই চলছিলো এবং ফলে এদেশেরই 'প্রতিনিধি'কে দিয়ে পূর্ব বাংলাকে নিস্পেষণের ষড়যন্ত্রটি বাস্তবায়িত হয়েছিলো সুন্দরভাবে। এত 'খিদমত'-এর সম্ভাবনা যে 'নামকরা রাজনীতিক'টির মধ্যে, তাকে কলংকিত করার জন্য ফাঁদ পাতার রীতি বা কৌশল সাধারণ সুস্থ রাজনীতিতে থাকার কথা নয়, অবশ্য প্রাসাদ-রাজনীতিক মানিক মিয়ারা এই রাজনীতি করতেন না।

লক্ষ্যনীয় যে বগুড়ার মন্ত্রীসভায় যোগদানকে সমর্থনকালে উত্থাপিত যুক্তির মতো এখানেও মানিক মিয়া নতুন এক 'যুক্তি' হাজির করে-ছেন : 'সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করাই হইবে তার প্রধান কাজ।' মানিক মিয়ার মতে 'প্রতিভাধর' আইনমন্ত্রী হওয়ার সময় 'দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে' গোলাম মোহাম্মদের 'অশ্রুজল দেখিয়া' সোহরাওয়ার্দী সম্মত হয়েছিলেন 'কেবল মাত্র শাসনতন্ত্র রচনার জন্যই',

এবার তার মতে 'সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান'ই ছিলো সোহরাওয়ার্দীর 'প্রধান কাজ'। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীত্ব তথা ক্ষমতালিপ্সার অভিযোগ থেকে মানিক মিয়া তার প্রিয় 'লীডার'কে বাঁচাতে চেয়েছেন। ক্ষমতার নিয়ন্ত্রকদের 'দুরভিসন্ধির' কথা সেবারের মতো এবারও সোহরাওয়ার্দী জানতেন, তবু তিনি ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দিয়েছিলেন, কারণ: আইনমন্ত্রীত্ব গ্রহণকালে তিনি চুষণী মুখে হামাগুড়ি দিতেন, এবার তিনি সুবোধ বালকের মতো হাঁটতে শিখেছিলেন।

৫, সোহরাওয়ার্দীর মূল্যায়ন

সোহরাওয়ার্দীর কাছ থেকে মানিক মিয়ারা কোন ধরণের রাজনীতি শিখেছিলেন তারও প্রমাণ মেলে এখানেই: 'মাচার তলে কে-রে……' ঘটনার গুড় চুরি করে খেতে ব্যস্ত বালকটির মতো আগে ভাগেই মানিক মিয়া ক্ষমতালিপ্সার প্রসংগটি তুলে ধরেছেন। অথচ এবার পরিপ্রেক্ষিত ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম: স্বেচ্ছাচারী কোনো সরকারে সোহরাওয়ার্দী নিযুক্ত হননি, জনগণের সমর্থিত আওয়ামী লীগের সংসদীয় নেতা হিসেবে রিপাবলিকান পার্টির সাথে যৌথভাবে গণতন্ত্র সম্মত পন্থায় তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। এতে তাই দোষের কিছু ছিলোনা, কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে যে-ভূমিকা তিনি নিয়েছিলেন, সেটাই ছিলো অন্যায়, অগণতান্ত্রিক, গণ-বিরোধী এবং আত্মঘাতীও। ক্ষমতা রক্ষার প্রয়োজনে সকল ন্যায়-নীতিকে জলাঞ্জলী দিয়ে জনগণ ও সংগঠনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার পাশাপাশি তিনি কেবল ষড়যন্ত্রের পথে হাঁটতে গিয়েছিলেন বলেই তাকেও ষড়যন্ত্রেরই শিকার হতে হয়েছিলো। পূর্ব বাংলার 'প্রতিনিধি' হয়ে পূর্ব বাংলারই জনগণের বিরুদ্ধে প্রণীত ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে প্রধান নায়কের ভূমিকা পালনের পরই কেবল সোহরাওয়ার্দী বিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রশ্নটি এসেছিলো এবং সেক্ষেত্রেও প্রথম থেকেই উস্কানীদাতা ছিলেন তিনি নিজেই। কিন্তু মানিক মিয়ার চোখে সম্পূর্ণ বিষয়টিই শুধু ব্যক্তি সাহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মনে হয়েছে, ষড়যন্ত্রের জনগণ-বিরোধী প্রাথমিক পর্যায়ের দিকটি তিনি এড়িয়ে গেছেন। সেটাই স্বাভাবিক, কেননা, প্রতারণা আর ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে অভ্যস্ত মানিক মিয়াদের কাছে জনগণ কখনো বিবেচনার বিষয় হতে পারেনি, তদুপরি তিনি নিজেও এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে অন্যতম অনুচরের ভূমিকাই পালন করেছিলেন।

সর্বতোভাবে নিজের ক্ষমতা, খ্যাতি, ও একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দৃষ্টিকোণ থেকে 'দেশ ও জনগণের স্বার্থে' নিবেদিত 'নাম করা রাজনীতিক' সোহরাওয়ার্দীর 'অবদান'-এর মূল্যায়ন উপস্থাপিত এই পর্যালোচনার আলোকেই করতে হবে। তিনি তীক্ষ্ণ-কুশলী ব্যারিস্টার এবং তুখোড় পার্লামেন্টারিয়ান ছিলেন, – এই জাতীয় 'যোগ্যতা' সম্পর্কে সংশয়বিহীন হওয়ার পরও সংগত কারণেই প্রশ্ন এসে যায় : এর ফলে জনগণের কোন উপকারটা হয়েছিলো, পূর্ব বাংলা, এমনকি পাকিস্তানও কীভাবে লাভবান হয়েছিলো? গণতন্ত্রের দোহাই তিনি দিতেন, কিন্তু কোন সে 'গণতন্ত্র' এবং তারও বা কী বিহিত তিনি করেছিলেন? পার্লামেন্টে তার 'গঠনমূলক' পরামর্শ আর সমালোচনায় চৌধুরী মোহাম্মদ আলীরা ঘর্মাক্ত হতেন সত্য, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে 'সুশোভিত' শাসনতন্ত্রের কোন বিধানটি মানুষের মংগল বিধানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছিলো, পাকিস্তানের কোন অঞ্চলের কতজন মানুষ কীভাবে উন্নতির কোন পথটির সন্ধান পেয়েছিলো?

একজন রাজনীতিবিদের মূল্যায়ন করতে হয় দেশ ও জনগণের প্রতি তার অবদানের দৃষ্টিকোণ থেকেই : আশি জন লোকের পার্লামেন্টে কত বিশুদ্ধ ইংরেজী উচ্চারণে কোন কথার মার প্যাঁচে কাকে তিনি পরাভূত করলেন, এতে দেশ বা জনগণের কোনো লাভ নেই। বরং এই জাতীয় 'নাম করা' রাজনীতিকরা আগে থেকেই নুয়ে পড়া জনগণের ওপর আরো বেশী ক্ষতির বোঝা হয়ে চেপে যুগে যুগে তাদের শুইয়ে দিয়েছেন, কোমর সোজা করার মতো শক্তিটুকুও নিয়েছেন শোষণ করে। প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন বলেই তাকে 'জাতীয় নেতা' বানাতে হবে, এমন ভাবনার কিছু মোসাহেব থাকলেও ইতিহাসের পাঠককে বিচার করতে হবে একটি মাত্র দৃষ্টিকোণ থেকে : যাদের উপলক্ষে, যাদের সমর্থনে, যাদের দ্বারা এবং যাদের জন্য একজন রাজনীতিকের প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতালাভ, সে জনগণের জন্য তিনি কী করেছেন। এই আলোকে বিচারের ফলাফল, আগেও বলা হয়েছে : সোহরাওয়ার্দীর অনুকূলে যায়না।

৭

ভাসানীর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা ও স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের মূল্যায়ন

এ পর্যন্ত উপস্থাপিত ইতিহাস এবং আলোচনার ভিত্তিতে একথা বলা যায় যে মওলানা ভাসানী আহূত ১৯৫৭ সনের কাগমারী সম্মেলন পাকিস্তানের তৎকালীন রাজনীতিতে এক যুগান্তর ঘটিয়েছিলো। নির্যাতিত জনগণের সপক্ষের রাজনৈতিক শক্তিকে চিহ্নিত করার পাশাপাশি এই সম্মেলন উন্মোচিত করেছিলো অভিনেতা রাজনীতিকদের স্বরূপও। এতদিনকার ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির অবসান ঘটিয়ে সম্মেলনটি জন্ম দিয়েছিলো রাজনীতির এক নতুন স্রোতধারার ঃ ক্ষমতাসীনদের রদবদলই কেবল মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারেনা, সেজন্য যে ক্ষমতার প্রকৃত নিয়ন্ত্রক শাসক, শোষক, সেনাবাহিনী এবং তাদের অভিভাবক সাম্রাজ্যবাদকেও উৎখাত করা প্রয়োজন –এই সত্যটিই সাফল্যের সাথে তুলে ধরেছিলো কাগমারী সম্মেলন।

১. পূর্ব বাংলার স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদের যুক্তিসঙ্গত বিরোধিতা

মওলানা ভাসানীর উদ্যোগটি ছিলো অত্যন্ত সময়োপযোগী ঃ তিনি সঠিকভাবেই অনুধাবন করেছিলেন যে ভৌগলিক স্বাধীনতা সত্ত্বেও পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে নিরংকুশ কর্তৃত্ব ব্যতীত কোনো জনগোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলা যায়না। ঔপনিবেশিক শাসনের কবল থেকে

সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত পাকিস্তানে নয়া-ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের কৌশল নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অনুপ্রবেশ তখন ছিলো এক নতুন এবং ফলে সহজেই আড়ালযোগ্য ঘটনা। সাহায্য এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে আগত সাম্রাজ্যবাদকে তার প্রভাব বিস্তারের প্রাথমিক অবস্থাতেই আঘাত করা না হলে তার শিকড় প্রোথিত হতো আরো অনেক গভীরে। এর ফলে বিশেষ করে পূর্ব বাংলার দুর্দশা বাড়তো, প্রতিবাদবিহীন পূর্ব বাংলা পরিণত হতো শোষণের স্থায়ী স্বর্গভূমিতে। একথাও নানাভাবে প্রমাণিত হয়েছিলো যে স্বায়ত্তশাসনের পরিপূর্ণ অধিকার ব্যতীত পূর্ব বাংলার সামগ্রিক বিকাশ সম্ভব ছিলোনা, আর এর পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন তাই প্রয়োজনীয় কেবল ছিলোনা, ছিলো সেই দিনগুলিতে অত্যাবশ্যকও। মওলানা ভাসানী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বদানের সে ঐতিহাসিক দায়িত্বই পালন করেছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানীর এই সময়োপযোগী ভূমিকা পূর্ব বাংলা সহ পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের সকল ভাষাভাষী মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে দিক-নির্দেশকের অবদান রেখেছিলো। পরবর্তীকালে বিভিন্ন পর্যায়ের সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা হয়ে উঠেছিলো যে-কোনো দল বা গোষ্ঠীর কর্মসূচীর অবিচ্ছেদ্য অংশঃ লোক দেখানোর জন্য কিংবা সাম্রাজ্যবাদের পদলেহনের অসৎ উদ্দেশ্যে হলেও সকলকে বিরোধিতার কর্মসূচীই উপস্থাপিত করতে হয়েছে। মওলানা ভাসানীর সাফল্য এখানেই যে সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব ও হস্তক্ষেপের ক্ষতিকর দিকগুলি তিনি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন, এর বিরুদ্ধে আন্দোলনকে পেরেছিলেন সর্বাত্মকভাবে জনপ্রিয় করে তুলতে। সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব বিস্তারের সেই দিনগুলিতে তাদেরই আজ্ঞাবহ যুদ্ধোন্মাদ ক্ষমতাসীনদের প্রবল দাপটের মুখে যুদ্ধজোট বিরোধী নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির দাবীতে আন্দোলনের উদ্যোগ ও পরিচালনা ছিলো গভীর দেশপ্রেমসজ্জাত দুঃসাহসী কার্যক্রম। জীবনের ঝুঁকি নিয়েও সে দায়িত্ব পালন করে মওলানা ভাসানী ইতিহাসে পরীক্ষিত হয়ে গেছেন। পঞ্চাশের দশকের দমন-নির্যাতন কেবল নয়, ষাটের দশকের হত্যা-নিপীড়ন এবং সবশেষে একাত্তরের বাঙালী

নিধনযজ্ঞ মওলানা ভাসানীর বক্তব্যের সঠিকতা, সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিশক্তির যথার্থতা এবং ভবিষ্যৎ দর্শনের নির্ভুলতার প্রমাণ দিয়ে গেছে। ইতিহাসের নির্মম পরিহাস: সেদিনের ভাসানী-বিরোধী অনেককেও এই দমন-পীড়ন ও হত্যার শিকার হতে হয়েছে।

২. 'আসসালামু আলাইকুম': জনগণের সার্বভৌম কর্তৃত্বের জন্য ভাসানীর উদ্যোগ

'আসসালামু আলাইকুম' কেবল একটি ভবিষ্যদ্বাণীই নয়, পূর্ব বাংলার অধিকার বঞ্চিত অধিবাসীদের জাগৃতির লক্ষ্যে এ ছিলো এক দুর্দান্ত সাহসী উচ্চারণ: এর বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ ও নিজাম-ই-ইসলাম থেকে আওয়ামী লীগের ক্ষমতাসীন সোহরাওয়ার্দী পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের তাৎক্ষণিক আঁতাত-আয়োজন বাঙালীদের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলো: কী জন্যে এবং কারা তাদের বিপক্ষ শক্তি এবং কাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ব্যতীত এমনকি স্বায়ত্তশাসনের অধিকারটুকুও অর্জন করা সম্ভব নয়। সাম্রাজ্যবাদের ছত্রছায়ায় পূর্ব বাংলা-বিরোধী পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক-শোষকদের সর্বাত্মক তৎপরতার মুখে বাঙালীদের অধিকার সচেতনতার জন্য এ ছিলো মওলানা ভাসানীর এক অবিস্মরণীয় অবদান।

একই সাথে এর মাধ্যমে পাকিস্তানের প্রকৃত নিয়ন্ত্রকদের ওপর মওলানা ভাসানী প্রবল চাপও সৃষ্টি করেছিলেন: পূর্ব বাংলার ব্যাপারে সোহরাওয়ার্দীর সত্যিই মমত্ব থাকলে এই চাপের সুযোগ কাজে লাগিয়ে তিনি কিছুটা হলেও প্রদেশের কল্যাণ করতে পারতেন। সোহরাওয়ার্দী তা করেননি, চাইলেও সামান্যই পারতেন, কেননা, তিনি সদলবলে পাকিস্তানে বিরাজমান যে গণতান্ত্রিক পরিবেশের প্রশংসায় উচ্চকিত ছিলেন, কিংবা গণতন্ত্রের নামে যে ব্যবস্থাকে বজায় রাখতে ছিলেন সচেষ্ট, তা কোনো দিক থেকেই জনগণের সার্বভৌম কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। পর্যবেক্ষণ বরং এই সত্যই তুলে ধরে যে সোহরাওয়ার্দীর মতো 'জনপ্রতিনিধিদের' কেউ কেউ কখনো-সখনো মন্ত্রীত্বে আসীন হতে পারলেও ক্ষমতার চাবিকাঠি সর্বসময়ে থাকতো লোক চক্ষুর অন্তরালে প্রাসাদে-ছাউনীতে অবস্থানকারী বিশেষ একটি গোষ্ঠী, তথা বৃহৎ বুর্জোয়া ও সামন্ত প্রভু এবং তাদের

স্বার্থের প্রহরী সেনাবাহিনীর হাতে। গোলাম মোহাম্মদ এবং বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর নিযুক্তি ছিলো তার প্রমাণ, তাছাড়া একথা সেদিনের পাকিস্তানে কোনো গোপন ব্যাপারে ছিলোনা যে গোলাম মোহাম্মদের বিদায়ের পর মন্ত্রীসভার বৈঠকে জেনারেল আইউব কর্তৃক ব্যক্ত 'সেনাবাহিনীর ইচ্ছা'র ফলেই ইস্কান্দার মীর্জাকে গভর্নর জেনারেল পদে আসীন করতে হয়েছিলো।[২২৬]

অর্থাৎ জনগণের ভোট বা সমর্থন মন্ত্রীত্বলাভের জন্য আদৌ প্রভাব বিস্তার করতোনা, এজন্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হতে হতো ক্ষমতার নিয়ন্ত্রকদের অনুগ্রহের ওপর। এই অনুগ্রহ বজায় থাকা না থাকার ওপর নির্ভর করতো মন্ত্রীত্বের স্থায়ীত্বকাল। বিশেষ করে পূর্ব বাংলার একজন প্রতিনিধিকে যে কতটা অবমাননাকর অবস্থায় মন্ত্রীত্ব চালাতে হতো তার কিছু কাহিনী প্রকাশ করেছেন আবুল মনসুর আহমদ, যিনি সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভায় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী ছিলেন, মাঝে মাঝে হতেন অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীও। তিনি জানাচ্ছেন: দেশরক্ষা মন্ত্রীর ক্ষমতা সহ প্রধানমন্ত্রীও কোনোদিন সমরাস্ত্র কারখানার উৎপাদন সম্পর্কে জানতে পারেননি, উল্টো তাকে 'দেশরক্ষার গোপন তথ্য' সম্পর্কিত কৌতুহলের জন্য সন্দেহ করা হয়েছে। 'বুঝিলাম, নামে মাত্র পার্লামেন্টারী সরকার চলিতেছে দেশে।' আবুল মনসুর লিখেছেন: 'আমরা যে কত অক্ষম, অসহায়, তা বোধ হয় তিনি (সোহরাওয়ার্দী) আমার চেয়েও বেশী উপলব্ধি করেন।'[২২৭]

গণতন্ত্রের নামে শোষক গোষ্ঠীর স্বার্থে পাকিস্তানে বিরাজমান সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্রের এই শাসনের বিরুদ্ধেই মওলানা ভাসানী প্রতিরোধের প্রাচীর গড়তে চেয়েছিলেন: 'আসসালামু আলাইকুম' ছিলো স্বায়ত্তশাসন সহ পূর্ব বাংলার অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে তীব্রতর করার লক্ষ্যে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। শাসকগোষ্ঠীর অনুগ্রহের স্থলে মওলানা ভাসানী চেয়েছিলেন জনগণের সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। ৯২-ক ধারা প্রবর্তনের মাধ্যমে জনগণের বিজয়ের অভিযাত্রাকে সাময়িকভাবে অবরুদ্ধ করা হলেও তাকে স্থায়ীভাবে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হতোনা যদি লোভাক্রান্ত সোহরাওয়ার্দী বগুড়ার মন্ত্রীসভায় যোগ না দিতেন। লণ্ডনে সোহরাওয়ার্দীকে মওলানা ভাসানী বলেছিলেন: 'দেশবাসীই

তোমাকে নির্বাচিত করবে.........তুমিই হবে পাকিস্তানের সর্বপ্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী।'[২২৮]

ষড়যন্ত্রের পথে বগুড়ার মন্ত্রীসভায় যোগ দিয়ে সোহরাওয়ার্দী জনগণের ক্ষমতা ও মর্যাদাকেই কেবল ভূলুন্ঠিত করেননি, তাদের সার্বভৌম কর্তৃত্বের পথে বাধাদানকারী গোপন ক্ষমতাসীনদের অবস্থানকেও সংহত করতে সহায়তা করেছিলেন। এরই অনিবার্য পরিণতিতে তাকেও সর্বক্ষণ থাকতে হয়েছে মাথা নত করে, ইস্কান্দার মীর্জার অনুগ্রহের আশায় বিসর্জন দিতে হয়েছে এমনকি তার সামান্যতম 'সদিচ্ছাটুকুও'।[২২৯] নিরংকুশ হওয়া দূরে থাক, তার ক্ষমতা কোনো দিক থেকেই স্বাধীনতা লাভ করতে পারেনি।

কাগমারী সম্মেলনের মধ্য দিয়ে মওলানা ভাসানী শাসনক্ষেত্রের এই অব্যবস্থারই অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন। জনগণের সার্বভৌম কর্তৃত্ব তথা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন সোহরাওয়ার্দী আক্রমণের আপাত লক্ষ্যস্থল হলেও মওলানা ভাসানীর প্রকৃত লক্ষ্যস্থল ছিলো করাচীর ক্ষমতাসীনরা। এক্ষেত্রেও এককভাবে আক্রান্তবোধ করে সোহরাওয়ার্দী ভুল করেছিলেন, কিংবা এটাও ছিলো করাচীর প্রতি তার কর্তব্য পালনের তালিকার অংশবিশেষ। ব্যক্তিগতভাবে আক্রান্ত বোধ না করে মাথা নত করার পরিবর্তে তিনি যদি কাগমারী সম্মেলনের রায়কে জনপ্রতিনিধিসুলভ বলিষ্ঠতার সাথে তুলে ধরতেন ক্ষমতাসীনদের সামনে, পরিণত করতেন অন্ততঃ দরকষাকষির বিষয়ে, তাহলে জনগণ তথা গণতন্ত্রের পতাকা অবনমিত হতোনা। ক্ষমতালোভী সোহরাওয়ার্দীর চরিত্রের এই দুর্বলতা জনপ্রতিনিধিদের মর্যাদাকেও ক্ষুণ্ণ করেছিলো, আমলারা রাজনীতিবিদদের 'মৌসুমী পাখী' আখ্যায় উপহাস করার সাহস পেয়েছিলো এবং ফলে মন্ত্রীর দায়িত্বপালন হয়ে উঠেছিলো 'ওয়ারতির ঠেলা'।[২৩০]

সোহরাওয়ার্দীর দুর্বল অবস্থান গ্রহণের ফলাফল তার নিজের বা সাবিকভাবে পাকিস্তানী রাজনীতির জন্যেও অত্যন্ত সুদূর প্রসারী বিষময় পরিণতির কারণ ঘটিয়েছিলো। তিনি অপসারিত হওয়ার আগে পরিষদে আস্থা যাচাই করার সুযোগ পাননি, চুন্দ্রীগড় মন্ত্রীসভার আয়ুষ্কাল ছিলো মাত্র দু'মাস (১৮ অক্টোবর – ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৫৭),

বলপূর্বক বের করা হয়েছিলো ফিরোজ খান নুনের মন্ত্রীসভাকেও (১৬ ডিসেম্বর, ১৯৫৭- ৭ অক্টোবর, ১৯৫৮)। এরপর থেকে ১৯৭১ সন পর্যন্ত অবিভক্ত পাকিস্তানে আর কোনোদিন জনপ্রতিনিধিদের সুযোগ জোটেনি, সামরিক শাসনের যাঁতাকল পাকিস্তানবাসীদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছে (১৯৮৫ সন পর্যন্ত পাকিস্তানের অবস্থাও উল্লেখযোগ্য: ১৯৭২-৭৭ সময়কালে জুলফিকার আলী ভুট্টোর 'গণতান্ত্রিক' সরকার 'টিকে' থাকলেও সেনাবাহিনীই তাকে অপসারণ করেছে, ফাঁসির মাধ্যমে তিনি নিহত হয়েছেন)। গণতন্ত্রের পতাকাকে স্থায়ীভাবে ভূলুন্ঠিত করে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার এই প্রক্রিয়াকেই সোহরাওয়ার্দীর ক্ষমতালিপ্সা সর্বান্তকরণে সহযোগিতা দিয়েছিলো। অন্যসব ক্ষেত্রের মতো সামরিক বাহিনীতেও পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির বিষয়ে তিনি সামান্যতম প্রচেষ্টা নেননি, তদুপরি ভারতের বিরুদ্ধে নিষ্ফল যুদ্ধোন্মাদনা সৃষ্টির মাধ্যমে যে সেনাবাহিনীর দ্রুত শক্তি বৃদ্ধির কার্যকর পদক্ষেপ তিনি নিয়েছিলেন, তার ওপরও সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কোনো প্রয়াস তার দিকে থেকে ছিলোনা। নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা দূরে থাক, সেনাবাহিনীর কার্যোদ্ধার করে দেয়া ছাড়া কিছুই তিনি করেননি, আর এর ফলে সেনানায়করা তাদের ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে এগোতে পেরেছিলেন অবাধে। তার এই ভূমিকার কারণ: প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইউব খান তাকে 'অনুরোধ' করেছিলেন যেন তিনি সেনাবাহিনীর ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ না করেন। প্রধানমন্ত্রীত্ব রক্ষার প্রয়োজনে আইউবের অনুরোধটিকে তিনি নির্দেশের মর্যাদা দিয়ে অক্ষরে অক্ষরে এমন সুনির্দিষ্টভাবে মান্য করেছিলেন যে, তার প্রশংসা না করে জেনারেল আইউব খান পারেননি।[২৩১] এর ফলে রাজনীতিবিদ তথা জনপ্রতিনিধিদের সম্মান নস্যাৎ হয়েছে, আর নতশির এইসব 'স্টেটসম্যান'দের উদ্দেশ্যে বৃদ্ধাঙ্গুলি তুলে ধরে আইউবরা প্রস্তুতি নিয়েছেন ক্ষমতা দখলের। এক কথায় সোহরাওয়ার্দী সেই সেনাবাহিনীকেই সহযোগিতা করেছিলেন, যারা কোনো যুদ্ধেই বিজয় আনতে পারেনি, পরাস্থ হয়েছে কেবল। এদের শক্তি ছিলো শুধু নিরস্ত্র জনপ্রতিনিধিদের মন্ত্রীত্ব কেড়ে নেয়ার। শক্তিবৃদ্ধির কারণ তিনিও জানতেন, তথাপি মাথা তোলেননি কখনো, কেননা তাহলেই প্রধান-

মন্ত্রীত্ব যেতো, যতো বেশীদিন পদটি আঁকড়ে থাকা যায়, হোকনা গোলামের মতো 'মর্যাদা' নিয়ে - ছিলো তার নীতি।

৪. ভাসানীর আওয়ামী লীগ ত্যাগের যৌক্তিকতা

মওলানা ভাসানীর আওয়ামী লীগ ত্যাগের ঘটনাটিকেও বর্ণিত ঘটনাবলীর আলোকেই বিচার করতে হবে। তিনি ভুল বা হঠকারী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন জাতীয় ব্যাখ্যায় যারা সমাপ্তি টানতে চান, তারা তৎকালীন বাস্তব অবস্থার কথা বিস্মৃত হন। সোহরাওয়ার্দীর পরিচিতি, মামলায় উপার্জিত অর্থের সাহায্য এবং অনেক ক্ষেত্রে তার প্রত্যক্ষ ভূমিকা অবদান রাখলেও একথা সর্বজন স্বীকৃত সত্য যে হুমকি, দলন, নিপীড়ন এবং কারানির্যাতন সহ সকল প্রকার প্রতিকূলতাকে ঠেলে আওয়ামী লীগকে প্রতিষ্ঠা থেকে ক্ষমতায় নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে মওলানা ভাসানীই অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছিলেন। নিজের হাতে গড়া সেই দলটি ত্যাগ করার সময় তাই সংগত কারণেই তার হৃদয় কম্পিত হওয়ার কথা। তিনি তথাপি বেরিয়ে গিয়েছিলেন, কারণঃ তাকে বাধ্য করা হয়েছিলো। মন্ত্রীত্ব কিংবা ক্ষমতার লোভ কোনো দিনই তাকে আতুর করতে পারেনি, তার সামনে ছিলো কেবল নিস্পেষিত জনগোষ্ঠী, ছিলো সাম্রাজ্যবাদ কবলিত দেশ, বিশেষ করে অধিকার বঞ্চিত পূর্ব বাংলা। মন্ত্রীত্ব লাভের পর আওয়ামী লীগের ক্ষমতাসীনদের দেশ, জনগণ এবং সংগঠনের ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচী বিরোধী কার্যকলাপ তাকে ব্যথিত করেছিলো বলেই তিনি কাগমারী সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বিচ্যুত নেতৃবৃন্দকে সংশোধন করতে চেয়েছিলেন, প্রগতিশীল নেতা ও কর্মীদের চাপ সত্ত্বেও আনুষ্ঠানিক ভাবে অনাস্থা প্রকাশ কিংবা পদত্যাগের নির্দেশদানের পরিবর্তে তিনি তাদের বিচ্যুতির পথ থেকে ফিরে আসার সময় দিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে এ ছিলো তার সংগত কার্যক্রম, ছিলো সত্যিকার সংগঠন দরদী নেতার যোগ্য আচরণ। দলত্যাগ কিংবা ভাঙনের কোনো ইচ্ছে থাকলে তিনি তা সেদিনই করতে পারতেন এবং তাহলে তাকে আর 'পরাভূত' হতে হতোনা, বরং আওয়ামী লীগের গরিষ্ঠ অংশকে তিনি সাথে আনতে পারতেন, পারতেন ক্ষমতাসীনদের দল থেকে বহিষ্কার করতেও।

সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ক্ষমতাসীনরাই বরং কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানী প্রদর্শিত উদারতার সুযোগ নিয়েছিলেন। 'শতকরা ৯৮ ভাগ'-এর ফোবিয়াক্রান্ত সোহরাওয়ার্দীই স্বায়ত্তশাসনদানের মতো পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নেও '৯৮ ভাগ' সমর্থন লাভের ঘোষণার মধ্য দিয়ে ভাঙনের রাজনীতির সূচনা করেছিলেন। কেন্দ্রে দূরে থাক, মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তকে অমান্য করে এমনকি প্রাদেশিক পরিষদেও সরকারীভাবে স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব আনতে দেয়া হয়নি। স্বায়ত্তশাসনের পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে সঠিকভাবে চিহ্নিত পররাষ্ট্রনীতিতেও পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা ছিলোনা। পরন্তু অনুসৃত নীতির সপক্ষে অবিরাম প্রচারণা দলের মধ্যে সংঘাতকেই অনিবার্য করে তুলেছিলো। ফলে অন্ততঃ বিশ্বাসঘাতক বা প্রবঞ্চক আখ্যা পাওয়ার চাইতে পদত্যাগই তিনি শ্রেয় মনে করেছিলেন। আবুল মনসুর আহমদের অভি-যোগানুযায়ী কোনো 'ক্রাইসিস' সৃষ্টি তার উদ্দেশ্য ছিলোনা। কেননা, তিনি জানতেন এবং একথাও প্রমাণিতও হয়েছিলো যে, মন্ত্রীত্বের ক্ষমতা দিয়ে তেমন অবস্থার মোকাবিলার 'যোগ্যতা' ক্ষমতাসীনদের ছিলো।

সংকট বরং ক্ষমতাসীনরাই সৃষ্টি করেছিলেন। মওলানা ভাসানীর পদত্যাগকে কেন্দ্র করে সাংগঠনিক সম্পাদক অলি আহাদের পদমর্যাদা স্থগিতকরণ এবং পদত্যাগী নয়জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে এমন এক অচলাবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছিলো যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব ছিলো না। সবশেষে ঢাকা কাউন্সিল অধিবেশনের নামে তাদের কার্যক্রম মওলানা ভাসানীর জন্য বেরিয়ে আসা ব্যতীত অন্য কোনো পথ আর খোলা রাখেনি। সেখানে সোহরাওয়ার্দীর পররাষ্ট্রনীতি অনুমোদনের পাশাপাশি পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের অর্থ হতো মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক আত্মহত্যা, ক্ষমতাসীনদের কাছে নতিস্বীকারের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে আত্মসমর্পন এবং সবচেয়ে বড় কথাঃ সেটা হতো পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে বিসর্জন দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সাথে সরাসরি ন্যাক্কারজনক বিশ্বাসঘাতকতা।

৫. ন্যাপের প্রতিষ্ঠাঃ শ্রেণী সংগ্রামে গতিবেগ সঞ্চার

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রতিষ্ঠাও এই প্রেক্ষিতে ছিলো সঠিক সিদ্ধান্তেরই ফসল। কেননা, ততদিনে একথা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিলো যে ক্ষমতা ব্যবহারে চরিত্রহীন দুর্নীতিপরায়ন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে দিয়ে আর স্বায়ত্তশাসন আদায় কিংবা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। সোহরাওয়ার্দী নিজেই কেবল স্খলিত হননি, ক্ষমতার সর্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করে তিনি আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দকেও বিচ্যুত করে সাফল্যের সাথে এমন এক বিপরীত অবস্থানে নিয়ে গিয়েছিলেন, যেখান থেকে তাদের, তথা সংগঠনকে ফিরিয়ে আনার কোনো সুযোগ বা অবস্থাই আর ছিলোনা। সে পরিস্থিতিতে পদত্যাগের পর ঘরে ফিরে যাওয়া কিংবা রাজনীতি থেকে অবসর নেয়াও হতো মওলানা ভাসানীর মতো সংগ্রামী নেতার জন্য সুবিধাবাদী আপোষমুখিনতা, হতো জনতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতাও। এক্ষেত্রেও স্বায়ত্তশাসন অর্জন এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের পতাকাকে সমুন্নত রেখে তিনি আরো একবার যুগের দাবী মেটানোর ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন। অন্যভাবে বলা যায়ঃ ষড়যন্ত্রমূলক ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির কবলে আচ্ছন্ন আওয়ামী লীগ যেখানে ব্যর্থ হয়েছিলো, ন্যাপ সেখানে প্রধানতঃ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এক যুগান্তর ঘটিয়েছিলো।

ন্যাপের এই অভিযাত্রাকে সার্বিক সার্থকতা প্রদানের লক্ষ্যে মওলানা ভাসানী অতঃপর পাকিস্তানের রাজনীতিতে শ্রেণী সংগঠনের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তিনিই প্রথম পাকিস্তানে এই সত্যটি তুলে ধরেন যে কেবলমাত্র গণসংগঠনের মাধ্যমে শ্রেণী হিসেবে বিশেষ করে কৃষক-শ্রমিকদের অবস্থার কোনো উন্নয়ন সম্ভব নয়, বারবার জননেতাদের ওয়াদাভঙ্গের চোরাগলিতে তাদেরকে ঘূরপাক খেতে হবে। নেতাদের স্খলন প্রতিরোধের জন্য কেবল নয়, নিজেদের শ্রেণীস্বার্থেও তাই তাদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলা দরকার। এই ধারণাকে বাস্তব রূপ দিয়ে তিনি ১৯৫৭ সনের ডিসেম্বরে ফুলছড়িঘাটের বিন্নাফৈরে পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি গঠন করেন। তিনি নিজে এর সভাপতি এবং আবদুল হক সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত

হন।[২৩২] একইভাবে ১৯৫৬ সনে গঠিত পূর্ব পাকিস্তান মজদুর ফেডারেশনও তার সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতায় পুনর্গঠিত হয় ১৯৫৮ সনের ১৮ ফেব্রুয়ারী ঃ মোহাম্মদ তোয়াহা ও কাজী মহিউদ্দিন আহমদ নির্বাচিত হন সভাপতি ও সম্পাদক হিসেবে। প্রসংগত উল্লেখ্য যে বিশের দশক থেকে মূলতঃ কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই রাজনীতিতে মওলানা ভাসানীর প্রতিষ্ঠালাভ হয়েছিলো, শ্রমিক আন্দোলনেও তিনি জড়িত হয়েছিলেন পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকেই। মোহাম্মদ তোয়াহাদের উদ্যোগে তিনি আদমজী শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হন চুয়ান্নর নির্বাচনের আগেই, ১৯৫৪ সনের মে দিবসে ঢাকার পল্টন ময়দানে এবং নারায়নগঞ্জে অনুষ্ঠিত দুটি শ্রমিক সমাবেশে ভাষণদান এবং অংশগ্রহণের মাধ্যমে তিনি শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার সাথে নিজেকে একাত্ম করে-ছিলেন।[২৩৩]

ব্যস্ততা এবং নিজের সীমাবদ্ধতার কারণে শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্বে তিনি যাননি, তার কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিলো কৃষক আন্দোলন। বিভিন্ন সময়ে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংগঠনবিহীনভাবে কৃষক আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার এক পর্যায়ে ১৯৫৫ সনের নভেম্বরে তিনি কৃষক সমিতি দাঁড় করানোর উদ্দেশ্যে সন্তোষে আহবান করেছিলেন কৃষক মজদুর সম্মেলন। কিন্তু প্রধানতঃ দুটি কারণে সেবার তাকে কৃষক সমিতি গঠন থেকে বিরত থাকতে হয়ঃ এক, শেখ মুজিবের বিরোধিতা ও 'আওয়ামী লীগের মাধ্যমে কৃষকদের দাবী দাওয়া আদায় করার' আশ্বাস, এবং দুই, কমিউনিস্ট পার্টির 'জাতীয় আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টির' আশংকাজনিত বিরোধিতা।[২৩৪] কাগমারী সম্মেলন পরবর্তী ঘটনা-প্রবাহ কৃষকদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলার অপরিহার্যতা নিয়ে উপস্থিত হয়, ন্যাপের প্রতিষ্ঠার ফলে কৃষক সমিতি গঠনের পথও পরিষ্কার হয়ে যায়। এই প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়ঃ কাগমারী সম্মেলনের অন্যতম ফলশ্রুতি ছিলো বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় শ্রেণী সংগ্রাম ও সংগঠনের সূচনা এবং অগ্রযাত্রা। এতদিনের অসংগঠিত এবং সময়ে সময়ে অবদমিত কৃষক আন্দোলন এরপর

কৃষক সমিতির মাধ্যমে পেয়েছিলো কাঠামোগত আকার ও গতিবেগ, শ্রমিক আন্দোলনও অতিক্রম করেছিলো বিকাশের অনিশ্চয়তা।

৬. কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন ভূমিকা

প্রসংগক্রমে এখানে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ও দৃষ্টিভংগীও আলোচিত হওয়া দরকার। সাতচল্লিশের ভারত বিভক্তিকে অস্বীকার করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক রনদিভের উপস্থাপিত 'ঝুটা আজাদী' বিরোধী 'আঘাত এবং আঘাত হানার' তত্ত্বের ভিত্তিতে 'বিপ্লব' সংঘঠিত করতে গিয়ে পূর্ব বাংলায় কমিউনিস্টরা ময়মনসিংহের হাজং এবং রাজশাহীর নাচোলে সাঁওতাল বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন (ভারতের পার্টির ১৯৪৮ সনের ফেব্রুয়ারী-মার্চে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কোলকাতা কংগ্রেসের সিদ্ধান্তানুসারে পাকিস্তানে আলাদা পার্টি গঠিত হয়)। এই 'বিপ্লব'-এর ব্যর্থতায় নেমে আসা তীব্র সরকারী নির্যাতন এবং পাকিস্তানের 'ইসলামী চরিত্র' গরিষ্ঠ 'হিন্দু' কমিউনিস্টদের পক্ষে প্রকাশ্য তৎপরতাকে দুঃসাধ্য করে তোলে. প্রকাশ্য কার্যক্রম চালানোর সপক্ষে বন্দী কমিউনিস্টদের উপস্থাপিত ১৯৫১ সনের 'রাজশাহী জেল থিসিস'-কে উপেক্ষা করে কমিউনিষ্ট পার্টি পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগের মাধ্যমে কর্মসূচী এগিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এর সপক্ষে যৌক্তিকতা খুঁজে নেন তারা কমিনফর্মের ১৯৫১ সনের বক্তব্যে: কমিনফর্ম-মুখপত্র 'ফর এ লাস্টিং পীস, ফর এ পিপলস ডেমোক্র্যাসী' আওয়ামী লীগের প্রশংসা করেছিলো একারণে যে, এই দলটির কর্মসূচীতে 'সামন্তবাদ ও ঔপ-নিবেশিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার' অংগীকার অন্তর্ভুক্ত ছিলো।[৭৩৫] এই 'প্রশংসা'কেই কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগে যোগদানের ইংগিত হিসেবে গ্রহণ করেন। হাজী মোহাম্মদ দানেশ সহ এক দল কমিউনিস্ট আওয়ামী লীগে যোগদানের বিরোধিতা করে ১৯৫৩ সনের জানুয়ারীতে গণতন্ত্রী দল গঠন করলেও মূল পার্টি তার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। [উল্লেখ্য যে, পার্টির নেতা মণি সিংহ আওয়ামী লীগে যোগদানের কথা এড়িয়ে গিয়ে বলেছেন: 'পার্টি গোড়া থেকেই এই সংগঠনের (আওয়ামী লীগ) প্রতি বন্ধুসুলভ দৃষ্টি-

ভংগী গ্রহণ করে। গোড়া থেকেই পার্টির প্রতি সহানুভূতিশীল কয়েকজন কর্মী এই সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। (আওয়ামী লীগের) অন্যান্য নেতাদের সাথেও পার্টি বন্ধুসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করেছে।'[২৩৬]

সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মওলানা ভাসানীকে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ 'বন্ধু' হিসেবে মনোনীত করেন এবং গণসংগঠনের নামে আওয়ামী লীগ করতে গিয়ে 'কমিউনিস্টরা বুর্জোয়া রাজনীতির আবর্তে এমন নিমজ্জিত' হয়ে পড়েন যে 'শ্রমিক কৃষক ও অপরাপর মেহনতী জনগণের মধ্যে নিজেদের সাংগঠনিক অবস্থানকে দৃঢ় ও মজবুত করার কোন প্রচেষ্টা তারা করেননি।'[২৩৭] আওয়ামী লীগের মাধ্যমে 'গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শক্তিশালী' এবং 'বিপ্লবের প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করার' বিশ্বাস তাদের এতটা নির্ভরশীল করে তুলেছিলো যে ১৯৫৫ সনে তারা মওলানা ভাসানীর কৃষক সমিতি গঠনের উদ্যোগেরও বিরোধিতা করেছিলেন। কাগমারী সম্মেলন-পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগে অবস্থান করা অসম্ভব হয়ে পড়লেও তারা দলত্যাগ এবং নতুন দল ন্যাপ গঠনের বিপক্ষে মত দেন, 'আপ্রাণ' প্রচেষ্টা নেন দ্বিধাবিভক্তি রোধের উদ্দেশ্যে। কিন্তু পার্টির 'ওভারগ্রাউণ্ড' নেতা ও কর্মীদের 'ব্যক্তিগত কোন্দল ও প্রাধান্যলাভের প্রচেষ্টা, ঘৃণ্য ও পরোক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং নানা সন্দেহজনক উচ্চমহল' এর আনুকূল্য লাভের লোভের ফলে আত্মগোপনকারী পার্টির 'সৎ ও মূল্যবান' পরামর্শ বাস্তবায়িত হতে পারেনি।[২৩৮] সেই পার্টিকেও কিন্তু আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে যেতে হয়েছিলো, ন্যাপেও তারা যোগ দিয়েছিলেন।

ঘটনা প্রবাহের কোনো পর্যায়েই মওলানা ভাসানীকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই, কেননা তিনি কমিউনিস্ট ছিলেন না, তেমন দাবীও করেননি কখনো। কমিউনিস্টরাই বরং নানাভাবে ভুল করেছেন: 'আত্মগোপন' থাকার চমৎকার সুবিধাজনক অবস্থার সুযোগে পার্টির নামমাত্র অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখলেও সর্বাত্মকভাবে তারা আওয়ামী লীগে 'অনুপ্রবেশ' করেছিলেন। বদরুদ্দীন উমরের মতে এটা ছিলো তাদের 'রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক লাইনের সংশোধনবাদী ও বিলোপবাদী' চরিত্র ও কার্যক্রম, কেননা আওয়ামী লীগের

সাথে আনুষ্ঠানিক দলগত চুক্তির মাধ্যমে তারা কোনো 'ফ্রন্ট' করেননি, সদলবলে কেবল 'যোগদান' করেছিলেন। ফলে আওয়ামী লীগে কমিউনিস্টদের কোনো 'সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা' ছিলোনা, তারা বরং আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক নীতির 'অধিনস্থ' ছিলেন, 'বাঁধা' ছিলেন 'বুর্জোয়া রাজনৈতিক কর্মসূচীর খুঁটিতে'।[২৩৯]

এরই পাশাপাশি কৃষক সমিতির মতো শ্রেণী সংগঠন প্রতিষ্ঠায় বাধা দিয়ে তারা সোহরাওয়ার্দী-মুজিবদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠাতেই সহায়তা করেছিলেন, এর ফলে কৃষক আন্দোলন সহ শ্রেণী সংগ্রামকেও ক্ষতিগ্রস্থ করা হয়েছিলো। মওলানা ভাসানীর ওপর 'ট্রয়ের ঘোড়ার' মতো সওয়ার হতে গিয়ে দল হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টি'ই যে নিজের জন্য বেশী বিপর্যয় ডেকে এনেছিলো তার বড় প্রমাণ ঃ কাগমারী সম্মেলন থেকে ন্যাপের প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত কোনো পর্যায়েই পার্টির বক্তব্য বলীষ্ঠতা পায়নি, হতে পারেনি সিদ্ধান্তমূলকও ঃ মওলানা ভাসানীর 'আশ্রয়' নিয়েই তাদের এগোতে হয়েছিলো। আওয়ামী লীগের সাথে 'ফ্রন্ট' করতে না পারলেও মওলানা ভাসানীর ওপর নির্ভরশীলতার পরিবর্তে তারা যদি পার্টি সম্প্রসারণে বেশী সচেষ্ট হতেন, গড়তে পারতেন শ্রেণী সংগঠনগুলিকে, তাহলে একদিকে যেমন নিজেদেরকে বিপর্যয় কবলিত হতে হতোনা, অন্যদিকে তেমনি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতায় মওলানা ভাসানীকেও সহায়তা করা যেতো, শক্তিশালী করা যেতো সোহরাওয়ার্দীর আক্রমণের মুখে। উল্টো তারা এমন এক পরিস্থিতিতেও আওয়ামী লীগ ত্যাগ না করার সিদ্ধান্ত হাজির করেছিলেন, যখন তার পরিস্কার অর্থ হতো সাম্রাজ্যবাদের পদলেহন। তাছাড়া, কৌশল হিসেবেও সে-পথ অনুসরণের অবকাশ তখন আর ছিলোনা। কেননা, সোহরাওয়ার্দী-মুজিবদের সেদিনের অবস্থান ছিলো প্রধানতঃ কমিউনিস্ট বিরোধী ঃ অলি আহাদদের বহিষ্কার এবং যুব লীগের প্রশ্নে নিষেধাজ্ঞাই এর প্রমাণ। আর একথা তো বলাই বাহুল্য যে আওয়ামী লীগ কেবল সেই মওলানা ভাসানীকেই সভাপতি পদে ফেরত আনতে চেয়েছিলো, যিনি হতেন সম্পূর্ণভাবে কমিউনিস্টদের প্রভাবমুক্ত।

দ্বিমত ও বিরোধিতা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টি ন্যাপের প্রতিষ্ঠায় মওলানা ভাসানীকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা দিয়েছিলো। লক্ষ্যনীয় যে সদলবলে ন্যাপে যোগদানের সময়ও কিন্তু তারা কোনো আনুষ্ঠানিক চুক্তি সম্পাদন বা ফ্রন্ট গঠন করেননি। বরং নিজেদের কর্মসূচীকে এগিয়ে দেয়ার নামে ন্যাপকে কমিউনিস্ট পার্টি তার প্রকাশ্য গণ-সংগঠনের মর্যাদা দিয়েছে। ফলে তাদের 'বিলোপবাদী ও সংশোধন-বাদী' চরিত্রই অব্যাহত থাকে এবং এবারও তারা আওয়ামী লীগের মতো ন্যাপেরও 'অধীনস্থ' হয়ে পড়েন। উভয় ক্ষেত্রেই কমিউনিস্ট পার্টিকে 'বুর্জোয়া মতবাদ' প্রচার করতে হয় এবং 'এই প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়ে কমিউনিস্টদের ভেতর বুর্জোয়াসুলভ অভ্যাস, আচরণ ইত্যাদি ব্যাপক আকারে দেখা দেয় এবং তাদের রাজনীতির মধ্যে সংশোধনবাদের প্রভাব প্রায় অনিয়ন্ত্রিত হয়ে ওঠে।[২৪০]

এই দৃষ্টিকোণ থেকে একথা বলা তাই অসংগত হবেনা যে, মওলানা ভাসানীকে 'ট্রয়ের ঘোড়া' বানাতে গিয়ে কমিউনিস্টরাই উল্টো বুর্জোয়া স্বার্থের নিঃশর্ত সেবা করেছেন, দলগতভাবে তাদেরই ক্ষতি হয়েছিলো বেশী। অকমিউনিস্ট এবং বদরুদ্দীন উমরের ভাষায় 'পেটি বুর্জোয়া কৃষক গণতন্ত্রী' মওলানা ভাসানী তার সামন্ত-বাদ, পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার দৃষ্টিভংগী থেকে আন্দোলনের সকল পর্যায়েই কমিউনিস্টদের 'বন্ধুর' ভূমিকায়ই থেকেছেন, অন্ততঃ শত্রুশিবিরে চলে যাননি। কিন্তু তাকে এবং আওয়ামী লীগ ও ন্যাপকে 'ব্যবহার' করতে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি সেই যে 'বিলোপবাদী ও সংশোধনবাদী' পথ ধরেছিলো, আশির দশক পর্যন্তও সে পথের বাইরে আসা আর তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। পরবর্তীকালে এই পথে হাঁটতে গিয়ে তাদের দলের 'সাইনবোর্ড' পাল্টানোর 'উপদেশ' শুনতে হয়েছে: ১৯৭৫ সনের ২৪ ফেব্রুয়ারী 'বাকশাল'-এ যোগদানকালে সত্যি সত্যি তারা সাইনবোর্ড পাল্টেও ছিলেন। ১১৫ সদস্যের কেন্দ্রিয় কমিটিতে তাদের ক্রমিক সংখ্যা জুটেছিলো একেবারে পেছনের দিকে: ৭৪ থেকে ৭৯ পর্যন্ত সংখ্যার ছ'টি সদস্যপদ তারা পেয়েছিলেন।[২৪১]

মুজিবের 'সাফল্যে' ঈর্ষায় বা আফসোসে কাতর হয়ে যারা মওলানা

ভাসানীর আওয়ামী লীগ ত্যাগের ঘটনাটিকে ভুল পদক্ষেপ মনে করেন, তাদের এই পরিপ্রেক্ষিত মনে রাখা দরকার। সকল দায় দায়িত্ব মওলানা ভাসানীর ওপর চাপিয়ে নিজেদের ত্রুটি, ব্যর্থতা ও অক্ষমতাকে আড়াল করার প্রচেষ্টা ঠিক নয়, কেননা, স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন তিনি পরিত্যাগ করেননি, বরং আরো বেগবান করার মতো নতুন উপাদান এর সাথে সংযোজিত করেছিলেন। কমিউনিস্টরা সে-আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার পরিবর্তে জাতীয় প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে চীন-সোভিয়েত মতাদর্শগত দ্বন্দ্বের 'আন্তর্জাতিকতার' মধ্যে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন সর্বতোভাবে। কমিউনিস্টদের আত্ম-কলহের সে চমৎকার সুযোগটিই মুজিব নিয়েছিলেন, এতে কেবল মুজিবের 'বিচক্ষণতাই' প্রমাণিত হয়নি, একই সাথে উন্মোচিত হয়েছিলো কমিউনিস্টদের ব্যর্থতা ও অক্ষমতার দিকটিও। প্রসংগত: স্মর্তব্য যে প্রধানতঃ যার কারণে আওয়ামী লীগ ত্যাগ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিলো সে-সোহরাওয়ার্দীর প্রভাবাধীন মুজিব কিন্তু তার জীবদ্দশায় স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটিকে তুলে ধরেননি, ধরতে পারেনওনি। আইউবের 'রাজনৈতিক দলবিধি আইন' (১৫ জুলাই, ১৯৬২) ঘোষণা এবং কনভেনশন মুসলিম লীগ গঠনের পর রাজনৈতিক দল পুনরুজ্জীবিত না করার নীতিতে ১৯৬২ সনের ২৫ সেপ্টেম্বর গঠিত হয় 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট।' জামাতে ইসলামী সহ পশ্চিম পাকিস্তানে কতিপয় রাজনৈতিক দল পুনরুজ্জীবিত করা হলেও সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশে অসন্তুষ্ট চিত্তে পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগকে দাঁড় করানো থেকে মুজিবকে বিরত থাকতে হয়। ১৯৬৩ সনের ৫ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পরপর ১৯৬৪ সনের ২৫ জানুয়ারী তিনি আওয়ামী লীগকে পুনর্গঠিত করেন। এটা ছিলো মুজিবের এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত এবং এর মাধ্যমেই পরবর্তীকালে তিনি নিজেকে স্বায়ত্তশাসনের 'প্রবক্তার' আসনে উন্নীত করেছিলেন। মুজিবের এই আন্দোলনের অর্থ এটা নিশ্চয়ই ছিলোনা যে কোনো 'আইন' বলে কমিউনিস্টদের সংগ্রাম করতে নিষেধ করা হয়েছিলো। বরং ন্যাপের ১৪ দফা ছিলো মুজিবের ৬ দফার তুলনায় অনেক বেশী গণমুখী ও প্রগতিশীল কর্মসূচী।[২৪২] কমিউ-

নিস্টদের আত্মকলহ, ব্যর্থতা এবং অক্ষমতাই মুজিবকে এগিয়ে দিয়েছে সাফল্যের দিকে। তাছাড়া আওয়ামী লীগে থাকলেই যে তারা লাভবান হতে পারতেন বা পারতেন সাফল্যকে ছিনিয়ে আনতে, সেকথাও কিন্তু প্রমাণ করা যায়না। কেননা, মস্কোপন্থী ন্যাপের মোজাফফর আহমদরা ৬ দফা এবং মুজিবের প্রতি সমর্থনের হাত বাড়িয়ে চেষ্টা কম করেননি, কিন্তু সহযোগিতা গ্রহণ কিংবা নেতৃত্বে অংশ দেয়ার বদলে মুজিব তাদের সাইনবোর্ড পাল্টানোর, তথা আওয়ামী লীগে যোগদানের 'উপদেশ' দিয়েছিলেন। এই আলোকে একথা বিচার করতে হবে যে বামপন্থীরা সে সময় আওয়ামী লীগে থেকে গেলেই বা কতটুকু লাভবান হতে পারতেন এবং আদৌ থাকাটাই সম্ভব হতো কিনা। জনগণের আন্দোলনে অংশ নেয়ার পথ কখনো বন্ধ হয়না, যে কোনো অবস্থান থেকেই তা করা যায়, সেজন্য সরাসরি অপমান সহ্য করেও একটি বিশেষ দলেই থেকে যেতে হবে, তেমন যুক্তি সংগত কারণেই হাস্যকর হওয়ার কথা।

৭. পাকিস্তানভিত্তিক রাজনীতিতে ভাসানী ও ন্যাপের প্রতিষ্ঠা

সারা পাকিস্তানভিত্তিক রাজনীতিতে সংগ্রামী নেতা ও সংগঠন হিসেবে মওলানা ভাসানী ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রতিষ্ঠা ও উত্তরণ ছিলো কাগমারী সম্মেলনের অন্যতম ফলশ্রুতি। এই ঘটনা-টিকে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন কিংবা অধিকারের দাবী থেকে মওলানা ভাসানীর 'সরে যাওয়া' হিসেবে দেখাতে চাওয়া ঠিক নয়। এক দশকের আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে মওলানা ভাসানী সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে কেবলমাত্র প্রদেশভিত্তিক রাজনীতির মাধ্যমে পূর্ব বাংলার অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়, সোহরাওয়ার্দীদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বরং 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' ও 'পাকিস্তানের শত্রু' পরিচয়ে একঘরে হয়ে পড়ার আশংকাই তখন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। কেননা, পূর্ব বাংলায় জনপ্রিয়তা থাকলেও পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ কখনো ভিত্তি পায়নি, সোহরাওয়ার্দী যাদের যোগাড় করেছিলেন তারা ছিলেন তার নিজের মতোই পূর্ব বাংলা বিরোধী এবং ফলে তখন পর্যন্তও মুসলিম লীগই একমাত্র সারা পাকিস্তান ভিত্তিক সংগঠন হিসেবে তৎপরতা চালাচ্ছিলো। এই প্রেক্ষিতে

ভাসানী চেয়েছিলেন পশ্চিম পাকিস্তান থেকেও একযোগে চাপ সৃষ্টি করতে ঃ এক ইউনিট বাতিলের সর্বজন সমর্থিত জনপ্রিয় দাবীটিকে তুলে ধরা ছিলো সে কৌশল থেকেই উদ্ভাবিত, এ-প্রশ্নে তার তর্কাতীত আন্তরিকতা অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যেই তাকে এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিকে ঐ অঞ্চলে দৃঢ়ভিত্তি এনে দিয়েছিলো। পূর্ব বাংলায় স্বায়ত্তশাসনের প্রবক্তাদের মতো পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বিরোধীদেরকেও 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' আখ্যা দেয়া শুরু হলে একথাই প্রমাণিত হয়েছিলো যে আসলে ক্ষমতাসীনরাই যে কোনো প্রকারে দেশবাসীকে অধিকার বঞ্চিত রাখার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। এর ফলে স্বায়ত্তশাসন দাবীর যৌক্তিকতাই বরং সংহততর হয়েছিলো, ক্ষমতাসীনরাও চিহ্নিত হয়েছিলো মানুষের স্বার্থবিরোধী ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে। সোহরাওয়ার্দী ও তার পরবর্তী দু'টি সরকারের তৎপরতা এবং সর্বশেষে ১৯৫৮ সনের সামরিক শাসন যে একই যোগে স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও এক ইউনিট বাতিলকে ঠেকানোর জন্য গৃহিত ও পরিকল্পিত পদক্ষেপ ছিলো, সেকথা প্রমাণের আর অপেক্ষা রাখেনি। একথা তাই বলা সংগত নয় যে মওলানা ভাসানী পূর্ব বাংলার দাবী থেকে সরে গিয়েছিলেন, বরং সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী শোষণ এবং সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য বিরোধী আন্দোলনকে স্বায়ত্তশাসনের দাবীর সাথে অত্যন্ত সঠিকভাবে একই সূত্রে গ্রথিত করার মধ্য দিয়ে তিনি সামগ্রিক সংগ্রামকেই বেগবান করেছিলেন, দিয়েছিলেন বলীষ্ঠতাও। আইউবের সামরিক শাসনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো এর অনিবার্য পরিণতিকেই ঠেকানো, না হলে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাস ভিন্নরকম হতো।

৮। 'আসসালামু আলাইকুম'-এর তাৎপর্য

এই আলোকে কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানী উচ্চারিত 'আসসালামু আলাইকুম' এর তাৎপর্যও বিশ্লেষণ করা দরকার। দুঃসাহসী উচ্চারণ হলেও এটা তার স্বাধীনতার 'ঘোষণা' ছিলোনা, একে বরং শর্ত সাপেক্ষে ভবিষ্যদ্বাণী বলা চলে ঃ শর্তটি ছিলো স্বায়ত্তশাসন সহ পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্য ও বঞ্চনার অবসান। এর কারণ ঃ স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ করার মতো বস্তুগত অবস্থা

তখনো আদৌ তৈরী হয়নি ঃ পূর্ব বাংলায় ইংরেজদের চাইতেও প্রত্যক্ষ শোষক 'হিন্দু' জমিদার-মহাজনদের শোষণ পীড়নের তাজা স্মৃতি, পাকিস্তান আন্দোলনের সদ্যাজিত সাফল্যের আনন্দ এবং পাকিস্তানের বিরোধিতা বা স্বাধীনতার চিন্তা মানেই 'হিন্দু' ভারতে ফিরে যাওয়ার ভীতি তখনো পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের মনে প্রবল-ভাবে বিরাজ করছিলো। তদুপরি শোষণ নির্যাতনের প্রক্রিয়া শুরু হলেও তখনও পর্যন্ত তা এমন প্রকট আকার নেয়নি যখন মানুষ স্বাধীনতার বিকল্পের কথা চিন্তা করবে। এরই পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ কারণটি ছিলো ক্ষমতাসীনদের অব্যাহত ভারত বিরোধী 'ইনজেকশন'-এর প্রক্রিয়াও, আর এজন্যই সে সময় সরাসরি স্বাধীনতার আহবান জানানোর মতো পরিবেশ বিরাজমান ছিলোনা।

মওলানা ভাসানীর ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতাও প্রসংগত কম গুরুত্ব পূর্ণ বিবেচ্য বিষয় নয় ঃ তিনি স্বয়ং ছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম বাঙালী নেতা, সামান্য হলেও দেশটির প্রতি মমত্ব তখনো তার ছিলো এবং সেজন্যই প্রাথমিকভাবে তিনি পাকিস্তানের কাঠা-মোর ভেতরেই সমস্যার সমাধান অন্বেষণ করেছিলেন, স্বাধীনতার চিন্তা থাকলেও তিনি তা তখনই চাইতে চাননি, তাছাড়া অপেক্ষাও প্রয়োজনীয় ছিলো পরিস্থিতির পরিপক্কতার জন্য। দৃষ্টিভংগীগত কারণেও তিনি শুধুমাত্র শাসক বদলের তথা পাঞ্জাবীর স্থলে বাঙালীর প্রতিষ্ঠার মতো অন্ধ ও উগ্র জাতীয়তাবাদের পথে যেতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন সামন্তবাদ, বৃহৎ পুঁজি এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-শাসন বিরোধী শ্রেণীভিত্তিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে ঃ এজন্যই তিনি শ্রেণী সংগঠনের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। শ্রেণী চেতনা এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে শাণিত করাই ছিলো তার অন্যতম কর্মসূচী।

এই কারণে এবং উপস্থাপিত আলোচনার ভিত্তিতে তাই একথা বলা চলে যে, 'আসসালামু আলাইকুম' এর মাধ্যমে মওলানা ভাসানী সরাসরি স্বাধীনতার আহবান জানাননি, পূর্ব বাংলার জনগণকে অধিকার সচেতন করার পাশাপাশি তাদের মনে তিনি স্বাধীনতার বিকল্পের ধারণাটির বীজ বপন করেছিলেন। একই সাথে এর মাধ্যমে

তিনি শাসক গোষ্ঠীর ওপর চাপও সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন ঃ তাদের জন্য এটা ছিলো এক অমোঘ সতর্কবাণী, ছিলো তার নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণীও। ষাটের দশকে বামপন্থীদের ব্যর্থতা, বিচ্যুতি, হঠকারীতা এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিশ্বাসঘাতকতার ফলে মওলানা ভাসানীর আকাংক্ষিত সমাজতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠিত হতে না পারলেও তিনি তার শ্রেণীগত অবস্থানের সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন বহুদূর, যার পর আর তার যাওয়ার বিজ্ঞানসম্মত কারণ ছিলোনা।[২৪৩] বিশেষ করে ১৯৬৯ সনের আন্দোলনে তার ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা স্মরণীয়। ১৯৭০ সনের নভেম্বরে জলোচ্ছ্বাস কবলিত পূর্ব বাংলার প্রতি অমার্জনীয় পশ্চিমী উপেক্ষার পটভূমিতে ৩০ নভেম্বর প্রচার পত্রের মাধ্যমে এবং ৪ ডিসেম্বর পল্টন ময়দানের বিশাল জনসমাবেশে স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণার মধ্য দিয়ে তিনি তার অগ্রবর্তী ভূমিকাই অব্যাহত রেখেছিলেন।[২৪৪] একাত্তরে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সাধ্যানুযায়ী ভূমিকা পালনও তার এক অবিস্মরণীয় অবদান।[২৪৫] অর্থাৎ প্রথম বারের মতো ইংগিত দান এবং ভবিষ্যদ্বাণী করার পাশাপাশি পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের সকল পর্যায়েই তিনি সপক্ষে ভূমিকা রেখেছিলেন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভূমিকার এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারাবাহিকতা রক্ষার দৃষ্টান্ত একমাত্র মওলানা ভাসানীই রেখে গেছেন।

৯. কেন্দ্র-বিরোধী বলীষ্ঠ উদ্যোগ ঃ ভাসানীর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার যৌক্তিকতা

স্বায়ত্তশাসন সহ পূর্ব বাংলার অধিকারের যে কোনো দাবীকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' এবং 'ভারতমুখিনতা' হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াসের বিরুদ্ধে বলীষ্ঠ প্রতিবাদ ছিলো কাগমারী সম্মেলনের তাৎপর্যের আর একটি দিক। ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রীর সামনে জিন্নাহ-লিয়াকত আমীর সময় থেকে ক্ষমতাসীনদেরই অনুসৃত অসৎ এই কৌশলের বিরুদ্ধে উচ্চারিত প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে মওলানা ভাসানী তাদের গণবিরোধী গোপন উদ্দেশ্যকেই উন্মোচিত করেছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত স্বাধীন ও জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির

সপক্ষে মওলানা ভাসানীর আন্দোলনকেও পূর্ব বাংলার অধিকারের দাবীর মতো ভারতের পক্ষাবলম্বন হিসেবে চিহ্নিত করা খুব সহজসাধ্য ছিলো। কেননা, সাফল্যের সাথে এমন পরিবেশ সেকালে তৈরী করা হয়েছিলো, যখন পাকিস্তানের জন্য মংগলকর বলে কথিত যে কোনো ব্যবস্থা বা পদক্ষেপের বিরোধিতাকেই স্বচ্ছন্দে ভারতমুখিনতা বলে প্রমাণ করা যেতো। শাসকগোষ্ঠীর এই কৌশলকেই মওলানা ভাসানী প্রতিহত করতে চেয়েছিলেন।

ব্ল্যাকমেলিং, দরকষাকষি বা সত্যিকার দেশপ্রেমের যে কোনো কারণ বা দৃষ্টিকোণ থেকেই ভারত তার পররাষ্ট্রনীতি তৈরী করে থাকনা কেন, এর সাথে মওলানা ভাসানীর পররাষ্ট্রনীতির দাবীকে এক করে দেখানোর মতো যথেষ্ট বাস্তব অবকাশ তখন ছিলো। বিষয়টিকে রাজনীতিতে শত্রু ঘায়েলের শস্তা কৌশলের চাইতে সুদূর-প্রসারী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে। ভারত কিংবা তার নীতিকে শক্তিশালী, যুক্তিসংগত বা সমর্থনীয় করে তোলা মওলানা ভাসানীর উদ্দেশ্য ছিলোনা। 'ভারত-প্রেমিক' হওয়ার মতোও কোনো কারণ তার ঘটেনি, বরং হিন্দু জমিদার-মহাজন বিরোধী অতীত আন্দোলন এবং পাকিস্তানের সমর্থনে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে তার বলীষ্ঠ ভূমিকার কারণে ভারত সরকার তাকে শত্রু হিসেবেই বিবেচনা করতো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রথম ভারত সফরকালে ১৯৪৯ সনের মার্চ মাস থেকে তাকে আসামে অনেকদিন কারাগারে বন্দী জীবন কাটাতে হয়েছিলো। ভারতমুখিনতা থেকে নয়, রুশ-মার্কিন দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতার আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভংগী থেকেও তিনি দেখেননি, সাধারণভাবে পূর্ব বাংলা সহ পাকিস্তানের অধিবাসীদের কল্যাণের চিন্তা থেকেই তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদের সক্রিয় প্রভাব ও হস্তক্ষেপ মানুষের অধিকার আদায় ও স্বাভাবিক বিকাশের পথে পর্বতের মতো বাধাস্বরূপ, যুদ্ধজোটমুখী পররাষ্ট্রনীতি কেবল যুদ্ধ আর ধ্বংসই বয়ে আনবে, পাকিস্তানকে জড়িয়ে ফেলবে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ চক্রান্তে। এক কথায়ঃ পুঁথিগত কোনো তত্ত্বজ্ঞান বা দেশ বিশেষের প্রতি 'আনুগত্য' নয়, পাকিস্তান ও তার বঞ্চিত-অবহেলিত জনগণের মংগল চিন্তাই মওলানা ভাসানীকে

এই দাবীর সপক্ষে দাঁড়ানোর বলীষ্ঠতা দিয়েছিলো।

একথার সত্যতার প্রমাণ মেলে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তার ভারত-বিরোধী সংগ্রাম থেকে : যুদ্ধকালে ভারতের সাহায্যকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন, প্রকাশ্যে ধন্যবাদ জানাতেও তার কুণ্ঠা ছিলোনা, কিন্তু সেই সুযোগে এদেশের সম্পদ লুণ্ঠন এবং সকল ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের 'সম্প্রসারণবাদী' ভারতীয় নীতির সমলোচনা ও বিরোধিতায় তিনি হয়েছিলেন দারুণভাবে উচ্চকিত। স্বাধীনতার পরপর সূচিত তার ভারত বিরোধিতাকেও আবার পাকিস্তানী কৌশলে 'পাকিস্তান-মুখিনতা' হিসেবে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা গৃহিত হয়েছিলো, কিন্তু মাত্র সেদিনের অভিজ্ঞতার জন্যে এতে সাফল্য আসেনি। এর ফলে বরং মওলানা ভাসানীর দেশপ্রেমই পরীক্ষিত ও সুপ্রমাণিত হয়েছে: কোনো দেশ বিশেষের পক্ষাবলম্বন নয়, স্বদেশ ও দেশবাসীর কল্যাণ-চিন্তাই যে তাকে সর্বসময়ে চালিত করেছে, সেকথাই প্রমাণিত হয়েছে। পঞ্চাশের দশক থেকে মওলানা ভাসানীর পরিচালিত আন্দোলনের সাফল্যও স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে : সেকালে বিরোধিতা করলেও শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকারকে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনেরই সদস্য হতে হয়েছে। এর পেছনে নির্ধারণী তথা জনতার শক্তির প্রভাব সৃষ্টির জন্য পাকিস্তানে মওলানা ভাসানীর ভূমিকার কথাও মনে রাখতে হবে।

মওলানা ভাসানীর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের 'স্বীকৃতি' জুটেছিলো অচিরেই : গ্রেফতার ও বিচারের যে 'কারণ' সোহরাওয়ার্দী খুঁজে পেয়েছিলেন, তারই সূত্র ধরে সামরিক শাসক আউব খান তাকে গ্রেফতার করেছিলেন ১৯৫৮ কনের ১২ অক্টোবর। শেখ মুজিব এবং আবুল মনসুরদের 'দুর্নীতির' দায়ে গ্রেফতার করা হলেও মওলানা ভাসানীকে বন্দী করা হয়েছিলো তার পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত আন্দোলনের কারণেই। গ্রেফতারের কারণ জানিয়ে ১৯৫৮ সনের ১০ অক্টোবর লিখিত পাকিস্তান সরকারের চিঠিতে তাকে জানানো হয় : 'সরকারের কাছে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য আছে যে আপনি এমন সব তৎপরতায় জড়িত রয়েছেন, যেগুলি পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও বৈদেশিক বিষয়ের জন্য ক্ষতিকর। বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী ও ধ্বংসাত্মক উদ্দেশ্যে

বক্তৃতা ও অন্যান্য কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে আপনি বিশেষ কতিপয় রাষ্ট্রের মধ্যে এমন এক ধারণার সৃষ্টি করেছেন যে পাকিস্তান তাদের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন, যদিও আপনি নিজেও ভালোভাবেই জানেন যে কথাটা সত্য নয়, পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের লক্ষ্যে অনুসৃত। দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আপনি এমন ধরণের কার্যকলাপেও লিপ্ত রয়েছেন যার ফলে পাকিস্তানের সংহতি ও জাতীয় ঐক্য ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তাছাড়াও এমন সব উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য পাকিস্তানের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন বিশেষ কতিপয় শক্তি ও সংস্থার নিকট থেকে আপনি সাহায্য ও নির্দেশও গ্রহণ করেছেন। আপনার এইসব তৎপরতা পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর বিবেচনায় সন্তুষ্ট হওয়ার পর পাকিস্তান সরকার ১৯৫২ সনের পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনের অধীনে আপনাকে আটক করার নির্দেশ দিয়েছেন।'[২৪৭]

উল্লেখ্য যে, 'বিশ্বাসযোগ্য তথ্য' হাতে থাকলেও মওলানা ভাসানীর কোনো 'বিচার' বা 'শাস্তি' হয়নি, তাকে সেবার বিনা বিচারে এক টানা ৪ বৎসর ১ মাস আটক রাখা হয়। বন্যার্তদের সাহায্যদান এবং নিজের ও অন্য রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে ১৯৬২ সনের অক্টোবরে এগারো দিনব্যাপী অনশন পালনের পর তাকে ৩ নভেম্বর মুক্তি দেয়া হয়। এর মধ্য দিয়েও পাকিস্তানের ক্ষমতাসীনদের পূর্ব বাংলা বিরোধী দৃষ্টিভংগীরই প্রকাশ ঘটেছিলো, সাম্রাজ্যবাদের পদলেহনের ব্যাপারটিও গোপন থাকেনি।

১০. মুজিবের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের স্বরূপ

কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানী শাসক গোষ্ঠীর দৃষ্টিভংগীর এই দিকটিকেই উন্মোচিত করেছিলেন: পূর্ব বাংলার স্বার্থের কথা উত্থাপন করলেই তাকে ভারতমুখিনতা বলে চিহ্নিত করার প্রয়াসের বিরুদ্ধে তিনি বলীষ্ঠতার সাথে প্রতিবাদ তুলে ধরেছিলেন। তখন তিনি এর সাফল্যের ফলাফল ভোগ করতে না পারলেও এর ফলে ষাটের দশকে স্বায়ত্তশাসনের 'প্রবক্তা' হিসেবে আবির্ভূত শেখ মুজিবের জন্য মুক্ত হয়েছিলো সাফল্যের দ্বার: শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে আর ভারত–

মুখিনতার শস্তা কৌশল প্রয়োগে সাফল্য লাভ সম্ভব হয়নি, আগরতলা মামলার মতো সুনির্দিষ্ট এবং অমোঘ 'ষড়যন্ত্র'ও কোনো সার্থক 'অস্ত্র' হতে পারেনি, গণ-অসন্তোষের মুখে বরং প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।[২৪৮]

পঞ্চাশের দশকে মুজিবের মতো 'স্বজন'দেরও প্রবল বিরোধিতার প্রতিকূলতাকে ঠেলে মওলানা ভাসানী সাফল্যের যে সিঁড়ি নির্মাণ করেছিলেন, সে সিঁড়িই বাধাহীনভাবে মুজিব বেয়েছিলেন তার ৬ দফার আন্দোলনকালে। জনগণের নাম ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রধানতঃ বাঙালী যে উঠতি বুর্জোয়াদের স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করা ছিলো মুজিবের ৬ দফার একমাত্র উদ্দেশ্য, সে বুর্জোয়াদেরও সুযোগ সুবিধা-লাভ ও বিকাশের পথ নির্মাণ করেছিলেন মওলানা ভাসানীই। পঞ্চাশের দশকে অত্যন্ত দুর্বল এবং সংখ্যায় স্বল্প এই বাঙালী বুর্জোয়ারা মওলানা ভাসানীর পেছনে সমবেত হওয়ার মতো অবস্থায় উপনীত হতে পারেনি, সাহসের পরিবর্তে তাদের মনে ছিলো দারুণ ভিরুতা, তদুপরি কৃষক শ্রমিক মেহনতী জনতার স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবমুক্ত নিয়ন্ত্রিত বুর্জোয়া বিকাশের লক্ষ্যে মওলানা ভাসানী উপস্থাপিত কর্মসূচীও তারা চরিত্রের কারণে গ্রহণ করতে পারেনি। মুজিবের ৬-দফা সেক্ষেত্রে ছিলো কেবলমাত্র তাদের স্বার্থেই প্রণীত, সাম্রাজ্যবাদের আনুকূল্য লাভের আকাংক্ষাও এতে ছিলো নগ্নভাবেই মূর্ত, ফলে তাদের সমর্থনও হয়েছিলো নিরংকুশ। এরই পাশাপাশি পাকিস্তান-কেন্দ্রিক মোহ ভাঙার মতো দু'দশকের পর্যাপ্ত সময়ও মুজিবের অনুকূলে এসেছিলো।

তথাপি লক্ষ্যনীয় যে মুজিবের গ্রেফতারের সাথে সাথেই ৬ দফার আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে, এমনকি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধেও জনমত স্বতঃস্ফূর্ত এবং তাৎক্ষণিক হয়নি [ষড়যন্ত্রের বিষয়টি সরকার ২৮ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতারের পর প্রথম প্রকাশ করেন ৬ জানুয়ারী, ১৯৬৮ ; ১৯৬৬ সন থেকে বন্দী মুজিবকে ষড়যন্ত্রের 'অন্যতম হোতা' হিসেবে আটক করা হয় ১৮ জানুয়ারী ১৯৬৮ ;[২৪৯]]। ৬৮-র ডিসেম্বরে মওলানা ভাসানী সূচিত 'ঘেরাও আন্দোলন' এবং তার পর পর ৬৯-এর জানুয়ারী থেকে পরিচালিত

ছাত্র সমাজের ১১ দফা আন্দোলনই প্রধানতঃ স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে প্রচণ্ডতা দিয়েছিলো।[২০০] বাঙালী ধনিক-বুর্জোয়াদের সর্বাত্মক অংশ গ্রহণ ও বিপুল অর্থব্যয়, সাম্রাজ্যবাদের আড়াল-আনুকূল্য, বামপন্থীদের ব্যর্থতা ও অক্ষমতা এবং সর্বোপরী ছাত্র-আন্দোলনের সীমাবদ্ধতার ফলে মহান সে ছাত্র-গণআন্দোলনই রূপান্তরিত হয়েছিলো ৬-দফা ও মুজিবের মুক্তির দাবী-কেন্দ্রিক আন্দোলনে, বিশ্বাসঘাতকতার মুখে জনগণ হয়ে পড়েছিলো চরমভাবে অসহায়। নিশ্চিত বিজয়মুখী সে আন্দোলনকে বিপথে স্তিমিত করার পাশাপাশি মওলানা ভাসানীর বারণকে অমান্য করে প্রেসিডেন্ট আইউব খান আহুত গোলটেবিল বৈঠকে (২৬ ফেব্রুয়ারী প্রথম ও ১০ মার্চ, ১৯৬৯ থেকে দ্বিতীয় পর্যায়) মুজিবের নিষ্ফল অংশ গ্রহণও তার নিজের এবং ৬ দফার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে উন্মোচিত করেছিলো : স্বায়ত্তশাসনের নামে তিনি আশলে পশ্চিম পাকিস্তানের বিজাতীয় বুর্জোয়াদের সাথে প্রতিযোগিতায় বাধা-গ্রস্থ ও অবদমিত বাঙালী বুর্জোয়াদের বিকাশের পথকেই বাধাহীন করতে চেয়েছিলেন। পঞ্চাশের দশকে মওলানা ভাসানীর উত্থাপিত স্বায়ত্তশাসনের দাবী ও তার উদ্দেশ্যের সাথে এখানেই মুজিবের ৬-দফা ভিত্তিক দাবী ও উদ্দেশ্যের পার্থক্য।

দৃষ্টিভংগী ও উদ্দেশ্যের এই পার্থক্যের কারণেই মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার অধিবাসীরা তাদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে কখনো যৌক্তিক পরিণতিতে নিয়ে যেতে পারেননি : অনেক ত্যাগ, আন্তরিকতা এবং সাহসিকতা সত্ত্বেও প্রতিটি আন্দোলনই বিশ্বাসঘাতকতার চোরা-গলিতে হারিয়ে গেছে, অপরিকল্পিত স্বাধীনতা যুদ্ধও তাই ধ্বংস আর রক্তক্ষয় ব্যতীত কোনো সুফল আনতে পারেনি। মওলানা ভাসানীর সাফল্য তথাপি এখানেই যে ষাটের দশকে উত্থানকালে মুজিবকে কাগমারী সম্মেলনের মূল বক্তব্য তথা পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবীকেই অবলম্বন করতে হয়েছিলো। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ এবং পুঁজিবাদের অবাধ শোষণ ও বিকাশ-বিরোধী উপাদানগুলির সুচতুর পরি-ত্যাগ ছিলো মুজিবের দৃষ্টিভংগী ও চরিত্রের ফলশ্রুতি, কিন্তু স্বায়ত্তশাসনের দাবীটিকে অবলম্বন করে আন্দোলন পরিচালনার মধ্য দিয়ে মুজিবকেও একথার স্বীকৃতি দিতে হয়েছে যে কাগমারী সম্মেলন সঠিক ও সুনির্দিষ্ট-ভাবেই পূর্ব বাংলার জনগণের সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তির পথ নির্দেশ

করেছিলো। শোষণের সকল উৎসকেই অক্ষত ও নিরাপদ রেখে জনগণের দোহাই দিয়ে সূচিত আন্দোলনকে ঢালাওভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পরিচালিত করার অসৎ কৌশলের পরিবর্তে মুজিব যদি তাকে কাগমারী সম্মেলন নির্দেশিত পথে অকৃত্রিম জননেতার মতো এগিয়ে নিতেন, তাহলে এদেশের মানুষকে ধ্বংস, অত্যাচার আর শোষণ কবলিত থাকতে হতোনা।

ক· উপসংহার

১· স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণার উৎসস্থল কাগমারী

পরিশেষে আলোচনার মূল্যায়নকালে বলা যায় ঃ পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসন সহ প্রধানতঃ পূর্ব বাংলার অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সাথে অত্যন্ত সঠিকভাবে গ্রথিত করার মধ্য দিয়ে মওলানা ভাসানী আহূত কাগমারী সম্মেলন সেকালের পাকিস্তানী রাজ-নীতিতে নতুন এক স্রোতধারাকে জন্মদান ও বেগবান করেছিলো। সেই সাথে পশ্চিম পাকিস্তানবাসীদের এক-ইউনিট বাতিলের দাবীটির সমন্বয়-সাধনের পদক্ষেপ সে-আন্দোলনকে দিয়েছিলো প্রচণ্ড গতিবেগ, পূর্ব বাংলার ভৌগলিক সীমানা ছাড়িয়ে এর ব্যাপ্তি ঘটেছিলো পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলে। পাশাপাশি কৃষক সমিতির মতো শ্রেণী সংগঠনের উদ্বোধন ও বিস্তৃতি ছিলো বিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহমান আন্দোলনের ধারাসমূহকে শোষণ-হীন সমাজের অভিমুখে সংহত করার লক্ষ্যে এক যুগান্তকারী উদ্যোগ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত শাসন শোষণ ও ক্ষমতার বিজাতীয় নিয়ন্ত্রকদের সাথে মুজিব-আতাউর মানিক মিয়াদের সহযোগিতায় শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পূর্ব বাংলা-বিরোধী আঁতাত কাগমারী সম্মেলন সূচিত অভিযাত্রাকে বাধাগ্রস্থ করলেও তার বীজ প্রোথিত হয়ে গিয়েছিলো অনেক গভীরে। এর মূলোৎপাটন আর সম্ভব হয়নি, সে-প্রচেষ্টা বরং শাসক-শোষকদেরকেই নিক্ষেপ করেছিলো সংকটের অন্ধকার আবর্তে। সংকট ক্রমশঃ তীব্রতর হয়েছে, ফলে তথা-কথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পোশাকও ঝেড়ে ফেলতে হয় ঃ আইউব খানের সামরিক শাসনকে আনতে হয় সম্ভাব্য বিপর্যয় ঠেকানোর উদ্দেশ্যে। সংকট তথাপি কাটানো যায়নি, কাগমারী সম্মেলনের স্রোতধারা ক্রমাগত এগিয়ে গেছে তার অনিবার্য পরিণতির দিকে। সেকালে বিরোধিতার পর স্বায়ত্তশাসনের একই দাবী-মুখে মুজিবের উত্থান, ৬৮-৬৯-এর ছাত্র-গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন এবং সবশেষে একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ সহ

আন্দোলনের প্রতিটি স্তরই ছিলো অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পর্কিত, যার প্রেরণার উৎসস্থল ছিলো কাগমারী সম্মেলন।

২. সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার প্রমানিত যৌক্তিকতা

সামরিক চুক্তি ও যুদ্ধজোট বিরোধী জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির দাবী ও কর্মসূচীও সঠিক হিসেবেই প্রমাণিত হয়েছে। সোহরাওয়ার্দী অনুসৃত যুদ্ধবাজ পররাষ্ট্রনীতি বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের জন্য কোনোদিক থেকেই কল্যাণকর হয়নি, বরং এর মাধ্যমে সংগৃহীত সমরাস্ত্রের শক্তি বিশেষ করে পূর্ব বাংলার নির্যাতিত জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে নির্বিচারে। অধিকার আদায়ের যে কোনো দাবীতে এ দেশের মানুষ যখনই উঠে দাঁড়াতে গেছে, পাকিস্তানের কেন্দ্র তাকে দমন করেছে কঠোরভাবে। দমন নির্যাতনের সে গণবিরোধী প্রক্রিয়ায় সাহায্য আর সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসেছে আমেরিকার নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীরা। জনগণের নামে বাধাগ্রস্থ বাঙালী বুর্জোয়াদের অবাধ বিকাশের আন্দোলন পরিচালনাকালে মুজিব সাম্রাজ্যবাদের আনুকূল্যলাভের আশায় উন্মুখ থেকে দেখেছেন, কিন্তু 'পক্ষের লোক' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান ছাড়া অন্য কোনোভাবেই তাকে সহযোগিতা দেয়া হয়নি। এর কারণ ঃ ভারত-বেষ্টিত পূর্ব বাংলার তুলনায় একই সাথে সোভিয়েত ইউনিয়ন, গণচীন, ভারত এবং আফগানিস্তান সহ 'আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতার পথে প্রধান হুমকি' হিসেবে বিবেচিত রাষ্ট্রগুলির মাঝখানটিতে অবস্থিত যুদ্ধংদেহী পাকিস্তানের প্রয়োজনীয়তা ছিলো সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সোহরাওয়ার্দীর 'প্রিয় শিষ্য' মুজিবেরও সেকথা জানা না থাকার কথা নয়, এজন্যই তিনি আন্দোলনের সকল পর্যায়েই পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোর ভেতরে সমাধানলাভের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের কাছে পাকিস্তানের মূল্য এত বেশী ছিলো যে মুজিবকেও তারা নিরাশ করেছে, ঠেলে দিয়েছে উল্টো নির্যাতনের মুখে।

সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের এই দিকটির কথাই কাগমারী সম্মেলন তুলে ধরেছিলো। অনুগ্রহ প্রার্থনা কিংবা আপোষের পথে নয়, নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলনের আঘাতে সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করার মাধ্যমে অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রগতিশীল কর্মসূচীও সেখানে উপস্থিত করা হয়েছিলো। বাঙালী বুর্জোয়াদের বিকাশের দাবী কাগমারী সম্মেলনেও করা হয়েছে, কিন্তু

তাকেই প্রধান বা একমাত্র দাবীর মর্যাদা দেয়া হয়নি ঃ শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা ও জনগণের মুক্তির স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত বুর্জোয়া বিকাশকে সামগ্রিক সংগ্রামের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো মাত্র। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে তৎকালীন আওয়ামী লীগের ঘোষণা অনুসারে সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব বিস্তারের প্রাথমিক পর্যায় থেকেই স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির আন্দোলনকে গড়ে তুলে সেই সাথে জনগণের অধিকারের কর্মসূচীকে সমন্বিত করা হলে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি অবশ্যই সাম্রাজ্য-বাদী নেতৃত্বে যেতে পারতোনা, পাকিস্তানও যেতোনা তাদের কর্তৃত্বে, কেন্দ্র শক্তিশালী হতোনা এবং পূর্ব বাংলাকেও নির্দয়ভাবে নির্যাতন করা সম্ভব হতো না। এটাই ঘটনা প্রবাহের বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়ন। কিন্তু শত্রুকে শক্তি সঞ্চয়ে সমর্থন জুগিয়ে এবং তাকে জনগণ-বিরোধী নীতি ও অবস্থানে সংহত হওয়ার সুযোগ ও পর্যাপ্ত সময় দেয়ার পর জনগণের নামে অভিনয়ের পাশাপাশি এমন এক বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে আন্দোলনকে চালিত করা হয়েছে, যাদের প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিপক্ষই ছিলো পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতার নিরংকুশ নিয়ন্ত্রকরা। ফলে পাকিস্তানী যুগে নির্যাতন অব্যাহতভাবে ক্রমবর্ধমান হয়েছে, অন্যদিকে মূল্য পরিশোধের উপলক্ষে রক্তের বিশাল নদীতে ভাসতে হয়েছে পূর্ব বাংলার সেই জনগণকে, যাদের জন্য আন্দোলনটি আদৌ পরিকল্পিত ছিলোনা।

রক্তক্ষয়ী এই নিষ্ফল এবং মর্মান্তিক পরিণতির কারণ ছিলো কাগ-মারী সম্মেলন-নির্দেশিত সংগ্রামের নীতি ও কর্মসূচী থেকে বিচ্যুতি। কেননা, সেখানে উপস্থাপিত কর্মসূচী ছিলো একটি সমগ্র সংগ্রামের লক্ষ্যে প্রণীত ঃ শোষণের প্রতিটি ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধেই এতে ছিলো উচ্চকিত ঘোষণা। বাঙালী বুর্জোয়াদের মতো শ্রেণী বিশেষের স্বার্থে কোনো খণ্ডিত আন্দোলন সেখানে পরিকল্পিত হয়নি, বরং কৃষক শ্রমিক মেহনতী জনতা সহ প্রতিটি শ্রেণীরই দাবীর সমন্বয়ে একটি সমগ্র কর্মসূচী এজন্য তুলে ধরা হয়েছিলো যে মুক্তির সংগ্রাম এক অবিভাজ্য ও সর্বাত্মক প্রক্রিয়া, সামগ্রিক সংগ্রামকে খণ্ডিত করে কোনো একটি অংশ বিশেষকে নিয়েই এতে সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়, সে অংশ যতো শক্তিশালীই হোক না কেন। তাছাড়া কাগমারী সম্মেলন শত্রুকে শত্রুই বিবেচনা করার ডাক দিয়েছিলো ঃ সামন্তবাদের সাথে আপোষ এবং সাম্রাজ্যবাদের কাছে মাথা

নত করে তাদেরই অবিচ্ছেদ্য ক্ষমতাবান মিত্র বৃহৎ পুঁজি-বিরোধী আন্দোলনে সাফল্য লাভের আকাঙ্ক্ষা যে গাধার স্বর্গের মতোই ধূলিস্মাত হতে বাধ্য, একথাও সুনির্দিষ্টভাবেই বলা হয়েছিলো। তথাপি আন্দোলনকে খণ্ডিতই করা হয়েছে, কেননা, জনগণের মুক্তির দিকটিকে সামনে আসতে দেয়া মুজিবদের পরিকল্পনায় আদৌ ছিলোনা।

৩. মওলানা ভাসানী ঃ স্নেহময় জনক

ফুটবল জাতীয় খেলা নয় বলেই রাজনীতিতে কোনো উদ্যোগ বা কর্মসূচীই রাতারাতি বা নির্দিষ্ট একটি সময়ের মধ্যে তার আকাংক্ষিত ফলাফল আনতে পারেনা। কাগমারী সম্মেলনের ফলাফলও তাই তাৎক্ষণিক হয়নি, হওয়ার কথাও ছিলোনা। এই কারণে প্রতিক্রিয়ার ধারকদের দিক থেকে কাগমারী সম্মেলনকে নিষ্ফল প্রমাণ করার প্রচেষ্টা চলে আসছে লক্ষ্যণীয়ভাবে, 'ভাঙনের নায়ক' হিসেবে চিহ্নিত করে 'গঠনমূলক' কিছু না করার দায়ে মওলানা ভাসানীকেও আক্রমণের উদ্যোগ চলেছে একই যোগে। এমনি ধরণের সিদ্ধান্তদানকারী বুদ্ধিজীবীরা একটি প্রশ্নের উত্তর সব সময় এড়িয়ে যান ঃ জনগণের সবনাশের কারণ ঘটিয়ে হলেও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার অর্থই 'গঠনমূলক' কিছু করে ফেলা কিনা। লোক দেখানোর মত দু'চারটি ইমারত নির্মাণ এবং কতিপয় প্রিয়পাত্রের মধ্যে ব্যবসার লাইসেন্স বিতরণের মতো 'গঠনমূলক' কর্মকাণ্ডের জন্য কোনো যোগ্যতার দরকার হয়না, তাছাড়া সোহরাওয়ার্দী-রাজনীতির বিস্তারিত পর্যালোচনাও ইতিমধ্যে করা হয়েছে, ইতিহাসের পাঠক সেখানে তার 'গঠনমূলক' অবদান অন্বেষণ করতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রীত্বের মতো আশু কোনো ফললাভের আশায় মওলানা ভাসানী কাগমারী সম্মেলন আহ্বান করেননি। তার উদ্দেশ্য ছিলো সকল প্রকার শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগণের মুক্তির সংগ্রামকে দিক-নির্দেশ করা। শোষণের ব্যবস্থা হিসেবে তিনি সঠিকভাবেই সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে চিহ্নিত করেছিলেন। হাজার বছরব্যাপী বিকশিত এই ব্যবস্থাগুলিকে রাতারাতি উৎখাতের কল্পনা-বিলাস তাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি এবং সেজন্যই তিনি দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রামের কর্মসূচী তুলে ধরেছিলেন। আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে

তিনি যে সংগ্রামের সূচনা করেছিলেন, বিভিন্ন সময়ে পর্যায়ক্রমে এগিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়ায় তাকেই তিনি আরো বলীষ্ঠতা ও সংহততর রূপ দিতে চেয়েছিলেন ঃ কাগমারী সম্মেলন ছিলো সে-উদ্যোগেরই একটি পরিণত পর্যায়।

সাম্রাজ্যবাদের নির্দেশ ও সহযোগিতায় রাষ্ট্রক্ষমতার দমন নিস্পেষণ, প্রতিক্রিয়ার বিপুল অর্থ ও শক্তির বিনিয়োগ, সোহরাওয়ার্দী জাতীয় গণ-প্রতিনিধিদের বিশ্বাসঘাতকতা, বাঙালী বুর্জোয়াদের বিরোধী অবস্থান, জনগণের মূর্খতা ও অজ্ঞতার সুযোগে প্রতিপক্ষের সর্বাত্মক প্রচারণা এবং সহযোগী বামপন্থীদের ব্যর্থতা ও অক্ষমতা মওলানা ভাসানীকে আপাত-সাফল্যলাভ থেকে বঞ্চিত করলেও এর ফলে তার নিজের বা কাগমারী সম্মেলনের ব্যর্থতা বা নিষ্ফলতা প্রমাণিত হওয়ার মতো কোনো কারণ ঘটেনি। কেননা, স্বায়ত্তশাসন সহ পূর্ব বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার দীর্ঘমেয়াদী যে সংগ্রামকে এগিয়ে নেয়া ছিলো কাগমারী সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য, সে-সংগ্রামকে বাধাগ্রস্থ করে বিপথে পরিচালিত করা গেলেও তার মূলোৎপাটন সম্ভব হয়নি। খণ্ডিত ও বিকৃতভাবে হলেও পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের একই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রেরই বিনাশ ঘটিয়েছে, আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে, বিশেষ করে একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের রক্তক্ষয়ী অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার যৌক্তিকতাকে স্বীকার করতে হয়েছে এবং সে জন্যেই মুজিবের মতো সেকালের সোহরাওয়ার্দী অনুসারীকেও নিতে হয়েছে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্যপদ। এখানেই মওলানা ভাসানীর সাফল্য, এখানেই কাগমারী সম্মেলনের সার্থকতা। সে আন্দোলনের প্রক্রিয়া এখনো অব্যাহত রয়েছে, এদেশের নির্যাতিত জনতার সার্বিক মুক্তি তথা শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই স্রোতধারা থাকবে অব্যাহতভাবে প্রবাহমান। ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণে তাই কাগ-মারী সম্মেলন চিহ্নিত থাকবে আমাদের সমগ্র অস্তিত্বের শিকড় হিসেবে, মওলানা ভাসানীও আদৃত হবেন স্নেহময় জনকের মর্যাদায়।

—রচনাকাল ঃ ডিসেম্বর, ১৯৮৪-মার্চ, ১৯৮৫

।। তথ্য তালিকা ।।

১। (ক) শামসুল হকের 'মূল দাবী', ২৪ জুন, ১৯৪৯; দ্রষ্টব্য: বদরুদ্দীন উমর: 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি', প্রথম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, এপ্রিল, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা—২৪১-৪৫।
(খ) 'Draft Constitution And Rules of the East Pakistan Awami Mulsim League,' 1950.

২। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার কার্যববিরণী: দ্রষ্টব্য: তথ্য মন্ত্রণালয় প্রকাশিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ: দলিলপত্র', ১ম খণ্ড, ১৯৮২, পৃঃ ৭৩-৭৫, সম্পাদক: হাসান হাফিজুর রহমান; (অতঃপর সংক্ষেপে 'স্বাযুদ' লিখিত হবে)।

৩। পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের ভাষণ, ৪ জুন, ১৯৫৮: প্রাগুক্তে মুদ্রিত, পৃঃ ৬১৫-২২।

৪। Constitutional Assembly (Legislature) Debates, vol. 1, No. 18. pp 1063-64, April 5, 1952;

৫। শাসনতন্ত্র বিতর্কে আতাউর রহমান খানের বক্তৃতা, ২৭ জানুয়ারী, ১৯৫৬, দ্রষ্টব্য: স্বাযুদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৪;

৬। CALD, Vol-1, pp. 1818-45, January, 16-17, 1956; শাসনতন্ত্র বিতর্কে আবুল মনসুর আহমদের বক্তৃতা, 'ডন', করাচী, ১৮ জানুয়ারী, ১৯৫৬; দ্রষ্টব্য: Dr. Shamsul Huda Harun: 'Parliamentary Behaviour In A Multi-National State 1947-58: Bangladesh Experience', pp. 270-71, Dhaka. 1984.

৭। Richard D. Lambert: 'Factors in Bengali Regionalism in Pakistan', Far Eastern Survey, vol. 28, No. 4, April, 1959 P. 53 (pp. 49-58);

৮। শাসনতন্ত্র বিতর্কে আবুল মনসুর আহমদের বক্তৃতা, ১৬ জানুয়ারী, ১৯৫৬; দ্রষ্টব্য: স্বাযুদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫৯;

৯। 'জালেম শাহীর ছয় বৎসর', যুক্তফ্রন্টের প্রচার পত্রিকা, ৪ মার্চ, ১৯৫৪; দ্রষ্টব্য: স্বাযুদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৬-৮৬;

১০। Lambert, প্রাগুক্ত;

১১। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৬-২৫,

১২। 'ডন', ১০ জুলাই, ১৯৫৩;

১৩। বিস্তারিত দেখুন: M. Rafique Afzal: 'Political Parties In Pakistan 1947-58,' pp. 95-103, Islamabad, 1976,

১৪। 'ডন', ১০ জুলাই, ১৯৫৩;

১৫। দৈনিক 'আজাদ', ঢাকা, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৫৩;

১৬। স্বাযুদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ-৩৭৩-৭৪;

১৭। রফিক আফজাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ-১২৬, ১২৭, ১৩০; 'দশ দফা' চুক্তির জন্য দেখুন পৃঃ-২৪৯-৫৯;

১৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ-১২৮;

১৯। আবুল মনসুর আহমদ: 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর', ১৯৭৫ (৩য় মুদ্রণ) পৃ-৩৪০; 'ডন' ১৫ নভেম্বর, ১৯৫৪, রফিক আফজাল, প্রাগুক্ত, পৃ-১৭১।

২০। 'ডন', ১২ জানুয়ারী, ১৯৫৫। রফিক আফজাল, প্রাগুক্ত, পৃ-১৭২;

২১। আবুল মনসুর, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৫৬-৫৭;

২২। অলি আহাদ: 'জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫', পৃ-২৩৩;

২৩। 'পাকিস্তান অবজারভার', ঢাকা, ৭ জানুয়ারী, ১৯৫৬;

২৪। দৈনিক 'সংবাদ', ঢাকা, ১৬ জানুয়ারী, ১৯৫৬;

২৫। রফিক আফজাল, প্রাগুক্ত, পৃ-১৯১;

২৬। 'পাকিস্তান অবজারভার', ২৫ জানুয়ারী, ১৯৫৬;

২৭। আবুল মনসুর, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৮৬-৯৪; স্বাযুদ, ১ম খণ্ড, পৃ-৪৫৭-৬২।

২৮। স্বাযুদ, ১ম খণ্ড, পৃ-৪৬২-৭৫;

২৯। রফিক আফজাল, প্রাগুক্ত, পৃ-১৯১;

৩০। প্রাগুক্ত, পৃ-১৮৭।

৩১। এস. এম. রেজা: 'অনশনের রাজনীতি ও মওলানা ভাসানী', দ্রষ্টব্য: 'ভাসানীর অনশন', ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনীর পুস্তিকা, এপ্রিল, ১৯৭৪, পৃ-১১-১৭।

৩২। (ক) Jyoti Sen Gupta: 'History of Freedom Movement in Bangladesh: Some Involvement' P. XV, Calcutta, 1974; (খ) Fazlul Huq Kazi: 'Law and Politics in Pakistan', P.145, Karachi, 1976.

৩৩। ফজলুল হক কাজী, প্রাগুক্ত, পৃ-১৬২।

৩৪। জ্যোতি সেন গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ-XV-XVI.

৩৫। প্রাগুক্ত, পৃ-XVII.

৩৬। 'নিউইয়র্ক টাইমস', ৯ ডিসেম্বর, ১৯৫৩, প্রাগুক্ত, পৃ-XVIII.

৩৭। অলি আহাদ, প্রাগুক্ত, পৃ-১৯০-৯১।

৩৮। 'ডন', ১৭ নভেম্বর, ১৯৫৩। অলি আহাদ ঃ 'পূর্ব-পাক আওয়ামী লীগ ও বৈদেশিক নীতি', ১৯৫৭, (পুস্তিকা) পৃ-১।

৩৯। ভাসানী ঃ 'কেন এই সম্মেলন ?' (পুস্তিকা) জুলাই, ১৯৫৭, পৃ-২।

৪০। শামসুল হক, প্রাগুক্ত, স্বাযুদ, ১ম খণ্ড, পৃ-১১৮-২০।

৪১। স্বাযুদ, ১ম খণ্ড, পৃ-১২২।

৪২। শামসুল হক, প্রাগুক্ত, স্বাযুদ, ১ম খণ্ড, পৃ-১১৮-২০।

৪৩। 'Commentary' (New York), June, 1954, P. 524.

৪৪। Mohammad Ayub Khan : 'Friends Not Masters', 1967, pp. 130-32.

৪৫। 'নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলনে' (২৫-২৬ জুলাই, ১৯৫৭) মওলানা ভাসানীর ভাষণ সম্বলিত পুস্তিকা, ১৯৫৭, পৃ-২০-২৩। বিস্তারিত পড়ুন ঃ A. M. Scalesinger সম্পাদিত 'The Dynamics of World Power : A Documentary History of United States Foreign Policy 1945-1973', vol-IV, New York, 1973, pp. 736-40, 'American Foreign Policy, 1950-55, Basic Documents', pp. 2194-98.

৪৬। রফিক আফজাল, পৃ-১৩১।

৪৭। মওলানা ভাসানীর প্রাগুক্ত ভাষণ, পৃ-২৩-২৪, রফিক আফজাল, পৃ-১৩১-৩২।

৪৮। রফিক আফজাল, পৃ-১৩২।

৪৯। খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস ঃ 'ভাসানী যখন ইউরোপে', ১৯৫৭, পৃ-১২৮।

৫০। রফিক আফজাল, পৃ-১৩৩।

৫১। প্রাগুক্ত, পৃ-১৩৩,

৫২। 'পাকিস্তান অবজারভার,' ২৫ ও ২৬ মে, ১৯৫৪;

৫৩। প্রাগুক্ত, ৩১ মে, ১৯৫৪। 'ডন', ১১ ও ১৯ জুন, ১৯৫৪।

৫৪। খোন্দকার ইলিয়াস, প্রাগুক্ত, পৃ- ১২৩, ১২৭ ; 'ডন', ৩ জুন, ১৯৫৪।

৫৫। আইউব খান, প্রাগুক্ত, পৃ- ১১৬ ; রফিক আফজাল, পৃ- ২০৮।

৫৬। দ্রষ্টব্য ঃ শামসুল হুদা হারুণ, পৃ- ১২১-২২.

৫৭। 'ডন' ৫ নভেম্বর, ১৯৫৪ ; দ্রষ্টব্যঃ রফিক আফজাল, পৃ- ১৬৪-৬৫।

৫৮। আইউব খান, পৃ-১৬০।

৫৯। স্বাযুদ, ১ম খণ্ড, পৃ- ৪১৮-২০।

৬০। অলি আহাদ, প্রাগুক্ত পুস্তিকা, পৃ- ১-২; জাতীয় রাজনীতি. পৃ-১৯৫।
৬১। 'ডন', ২৯ অক্টোবর, ১৯৫৫ ; রফিক আফজাল, পৃ- ২০৮।
৬২। অলি আহাদ, পৃ- ১৯৫ ; 'ডন' ২১ মে, ১৯৫৬ ; দ্রষ্টব্য : রফিক আফজাল, ২০৮-০৯।
৬৩। খোন্দকার ইলিয়াস, পৃ- ৫৬।
৬৪। ফজলুল হক কাজী, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৬৬।
৬৫। প্রাগুক্ত, পৃ- ১৬৭ ;
৬৬। রফিক আফজাল, পৃ- ২০৯।
৬৭। আইউব খান, পৃ- ১১৪-১৬।
৬৮। প্রাগুক্ত, ১৫৪-৫৫।
৬৯। প্রাগুক্ত, পৃ- ১৩১।
৭০। প্রাগুক্ত পৃ- ১৩১।
৭১। রফিক আফজাল, পৃ-২১২।
৭২। আইউব খান, পৃ- ১৩২ ; ফজলুল হক কাজী, পৃ-১৪৭।
৭৩। অবুল মনসুর, প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৬১-৬৪ (মনসুর -আইউব আলোচনা)।
৭৪। প্রাগুক্ত, পৃ-৩৯২।
৭৫। 'ডন' ১৭, ১৮ মে, ১৯৫৬, দ্রষ্টব্য : রফিক আফজাল, পৃ-১৯৯।
৭৬। 'ডন' ২৬ মে, ১৯৫৬, দ্রষ্টব্যঃ. প্রাগুক্ত, পৃ-২০০।
৭৭। জ্যোতি সেন গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ-৯৩-৯৪।
৭৮। 'ডন', ২৫, ২৭ ও ২৮ অক্টোবর, ১৯৫৬ ; রফিক আফজাল, পৃ-২০৯।
৭৯। 'ডন', ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬, ; রফিক আফজাল, পৃ-২০৯।
৮০। 'ডন' ৫, ৯, ১৩, ১৬, ১৭, ২৬, ২৭ নভেম্বর ও ১৪ ডিসেম্বর, ১৯-৫৬ ; রফিক আফজাল, পৃ-২০৮, ২০৯ ; জ্যোতি সেন গুপ্ত পৃ-৯৬।
৮১। 'ডন', ১, ৪, ১১, ১৬, ১৮ নভেম্বর, ১৯৫৬ ; দ্রষ্টব্য : রফিক আফজাল, পৃ- ২১০।
৮২। ফজলুল হক কাজী, পৃ-১৬৭ ; জ্যোতি সেন গুপ্ত পৃ-৯৮।
৮৩। 'ডন' ২১ নভেম্বর, ৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৬ ; দ্রঃ আফজাল পৃ-২১১।
৮৪। মওলানা ভাসানীর প্রাগুক্ত ভাষণ, পৃ-২৫।
৮৫। জ্যোতি সেন গুপ্ত, পৃ-৯৪-৯৫।
৮৬। প্রাগুক্ত, পৃ-৯৫।
৮৭। 'ডন', ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৬ ; দ্রষ্টব্য : রফিক আফজাল, পৃ-২১১।
৮৮। 'ডন', ১২, ১৫, ১৬ অকটোবর, ১৯৫৪ ; রফিক আফজাল, পৃ-১৬২।

৮৯। 'ডন', ৯ জানুয়ারী, ১৯৫৭।

৯০। রফিক আফজাল, পৃ-২১৬।

৯১। বিস্তারিত দেখুন ঃ রফিক আফজাল, পৃ- ২১৬-২২।

৯২। মওলানা ভাসানীর প্রচারপত্র ঃ দ্রষ্টব্য ঃ স্বাযুদ, ১ম খণ্ড, পৃ-৫৯১।

৯৩। দ্রষ্টব্যঃ স্বাযুদ, ১ম খণ্ড, পৃ- ৫৯২ ;

৯৪। মালিকানা প্রশ্নে মওলানা ভাসানীর বিবৃতি, দৈনিক 'পাকিস্তান' ও 'পূর্বদেশ', ২০ ডিসেম্বর, ১৯৬৯ ; 'ইত্তেফাক' সহ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রসঙ্গটি সে সময় আলোচিত হয়েছিলো ব্যাপকভাবে ; দ্রষ্টব্যঃ অলি আহাদ ঃ জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫, পৃ- ১১১-১৩।

৯৫। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ঃ 'পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর', ঢাকা, মে, ১৯৮১, পৃ-৭৯।

৯৬। 'ডন' ২৬ নভেম্বর, ১৯৫৬ ; দ্রষ্টব্য ঃ রফিক আফজাল, পৃ-২১২।

৯৭। 'সংবাদ', ৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭।

৯৮। প্রাগুক্ত, ৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭।

৯৯। 'পাকিস্তান অবজারভার', ৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭।

১০০। সরদার জয়েন উদ্দীন ঃ 'মনে পড়ে ঃ মওলানা ভাসানী', দৈনিক 'সংবাদ' সাময়িকী, ১ আগস্ট, ১৯৮৫।

১০১। জ্যোতিসেন গুপ্ত, পৃ-১০০।

১০২। 'পাকিস্তান অবজারভার', ৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭।

১০৩। 'সংবাদ', ৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭।

১০৪। মওলানা ভাসানী এবং সোহরাওয়ার্দীর ভাষণের পূর্ণ বিবরণের জন্য ১৯৫৭ সনের ৮ ফেব্রুয়ারীর 'সংবাদ', 'আজাদ', 'পাকিস্তান অবজারভার', 'ইত্তেফাক', 'ডন' এবং জ্যোতি সেন গুপ্তের গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

১০৫। 'সংবাদ', ৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭।

১০৬। প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক আবু জাফর শামসুদ্দিন এই লেখককে তার সম্মেলনকালের কাগজ পত্র দেখতে দিয়েছেন (সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫)। দ্রষ্টব্য ঃ সরদার জয়েনউদ্দীন, পূর্বোক্ত। অলি আহাদ, পৃ-১৭২।

১০৭। 'পাকিস্তান অবজারভার', ৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭।

১০৮। 'সংবাদ', ৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭।

১০৯। 'পাকিস্তান অবজারভার', ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭।

১১০। Maj. (Rtd.) S. G. Jilani : 'Fifteen Governors I Served With', পৃ-৫৬।

১১১। 'পাকিস্তান অবজারভার', ১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭।
১১২। প্রাগুক্ত, ১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭।
১১৩। প্রাগুক্ত, ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭; জ্যোতি সেন গুপ্ত, পৃ-১০৪; রফিক আফজাল, পৃ-২১২।
১১৪। রফিক আফজাল, পৃ- ২১২।
১১৫। মওলানা ভাসানীর প্রগুক্ত ভাষণ, পৃ- ২৫।
১১৬। 'পাকিস্তান অবজারভার', ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭।
১১৭। প্রাগুক্ত, ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭।
১১৮। 'সংবাদ', ৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭; জ্যোতি সেন গুপ্ত, পৃ-১০৫।
১১৯। 'পাকিস্তান অবজারভার', ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭।
১২০। প্রাগুক্ত, ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭।
১২১। প্রাগুক্ত, ১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭।
১২২। প্রাগুপ্ত, ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭।
১২৩। দৈনিক 'আজাদ', ১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭।
১২৪। অলি আহাদ, পৃ- ২৭৩।
১২৫। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, পৃ-৮৩।
১২৬। অলি আহাদ, পৃ- ২৬৮।
১২৭। 'পাকিস্তান অবজারভার', ২৭ ও ২৯ জানুয়ারী, ১৯৫৬; দ্রষ্টব্যঃ রফিক আফজাল, পৃ- ১৯১।
১২৮। 'আজাদ', ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭।
১২৯। 'পাকিস্তান অবজারভার', ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭।
১৩০। 'আজাদ', ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭।
১৩১। দেখুন ঃ 'পাকিস্তান অবজারভার', ১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭।
১৩২। ভাষণের পূর্ণ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ 'পাকিস্তান অবজারভার', ২৩, ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭।
১৩৩। জাতীয় পরিষদ বিতর্ক (NAD), ভল্যুম-১, সংখ্যা-১৫ (২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭), পৃ-১১০১-০২। দ্রষ্টব্যঃ রফিক আফজাল, পৃ- ২১৩।
১৩৪। জ্যোতি সেন গুপ্ত, পৃ-১০৭।
১৩৫। 'ডন', ৬ মার্চ, ১৯৫৭।
১৩৬। অলি আহাদ, পৃ- ২৭৩-৭৮, আবুল মনসুর পৃ- ৪৯২-৯৫।
১৩৭। স্বাযুদ, ১ম খণ্ড, পৃ-৬০২।
১৩৮। অলি আহাদ, পৃ- ২৭৪-৭৮।

১৩৯। রফিক আফজাল (পৃ-২১৪) এবং জ্যোতি সেন গুপ্ত (পৃ-১০৭) প্রস্তাবের উত্থাপক হিসেবে ভুলক্রমে মোজাফফর আহমদের নাম বলেছেন।

১৪০। প্রাঃ পরিষদের কার্যবিবরণীঃ দ্রষ্টব্যঃ স্বাযুদ, ১ম খণ্ড,পৃ-৬০৩- ১০।

১৪১। জ্যোতি সেন গুপ্ত, পৃ-১০৭।

১৪২। 'ডন', ৪ ও ৫ এপ্রিল, ১৯৫৭; দ্রষ্টব্যঃ রফিক আফজাল, পৃ-২১৪।

১৪৩। 'ডন', ২৭ মার্চ, ১৯৫৭; দ্রষ্টব্য ঃ রফিক আফজাল, পৃ-২১৪।

১৪৪। 'ডন', ২৯ এপ্রিল, ১৯৫৭; রফিক আফজাল, প-২১৪।

১৪৫। 'ডন', ২৫ ও ৩০ মে, ১৯৫৭; রফিক আফজাল, পৃ-২১৪।

১৪৬। জ্যোতি সেন গুপ্ত, পৃ-১১৫।

১৪৭। প্রাগুক্ত, পৃ-১১৬।

১৪৮। অলি আহাদ, পৃ-২৮১।

১৪৯। জ্যোতি সেন গুপ্ত, পৃ-১১৭-১৮।

১৫০। মওলানা ভাসানী ঃ 'কেন এই সম্মেলন?' পৃ-১৩-১৫।

১৫১। দ্রষ্টব্য ঃ রফিক আফজাল, পৃ-২১৫।

১৫২। প্রাগুক্ত, পৃ-২১৬-১৭।

১৫৩। মওলানা ভাসানীর প্রাগুক্ত ভাষণ, পৃ-১৮।

১৫৪। রফিক আফজাল, পৃ-২১৬-১৮।

১৫৫। বিস্তারিত পড়ুন ঃ আবুল মনসুর আহমদ, পৃ-৫২৫-২৯ এবং ৬৪৩-৫০।

১৫৬। আইউব খান, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৩-৫৫।

১৫৭। আবুল মনসুর আহমদ, পৃ-৫২৯।

১৫৮। 'ডন', ৫, ৬, ৭ অক্টোবর, ১৯৫৭; রফিক আফজাল, পৃ-২২১।

১৫৯। আবুল মনসুর আহমদ, পৃ-৫২৭।

১৬০। কর্নেল মোহাম্মদ আহমদ ঃ 'মাই চীফ', ১৯৬০, পৃ-৯৬।

১৬১। মওলানা ভাসানীর প্রাগুক্ত ভাষণ দ্রষ্টব্য।

১৬২। 'সংবাদ', ২৬ জুলাই, ১৯৫৭।

১৬৩। প্রাগুক্ত।

১৬৪। অলি আহাদ, পৃ-১৯১, ২৮৫।

১৬৫। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় বিতর্কে আসহাবুদ্দিন আহমদের বক্তৃতা। ৩ এপ্রিল, ১৯৫৭। দ্রষ্টব্য ঃ স্বাযুদ, ১ম খণ্ড, পৃ-৬০৬।

১৬৬। করাচীতে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের ভাষণ, ৪জুন, ১৯৫৮, স্বাযুদ, ১ম খণ্ড, পৃ-৬১২-২২।

১৬৭। আইউব খান, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৭।

১৬৮। আতাউর রহমানের প্রাগুক্ত ভাষণ।

১৬৯। আবুল মনসুর আহমদ, পৃ-৪১১-১৯।

১৭০। মন্ত্রীসভার তালিকার জন্য দেখুন : স্বাধুদ, ১ম খণ্ড, পৃ-৭৮০-৮১।

১৭১। 'পাকিস্তান অবজারভার', ১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭।

১৭২। মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বিবৃতির জন্য দেখুন : জ্যোতি সেন গুপ্ত, পৃ-১০৫-০৬। বৃটেন ও নিউজীল্যাণ্ডের বিবৃতির জন্য 'পাকিস্তান টাইমস', ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭ ; দ্রষ্টব্য : প্রাগুক্ত।

১৭৩। 'American Foreign Policy : Current Documents,' 1957, PP-1029-31. মূল গ্রন্থ : তথ্য তালিকার ৪৪-এ দ্রষ্টব্য।

১৭৪। জ্যোতি সেন গুপ্ত পৃ-৯৫-৯৬।

১৭৫। মওলানা ভাসানীর প্রাগুক্ত ভাষণ, পৃ-২৬।

১৭৬। আইউব খান, পৃ-১৩৩।

১৭৭। আইউবের চিঠিগুলির জন্য দেখুন : প্রাগুক্ত, পৃ-১৪৮-৫৩।

১৭৮। জার্মান পত্রিকার সাথে সাক্ষাৎকার : দ্রষ্টব্যঃ ফঃ হঃ কাজী, পৃ-৮৬

১৭৯। অলি আহাদ, পৃ-২৯৪।

১৮০। আইউব খান, পৃ-১৮১-৮২।

১৮১। ফজলুল হক কাজী, পৃ-১৬৬।

১৮২। Z, A, Bhutto : 'Pakistan Builds Anew,' Foreign Affairs Ministry of Pakistan, April 1973, দ্রষ্টব্য : কাজী, পৃ-৫৫০-৫১।

১৮৩। Mushtaque Ahmad : 'Pakistan's Foreign Policy,' করাচী, ১৯৬৮, পৃ-৪৯ ; দ্রষ্টব্য : ফজলুল হক কাজী, পৃ-১৪৫।

১৮৪। আইউব খান, পৃ-১৫৬।

১৮৫। ফজলুল হক কাজী, পৃ-৮০।

১৮৬। প্রাগুক্ত, পৃ-৮৪

১৮৭। ৬ দফার জন্য দেখুন : স্বাধুদ, ২য় খণ্ড, পৃ-২৫৯-৬৯ ;২১ দফার জন্য প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৭৩-৭৪।

১৮৮। আইউব খান, পৃ ৩৭, মেজর (অবঃ) এস, জি, জিলানী : প্রাগুক্ত, পৃ-৫৬, ফজলুল হকের অভিমতের জন্য পড়ুন পৃ-১৩৭।

১৮৯। লাহোর প্রস্তাবের জন্য পড়ুন : স্বাধুদ, ১ম খণ্ড, পৃ-২-৩।

১৯০। অল-ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের সেক্রেটারী লিয়াকত আলী খানকে লিখিত ফজলুল হকের চিঠির জন্য পড়ুন প্রাগুক্ত, পৃ-৪-৭। বিস্তারিতের জন্য দ্রষ্টব্যঃ অমলেন্দু দে : 'পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক' এবং শীলা সেন : 'মুসলিম পলিটিক্স ইন বেংগল'।

১৯১। স্বাযুদ, ১ম খণ্ড, পৃ-১৫-১৬। দেখুন : আবুল হাশিম : 'ইন রিট্রোস-পেকশন' এবং ইশতিয়াক হুসেন কোরেশী, 'দ্য স্ট্রাগল ফর পাকিস্তান'।

১৯২। স্বাযুদ, ১ম খণ্ড : সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাবের জন্য পৃ-২২-২৪, আবুল হাশিমের বিবৃতির জন্য (২৯ এপ্রিল, ১৯৪৭) পৃ২৫-২৭, আবুল হাশিম-শরৎ চন্দ্র বোসের চুক্তি'র জন্য (২০মে, ১৯৪৭) পৃ-৩৩।

১৯৩। শরৎ বোসকে গান্ধী লিখিত চিঠির জন্য (৮ জুন, ১৯৪৭) দেখুন : প্রাগুক্ত পৃ-৩৪।

১৯৪। দাংগার দায়িত্ব সম্পর্কে তার পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি ও মতামত আছে, সেটা ভিন্ন প্রসংগ।

১৯৫। রফিক আফজাল, পৃ-৯৬।

১৯৬। দৈনিক 'আজাদ', ২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২। দ্রষ্টব্য: স্বাযুদ, ১ম খণ্ড, পৃ-৬৯৬।

১৯৭। প্রাগুক্ত, ১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২, দ্রষ্টব্য : প্রাগুক্ত, পৃ-৭০৩।

১৯৮। James W. Spain : 'Military Assistance for Pakistan', Political Science Review, vol, X4VIII, September 1954, p-745.

১৯৯। আবুল মনসুর আহমদ, পৃ-৩৩৫-৩৬।

২০০। বিস্তারিত পড়ুনঃ আবুল মনসুর আহমদ, পৃ-৩৪৬-৫০। খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, পৃ-২৩৬-৩৯।

২০১। স্বাযুদ, ১ম খণ্ড, পৃ-৭৭৮।

২০২। অলি আহাদ, পৃ-১৯০-৯১।

২০৩। আবুল মনসুর আহমদ, পৃ-৫৫৬।

২০৪। খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, পৃ-২৩৮।

২০৫। আবুল মনসুর আহমদ, পৃ-৩৪৯-৫০, বিস্তারিত : ৩৪৪-৫১।

২০৬। ফজলল হকের ভাষণের জন্যঃ স্বাযুদ, ১ম খণ্ড, পৃ-৪১৩-১৫, 'ঢাকার রাজনৈতিক কর্মীবৃন্দ' প্রচারিত প্রচার পত্রের জন্যঃ প্রাগুক্ত পৃ-৪১৬-১৭।

২০৭। রফিক আফজাল, পৃ-১৭৪।

২০৮। প্রাগুক্ত, পৃ-১৭৫।

২০৯। আবুল মনসুর আহমদ, পৃ-৩৬৫।

২১০। প্রাগুক্ত ; রফিক আফজাল, পৃ-১৭৫-৭৬। 'ডন' ২৮ এপ্রিল, ১৯৫৫।

২১১। অলি আহাদ, পৃ-২২৯-৩০, রফিক আফজাল, পৃ-১৭৬।

২১২। বিস্তারিত পড়ুন : আবুল মনসুর আহমদ, পৃ-৩৬৪-৮৬।

২১৩। অলি আহাদ ; পৃ-২৪৬-৪৭।

২১৪। জ্যোতি সেন গুপ্ত, পৃ-৮৭।
২১৫। আবুল মনসুর পৃ-৫২০-২৫, ৫৫৬-৫৭, মানিক মিয়া, পৃ-৮৪-৮৭।
২১৬। আবুল মনসুর আহমদ, পৃ-৫০০-০৫।
২১৭। রফিক আফজাল, পৃ-২২০।
২১৮। প্রাগুক্ত, পৃ-২১৮।
২১৯। 'ডন', ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭; দ্রষ্টব্যঃ প্রাগুক্ত, পৃ-২২০।
২২০। আবুল মনসুর আহমদ, পৃ-৫২৫-২৯।
২২১। রফিক আফজাল, পৃ—২২১, 'ডন' ১ অক্টোবর, ১৯৫৭।
২২২। প্রাগুক্ত, পৃ-২২৩-২৪, 'ডন', ১৮ অক্টোবর, ১৯৫৭।
২২৩। 'ডন' ৫, ৬, ৭, অক্টোবর, ১৯৫৭। রফিক আফজাল, পৃ-২২১। আবুল মনসুর, পৃ-৫২৫-২৯।
২২৪। আবুল মনসুর, পৃ-৫১২-১৩।
২২৫। রফিক আফজাল, পৃ-২২১।
২২৬। আইউব বলেছিলেন ঃ 'Army wants General Iskander Mirza to be the head of the State'. হাজী দানেশ ঃ 'জনাব আইউব খাঁর জবাবে', অক্টোবর, ১৯৬৪, পুস্তিকা, দ্রষ্টব্য ঃ স্বায়ুদ, ২য় খণ্ড, পৃ-২২০-৩২।
২২৭। আবুল মনসুর, পৃ-৪৯৯-৫০০।
২২৮। খোন্দকার ইলিয়াস, পৃ-২৩৮।
২২৯। দেখুন ঃ রফিক আফজাল, পৃ-২২১।
২৩০। আবুল মনসুর পৃ-৪২৪, ৪৮৭-৫১৯।
২৩১। আইউব খান, পৃ-৩৭।
২৩২। আলাউদ্দিন আহমদ ঃ 'মওলানা ভাসানী ও শাহপুর সম্মেলন', শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত 'মওলানা ভাসানী ঃ রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম,' ঢাকা, মে, ১৯৭৮, পৃ-৫২-৬৭।
২৩৩। ইন্দু সাহা ঃ 'মওলানা সম্পর্কে কতিপয় টুকরো ইতিহাসের ছড়া', আরেফিন বাদল সম্পাদিত 'মওলানা ভাসানী', ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ-৮৫-৮৮।
২৩৪। আলাউদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৮।
২৩৫। তালুকদার মনিরুজ্জামান ঃ 'Radical Politics and the Emergence of Bangladesh', ঢাকা, অক্টোবর, ১৯৭৫, পৃ-৪-৬, পড়ুন, হায়দার আকবর খান রণো ঃ 'মার্কসবাদ ও সশস্ত্র সংগ্রাম', ঢাকা,

১৯৮২, পৃ-১৩৫-৪৪।

২৩৬। মণি সিংহ ঃ 'জীবন সংগ্রাম', ঢাকা, জুলাই, ১৯৮৩, পৃ-১৭৬।

২৩৭। বদরুদ্দীন উমর ঃ 'কমিউনিস্ট আন্দোলন ও মওলানা ভাসানী,' প্রাগুক্ত গ্রন্থ 'মওলানা ভাসানী ঃ রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম,' পৃ-৬৮-৮৬।

২৩৮। অলি আহাদ, পৃ-২৮৪-৮৫।

২৩৯। বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত, পৃ-৭২-৭৩।

২৪০। প্রাগুক্ত, পৃ-৭৬।

২৪১। 'বাকশাল' কেন্দ্রীয় কমিটির জন্য দেখুন ঃ অলি আহাদ, পৃ-৫৬৩-৬৫।

২৪২। '১৪ দফা' দেখুন ঃ স্বাযুদ, ২য় খণ্ড, পৃ-২৪৮-৫৮। '৬ দফা' দেখুন ঃ পৃ-২৫৯-৬৯।

২৪৩। এটা ভিন্ন প্রসংগ, আপাততঃ বদরুদ্দীন উমরের বিশ্লেষণ দেখুন ঃ প্রাগুক্ত গ্রন্থ ঃ পৃ-৬৮-৮৬।

২৪৪। স্বাধীনতার আহবান সম্বলিত প্রচারপত্র ও ভাষণের বিবরণের জন্য দেখুন ঃ স্বাযুদ, ২য় খণ্ড, যথাক্রমে পৃ-৫৭৮-৮০ এবং ৫৮৪-৮৫।

২৪৫। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে ভারতে মওলানা ভাসানীর অবস্থান সম্পর্কে প্রায় সর্বসম্মত মতটি এই যে 'ব্যক্তিগত নিরাপত্তার' অজুহাতে হলেও তাঁকে কঠোর 'প্রহরাধীন' রাখা হয়েছিল। পড়ুন ঃ শাহ আহমদ রেজা ঃ 'স্বাধীনতা সংগ্রামে মওলানা ভাসানী', সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা', বিজয় দিবস সংখ্যা, ১৯৮৫।

২৪৬। 'পাকিস্তান অবজারভার', ১৩ অক্টোবর, ১৯৫৮।

২৪৭। করাচী থেকে পাকিস্তান সরকারের যুগ্ম-সচিব হামীদুদ্দীন আহমেদ স্বাক্ষরিত চিঠি ঃ দ্রষ্টব্য ঃ স্বাযুদ, ২য় খণ্ড, পৃ-২।

২৪৮। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রসংগটি বিশ্লেষণ সাপেক্ষ ভিন্ন বিষয়।

২৪৯। দৈনিক 'পাকিস্তান,' ৭ ও ৮ জানুয়ারী, ১৯৬৮ ঃ দ্রষ্টব্য ঃ স্বাযুদ, ২য় খণ্ড, পৃ-২৯৮-৩০১।

২৫০। '১১-দফা' দেখুন ঃ স্বাযুদ, ২য় খণ্ড, পৃ-৪০৫-০৮।

পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত পূর্ব বাংলার জন্য স্বায়ত্তশাসনের প্রাথমিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন মওলানা ভাসানী। সেই সাথে তিনি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকেও যুক্ত করেছিলেন, কেন আমেরিকার নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ছিলো স্বায়ত্তশাসনের পথে প্রধান অন্তরায়। আন্দোলনের স আওয়ামী লীগকে পাকিস্তানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হয়েই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পূর্ব বাংলাকে 'শতকরা ৯৮ ভাগ' স্বায়ত্তশাসন প্রদানের মিথ্যে তত্ত্ব উপস্থাপিত কর সংঘাত শুরু হয়। আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি হিসেবে মওলানা ভাসানী ১৯৫৭ স আহবান করেন দলের কাউন্সিল অধিবেশন। এটাই ঐতিহাসিক 'কাগমারী সম্মেলন' — যেখা স্বায়ত্তশাসনের বিকল্প হিসেবে মওলানা ভাসানী 'আসসালামু আলাইকুম' তথা পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার কথা উচ্চারণ করেছিলেন।

ব্যাপক তথ্যের ভিত্তিতে রচিত শাহ আহমদ রেজার এই গ্রন্থটিতে পাকিস্তানের প্রথম দশকে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রা থেকে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত ঘটনা প্রবাহও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়ে একই সঙ্গে এসেছে শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখের ভূমিকা। এক কথা প্রথম দশকে পাকিস্তানের রাজনীতির উল্লেখযোগ্য প্রতিটি দিকই লেখক আলোচনা করেছেন রাজনীতি-সচেতন পাঠকদের জন্য তথ্যনির্ভর এই গ্রন্থটি অবশ্য-পাঠ্য বলা যায়।

শাহাদত চৌধুরী